বাংলা একাডেমী ঢাকা

web : www.banglaacademy.org.bd

প্রকাশিত লেখার জন্য সম্মানী দেওয়া হয়
লেখা ইমেইল বা সিডিতে পাঠানো যায়
sarkeramin@yahoo.com
bacademy1955@yahoo.com

চৈত্র ১৪১৮

সম্পাদক
শামসুজ্জামান খান

সহযোগী সম্পাদক
ড. সরকার আমিন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
রাজিব রায়

সম্পাদনা সহযোগী
আসাদ আহমেদ মাহবুবা রহমান মো. আবিদ করিম

অক্ষর বিন্যাস
নেহেলী ইয়াসমিন
মোহাম্মদ অলিউল্লাহ খান

মূল্য : ৪০ টাকা

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুল হাই
পরিচালক
ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা

মুদ্রক
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস
মুদ্রণকাল : মে ২০১২

সূ চি প ত্র

সম্পাদকের কথা

পাপেট গুরু
মুস্তাফা মনোয়ার

মুস্তাফা মনোয়ার। বহুমাত্রিক গুণের অধিকারী একজন অসামান্য মানুষ, তাঁর প্রধান পরিচয় চিত্রশিল্পী; বাংলাদেশে পাপেট শিল্পের শৈল্পিক রূপকার।
মুস্তাফা মনোয়ারের জন্ম ১৯৩৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর, ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা থানার মনোহরপুর গ্রামে। তাঁর পিতা প্রখ্যাত কবি গোলাম মোস্তফা ও মাতা জমিলা খাতুন। স্ত্রী মেরী মনোয়ার ছিলেন ঢাকার টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষক এবং ঢাকা মিউজিক কলেজের প্রিন্সিপাল। এছাড়া ন্যাশনাল কারিকুলাম অ্যান্ড টেক্সট বুক বোর্ডে কাজ করেছেন। তাঁর একমাত্র ছেলে সাদাত মনোয়ার বাংলাদেশ বিমানের পাইলট এবং একমাত্র মেয়ে নন্দিনী মনোয়ার চাকরিজীবী।
মুস্তাফা মনোয়ার ১৯৫৩ সালে নারায়ণগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন এবং কলকাতা চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় থেকে ১৯৫৯ সালে ফাইন আর্টসে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। তিনি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন জাপান ব্রডকাস্টিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে

> আমার বড়ো ভাই প্রথমে বললেন, আগে আইএসসিটা পড়ে নাও। কারণ আমি ছোটোবেলা থেকেই নানারকম কারিগরি জিনিসপত্র বানাতাম– এ কারণে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হলাম

(এনএইচকে) শিক্ষামূলক টিভি অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও প্রযোজনা কোর্সে। এরপর বিবিসি লন্ডন, যুক্তরাজ্য থেকে টেলিভিশন প্রযোজনা কৌশল কোর্স এবং এনএইচকে, জাপান থেকে উর্ধ্বতন অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কোর্স সম্পন্ন করেন। ঢাকার আর্ট কলেজে শিক্ষক হিসেবে মুস্তাফা মনোয়ারের কর্মজীবন শুরু হলেও পরে তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনে যোগদান করেন। এরপর একে একে শিল্পকলা একাডেমী ও জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক, বাংলাদেশে শিশু একাডেমীর চেয়ারম্যান এবং এফডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি জনবিভাগ উন্নয়ন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ও এডুকেশনাল পাপেট ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের প্রকল্প পরিচালক। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় তিনি বাংলাদেশে প্রথম সাংস্কৃতিক দলের নেতৃত্ব দেন এবং বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য বিভিন্ন সময়ে সাংস্কৃতিক দলেরও নেতৃত্ব দেন। এছাড়া জনপ্রিয় 'নতুন কুঁড়ি'র রূপকারও তিনি। নাট্যকার ও নাট্যনির্দেশক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত।

মুস্তাফা মনোয়ারের নির্দেশিত ও প্রযোজিত রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' এবং শেকসপিয়রের 'টেমিং অব দ্য শ্রু' অবলম্বনে মুনীর চৌধুরীর অনুবাদ করা 'মুখরা রমণী বশীকরণ'-এর মতো নাটক বাংলা টিভি নাটকের এক মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত। এ নাটক দুটি যুক্তরাজ্যের গ্রানাডা টিভির 'ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি অব টিভি ড্রামা'র জন্য মনোনীত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী' ছাড়াও 'মুক্তধারা', 'ডাকঘর' ও 'স্ত্রীরপত্র' এবং শওকত ওসমানের 'জননী জন্মভূমি' ইত্যাদি নাটকসহ বহুনাটকের তিনি পরিচালনা, সংগীত পরিচালনা ও শিল্পনির্দেশনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বিটিভির পাপেট অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে– 'পারুল', 'বন্ধু বাঘ', 'বাউল', দুই বন্ধু 'বাঘা মেনি ও দৈত্য', 'বক', 'এইডস', 'পাপেট গিট্টু দুষ্টু ছেলে', 'সদাসত্য অ্যান্ড কোং', 'অন্ধমন', 'প্রবাদবাক্য', 'চাকুরি', 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে' ও 'হাতুড়ে ডাক্তার' প্রভৃতি। এছাড়াও তিনি দ্বিতীয় সাফ গেমসের 'মিশুক', ষষ্ঠ সাফ গেমসের 'অদম্য', একাদশ সাফ গেমসের দোয়েল 'কুটুম' নির্মাণে বড় অবদান রেখেছেন। জনপ্রিয় 'মীনা কার্টুন' এবং 'সিসিমপুর'-এর মতো অনুষ্ঠান নির্মাণেও তাঁর ভূমিকা প্রশংসনীয়।

কাজের স্বীকৃতি হিসেবে মুস্তাফা মনোয়ার ১৯৫৭ সালে পেয়েছেন কলকাতার একাডেমিক অব ফাইন আর্টস আয়োজিত নিখিল ভারত চারু ও কারুকলা প্রদর্শনীতে গ্রাফিক্স শাখায় শ্রেষ্ঠ কাজের জন্য স্বর্ণপদক, ১৯৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থায় চারুকলা প্রদর্শনীতে তেলচিত্র ও জলরঙ শাখার শ্রেষ্ঠ কর্মের জন্য দুটি স্বর্ণপদক, টিভি নাটকের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ১৯৯০ সালে টেনাশিনাস পদক, চিত্রশিল্প, নাট্য নির্দেশক এবং পাপেট নির্মাণে অবদানের জন্য শিশু কেন্দ্র থেকে বিশেষ সম্মাননা-২০০২, চারুশিল্পে বিশেষ অবদানের জন্য

বাংলাদেশ 'চারুশিল্পী সংসদ' পুরস্কার-১৯৯২, শিশু শিল্পকলা কেন্দ্র কিডস কালচারাল ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম কর্তৃক কিডস সম্মাননা পদক-১৯৯৯, চারুকলা ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠী কর্তৃক ঋষিজ পদক-২০০২, শেলটেক পদক-২০০৪, বিনোদন বিচিত্রা অ্যাওয়ার্ড-২০০৩, পাকিস্তানের রাফি পির থিয়েটার সম্মাননা-২০০০, একুশে পদক-২০০৪, জাতীয় লেখক পরিষদ কর্তৃক নববর্ষ পুরস্কার-১৩৯৭ প্রভৃতি। ১৯ এপ্রিল, ৩ মে এবং ৮ মে গিয়েছিলাম শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ারের বাসায়। জেলজীবন একজন মানুষের সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য? নির্দ্বিধায় যে কেউ বলবেন দুর্ভাগ্য। কিন্তু তিনি বলেন ভিন্ন কথা। ছবি এঁকে তাঁর জেলে যাওয়ার অভিজ্ঞতা, বাংলাদেশে পাপেট শিল্পের বিকাশ এবং কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের গোলাকার লাল সূর্যের প্রতীক তৈরির গল্পসহ নানা কথা উঠে আসে এক আড্ডায়।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ***আনোয়ার মুস্তাফা***

> আমি ভীষণ অবাক হয়েছিলাম তাঁরা নিজের কাঁধে দোষ নিতে চাচ্ছিলেন দেখে। আরেকটি অভিজ্ঞতার কথা মনে আছে। সবাইকে যখন গ্রেফতার করে একটি ঘরের মধ্যে নিয়ে লাঠি দিয়ে মারছিল, তখন যাঁরা কলেজের ছাত্রনেতা ছিলেন তাঁরা ওপরে তাঁদের পিঠ পেতে দিয়ে আমাদের রক্ষা করেছিলেন, যাতে ছোটোদের গায়ে আঘাত না লাগে

প্রাথমিকভাবে আপনার যে ছবি আঁকার আগ্রহ, তা কীভাবে তৈরি হলো?

আমি তখন খুবই ছোটো। ইনফ্যান্ট ক্লাসে পড়ি। আমার মেজোভাই শিল্পী মুস্তাফা আজিজ ছোটোবেলা থেকেই ছবি আঁকতেন। তাঁর আঁকা দেখে দেখেই আমার ছবি আঁকার শুরু। আমার আব্বা কবি গোলাম মোস্তফাও মাঝে মাঝে ছবি আঁকতেন। আমার আব্বা ও বড়ো ভাই ক্যাপ্টেন মুস্তাফা আনোয়ার ছবি আঁকা খুব পছন্দ করতেন এবং আঁকতে উৎসাহ দিতেন।

চারুকলায় পড়বেন এটা কী আগেই ভেবে রেখেছিলেন?

পড়ব ভেবেছিলাম। কিন্তু আমার বড়ো ভাই প্রথমে বললেন, আগে আইএসসিটা পড়ে নাও। কারণ আমি ছোটোবেলা থেকেই নানারকম কারিগরি জিনিসপত্র বানাতাম– এ কারণে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হলাম। সেটা অত্যন্ত নামকরা কলেজ হওয়া সত্ত্বেও সেখানে ভর্তি হতে পেরেছিলাম। আমার নানারকম সৃজনশীল কাজের প্রকাশ দেখে তখনকার ব্রিটিশ প্রিন্সিপাল আমাকে ভর্তির অনুমতি দেয়। সেখানে এক বছর পড়ার পর যখন মনে হলো, ছবি আঁকার প্রতি আমার আগ্রহ বেশি, তখন চলে এলাম কলকাতা চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে।

ছবি আঁকার জন্য কিশোর বয়সে কারাবরণ করলেন...

যখন আমি নারায়ণগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের নবম
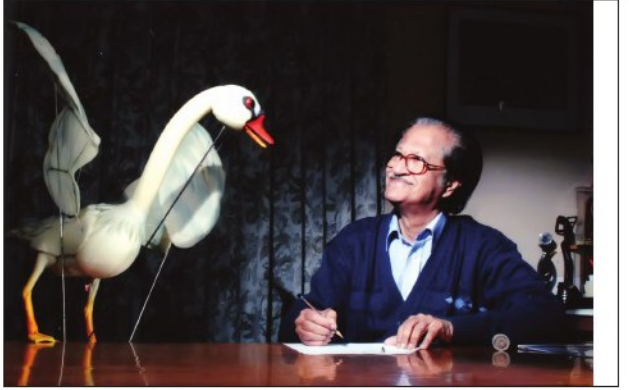
শ্রেণির ছাত্র তখন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। শুনলাম ঢাকায় রাজপথে ভাষা আন্দোলনকারীদের ওপর গুলিও চলেছে। যেহেতু আমি ছোটোবেলা থেকেই ছবি আঁকতাম তাই ভাবলাম কার্টুন এঁকে প্রতিবাদ করা যায় কি না। যেই ভাবা সেই কাজ– অনেক রকম কার্টুন এঁকে পোস্টার আঁকা শুরু করলাম। কয়েকজন বন্ধু মিলে সেই কার্টুন আঁকা পোস্টার নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে সেঁটে দিলাম। বিশেষ করে যেখানে মানুষজনের ভিড় বেশি সেখানে। কার্টুন আঁকা পোস্টার সেঁটে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখতাম। সাধারণ মানুষ তা দেখে প্রশংসা করত। এ মুহূর্তে একটা ছবির কথা মনে পড়ছে– এক মাকে গলা চেপে ধরেছে তিন চারটে হাত; তবুও সে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' বলছে। এরকমভাবে নানা কার্টুন এঁকেছিলাম। কার্টুন আঁকার ফলেই আমি একসময় গ্রেফতার হলাম। আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। সেখানে প্রায় এক মাস রাখা হলো। তারপর অনেক কষ্টে ছাড়া পেলাম। এ ছিল আমার জীবনের এক পরম সৌভাগ্য। কারণ রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য আমাকে অল্প বয়সে জেলে যেতে হয়েছিল। এটা আমার জীবনের এক বিরাট পুরস্কারও।

জেলজীবনের কোনো অভিজ্ঞতার কথা বলুন।

ওখানের অভিজ্ঞতা হলো, আমার সঙ্গে কয়েকজন ছাত্রনেতাও গ্রেফতার হয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে ছবিগুলো কে এঁকেছে, তাহলে তুমি তা কখনো স্বীকার করবে না। আমাদের নাম বলবে। আমি ভীষণ অবাক হয়েছিলাম তাঁরা নিজের কাঁধে দোষ নিতে চাচ্ছিলেন দেখে। আরেকটি অভিজ্ঞতার কথা মনে আছে। সবাইকে যখন গ্রেফতার করে একটি ঘরের মধ্যে নিয়ে লাঠি দিয়ে মারছিল, তখন যাঁরা কলেজের ছাত্রনেতা ছিলেন তাঁরা ওপরে তাঁদের পিঠ পেতে দিয়ে আমাদের রক্ষা করেছিলেন, যাতে ছোটোদের গায়ে আঘাত না লাগে। পিঠ পেতে দিয়ে সেদিন তাঁরা আমাদের বাঁচিয়েছিলেন। তখনকার ছাত্রনেতাদের আদর্শই ছিল অন্যরকম।

ছবি আঁকার পাশাপাশি আপনি গানও করতেন, কীভাবে গাইতে শুরু করলেন?

আমি ছোটোবেলা থেকেই গান করি এবং পরে উচ্চাঙ্গসংগীত শিখতে শুরু করি।

তারপর আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই গানের জগতের বিখ্যাত ওস্তাদ ফইয়াজ খাঁর ছাত্র ওস্তাদ সন্তোষ রায়ের কাছে রাগসংগীত শিখেছিলাম। তখন পল্লীসংগীত আর গজলও করতাম। হিজ মাস্টার ভয়েজে একটা কম্পিটিশন হলো, সেখানে চারজন শিল্পী সিলেক্ট হয়েছিল, তার মধ্যে আমিও ছিলাম। বাকি তিনজনের মধ্যে দুজনের নাম মনে আছে। একজন হলেন বশীর আহমেদ, যিনি পরে ঢাকায় এসে প্রসিদ্ধ সংগীত শিল্পী হয়েছিলেন। আরেকজন হলেন কলকাতার বিখ্যাত শিল্পী সুবীর সেন। তবে আর্ট কলেজে পড়ার কারণে আমার সংগীতচর্চা কিছুটা ব্যাহত হয়েছিল। ছবি আঁকার প্রতি বেশি মনোনিবেশ করলেও গান থেকে আমি কখনোই দূরে সরে যাইনি। গান রচনা এবং সুরারোপ করার চেষ্টা চালিয়ে যাই। আমাদের পাপেটের যতগুলো অনুষ্ঠান হয় কিংবা নাটক হয় তার গানগুলো আমি রচনা করি এবং সুর দিই।

কোন ধরনের গান আপনার ভালো লাগে?

এক কথায় বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের গান সবচেয়ে ভালো লাগে, সবচেয়ে প্রাণে লাগে। কারণ তাঁর গানের বাণী ও সুরের সম্মিলনে পূর্ণ নান্দনিক বোধের এক অপূর্ব প্রকাশ ঘটে।

এমন একটি গান যা আপনি গুনগুনিয়ে গেয়ে থাকেন...

রবীন্দ্রনাথের অনেক গানই গাই। একেক সময় একেকটি। তবে 'আজ খেলা ভাঙার খেলা', 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' গানগুলোসহ অনেক গান আত্মার ছোঁয়ায় বেরিয়ে আসে এবং মনে মনে সব সময় আলোড়িত হতে থাকে।

শৈশবের কোন স্মৃতি আপনাকে ভীষণ নাড়া দেয়?

শৈশবে আমরা পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলায় থাকতাম। আমার আব্বা ছিলেন কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাস্টার। আমাদের বাড়িটা ছিল গঙ্গা নদীর ধারে হুগলির মেইন রোডের পাশে। কাছেই ছিল হুগলি জেলখানা। যাঁরা স্বদেশি আন্দোলন করত তাঁদের কোর্টে নিয়ে যাওয়া হতো কাভার্ডভ্যানে চড়িয়ে। ভ্যানের ভেতর

থেকে তাঁরা 'বন্দে মাতরম', 'বন্দে মাতরম' বলে চিৎকার করত। দূর থেকে সেই চিৎকার শুনে আমি দৌড়ে রাস্তায় চলে আসতাম এবং তাঁদের গাড়ির দিকে দৌড়ে যেতাম আর ছেলেরা মিলে 'বন্দে মাতরম', 'বন্দে মাতরম' বলতাম। অনেক বাড়ির মা-বাবা তাড়াতাড়ি করে তাঁদের বাচ্চাদের টেনে বাসায় নিয়ে যেতেন। কারণ ব্রিটিশ আমলে স্বদেশিদের এভাবে উৎসাহ দেওয়াটা অন্যায় বলে মনে করা হতো। সেটা আমার এখনো মনে পড়ে। জেলখানার কয়েদিরা কেন 'বন্দে মাতরম' বলে এবং কেন তাঁদের জেলখানায় রাখা হয়– বড়োদের কাছে এ প্রশ্ন করায় তাঁরা বলেছিলেন, যাঁরা বন্দি হয়েছেন তাঁরা দেশ স্বাধীন করার ব্রত নিয়ে বন্দি হয়েছেন। এই হুগলি জেলেই বন্দি ছিলেন আমাদের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি যে সেলে বন্দি ছিলেন সেই সেলটি একসময় আব্বা আমাকে দেখিয়েছিলেন। তখন ভেবেছিলাম, কবিরা কত সুন্দর করে কবিতা লেখেন, তাঁরা জেলে যাবেন কেন? এখন বুঝি মানুষের আদর্শ থেকেই তৈরি হয় আত্মত্যাগী মনের জোর।

এ দেশের পুরাকালের ঐতিহ্যমণ্ডিত পুতুল নাচ বা পাপেট শিল্পের বিকাশের জন্য আপনি সার্বিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের পাপেট শিল্পের কথা বলুন।

বাংলাদেশের পাপেট শিল্পকলার ঐতিহ্য ও স্বকীয়তা বজায় রেখে নতুন আঙ্গিকে পাপেটের পুনর্জাগরণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কলকাতার আর্ট কলেজে পড়ার সময় আমি রাজস্থানে প্রথম পাপেট দেখি। সেখানে পাপেটের যে স্কাপচারাল কোয়ালিটি সেটা আমার খুব ভালো লাগে। পরে ওরকমভাবে অনেক মুখটুক বানালাম। ধীরে ধীরে পাপেট নির্মাণ করলাম। শুধু পাপেট নির্মাণ নয়, পুরো পাপেট মুভমেন্টটাই ভালো লেগেছিল। একটা মানুষকে মানুষ হিসেবে চালনা করতে গেলে সিলেকটিভ ও লিমিটেড মুভমেন্ট চয়ন করতে হয়। এটা আমার কাছে অত্যন্ত সৃজনশীল একটি অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ বলে মনে হয়। সেজন্যই আমার পাপেটের দিকে আসা। ঢাকা আর্ট কলেজে শিক্ষকতা শুরুর পর কয়েকজন ছাত্রকেও শিখিয়েছিলাম। বাংলাদেশ টেলিভিশনে যখন যোগদান করলাম তখন বুঝলাম যে পাপেট নিয়ে একটা বিরাট কাজ হতে পারে। আস্তে আস্তে পাপেটকে উন্নত করলাম। যাঁরা গ্রামীণ পাপেট শিল্পী ছিলেন তাঁরা সুতো দিয়ে পাপেট চালনা করতেন। সেগুলো ছিল অত্যন্ত শৈল্পিক। পাকিস্তান আমলে ধর্মীয় কারণে পাপেট শিল্পীর দলগুলো প্রায় বিতাড়িত হয়েছিল দেশ থেকে। একটি-দুটি দল ছাড়া বাংলাদেশে কেউ পুতুল নাচের চর্চা করত না। পরে যাঁরা ছিলেন তাঁদের বাংলাদেশ টেলিভিশনে অনেক সুযোগ করে দিয়েছিলাম। বর্তমান বিশ্বে পাপেট নানারকমভাবে, নানান আঙ্গিকে টেলিভিশন অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করছে। আমাদের দেশীয় আঙ্গিকে পাপেট নিয়ে আধুনিক ব্যাপ্তি দিয়ে পুনরায় এ শিল্পকলাকে গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

এতে বোঝা যায় যে, আপনি পাপেটের আধুনিক সংস্করণ করেছেন।

আধুনিক সংস্করণ মানে কিন্তু যান্ত্রিকতা নয় এবং যন্ত্র দ্বারা চালিত পুতুল কিন্তু পাপেট নয়। মানুষের হাতের ছোঁয়া দিয়েই সব রকম অঙ্গভঙ্গি চালনা করা হয়। আমাদের পাপেটও যন্ত্রচালিত পাপেট নয়, তবে আধুনিক মিডিয়ার নানারকম চাহিদা আছে, যেমন টেলিভিশনের পাপেটে অনেক রকম অতিরিক্ত অঙ্গভঙ্গির প্রয়োজন হয়। এই অতিরিক্ত অঙ্গভঙ্গি করার কৌশলগত প্রক্রিয়ারই সংযোজন করা হয়েছে। আমাদের পাপেটের পোশাক-পরিচ্ছদ, মুখ– সবই সেই পুরাকালের

পাপেটের আঙ্গিকেই হয়ে থাকে।

তাহলে তো আপনাকে আধুনিক পাপেটের জনক বলা যায়...

আধুনিক মানে এই নয় যে, একেবারে আমাদের দেশের সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য ছাড়া। আমাদের পাপেটের চেহারাটেহারা সবই কিন্তু সেই রূপকথার মতো। দেশজ যে ভঙ্গি আছে, সেটা নিয়ে আমরা ডেভেলপ করেছি। আধুনিক মানে কিন্তু বিদেশি পাপেটের অনুকরণ নয়।

আপনার সৃষ্ট পাপেট এবং দেশীয় পাপেটের আঙ্গিকগত পার্থক্য কী?

আগে ছিল সুতো দিয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়াবার পাপেট। আর আমারটা হচ্ছে রড পাপেট বা দ- পাপেট। দ- পাপেট অবিভক্ত বাংলাদেশের বীরভূম জেলায় প্রচলিত ছিল, যা বাঁশের পাপেট হিসেবে পরিচিত। ওটা নিচের দিক থেকে অপারেট করা হতো। আর ওপরটুকু শুধু দেখা যেত। আগেকার দ- পাপেটের আদল নিয়ে
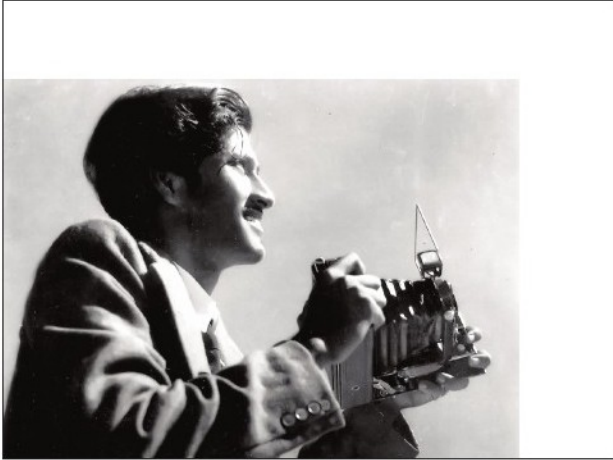
নানারকম কৌশলগত প্রযুক্তি সংযোজন করে আমার পাপেট তৈরি হয়েছে, যা নানা অঙ্গভঙ্গি অত্যন্ত সহজেই করতে পারে।

আর আমাদের দেশে পাপেটের শুরুটা কবে?

এখানে প্রায় ৮০০ বছরের নিদর্শন পাওয়া যায়। পুরাকালের অনেক পুথিতে পুতুল নাচের বর্ণনা দেওয়া আছে।

সকল শিল্পীরই চিত্র প্রদর্শনী হয়। আপনার প্রথম প্রদর্শনী কোথায় হয়েছিল?

কলকাতায়।

এটা কত সালে?

১৯৫৮ সালে।

এরপর কি আর কোনো প্রদর্শনী হয় নি?

তবে এককভাবে সেটাই ছিল প্রথম। এরপর আরো অনেক হয়েছে, তা ছিল যৌথ

প্রদর্শনী। দেশে-বিদেশেও হয়েছে, তবে কলকাতায় অনেক করেছি।

বারবার আপনি সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এ মহৎ কাজেরই অংশ শহীদ মিনারের পেছনের লালরঙের সূর্যের প্রতীক...

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের শহীদ মিনার গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর নতুনভাবে শহীদ মিনার নির্মিত হলো। স্বাধীনতার পর প্রথম ভাষা দিবসের আগে শহীদ মিনার সাজানোর জন্য একটি কমিটিও গঠন করা হলো। তাঁদের অনেকের মত ছিল, শহীদ মিনারের পেছনে মেডিকেল কলেজ ও মেডিকেল কলেজের বারান্দাসহ যে বাড়িগুলো আছে, তা যাতে দেখা না যায় সেজন্য ওখানে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঢেকে দিতে। আমি বললাম, মুক্তির সন্ধান দিয়েছে যে স্মৃতিস্তম্ভ, সেখানে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখলে বন্দিশালা মনে হবে। ওটা খোলাই থাক। বরং পেছনের কিছুই চোখে পড়বে না– এমন একটা কাজ করতে চাই। তখন দায়িত্বটা আমার ওপর দেওয়া হলো। শহীদ মিনার দেখে আমি শুধু একটা লাল সূর্যের পরিকল্পনা করলাম। সেই যে শহীদ মিনারের পেছনে লাল সূর্য স্থাপন করা হলো তা পরে আর কোনো ভাষা দিবসেই পরিবর্তনের প্রশ্ন উঠল না। ওটা একটা চিরন্তন প্রতীক হিসেবে রয়ে গেল। এখন শহীদ মিনার মানেই লাল সূর্য। একসময় শহীদ মিনারের লাল সূর্যটি লাল কাপড়ের বদলে একটি স্থায়ী মেটালসিটের ওপরে লাল রঙ দিয়ে তৈরি করার ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব হয়েছিল। আমি বললাম, ভাষা দিবস ৮ ফাল্গুন। আর ফাল্গুন মানে বসন্তকাল। এ সময় প্রতি গাছে গাছে যেমন নতুন করে ফুল ফোটে তেমনি এই শহীদ মিনারের লাল সূর্যটিও ফুলের মতো প্রতিবারই নতুন করে লাল কাপড়ে সেজে উঠবে নতুন সূর্যের প্রতীক হয়ে।

আমাদের দেশে আধুনিক শিল্পকলার শুরুটা কীভাবে?

বাংলাদেশে এর প্রথম প্রচেষ্টা ঘটে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের শৈল্পিক সত্তা ও আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণের মধ্য দিয়ে। তাঁরই উৎসাহে আধুনিক শিল্পকলার সুবর্ণ পথটি নির্মিত হয়। চিত্রশিল্পী কামরুল হাসানও এ পথেরই সহযাত্রী ছিলেন। এস এম সুলতান, শফিউদ্দীন আহমেদ, মোহাম্মদ কিবরিয়া– এঁদেরই উৎসাহে তাঁদের ছাত্ররা প্রথমে বিভিন্ন দেশে গিয়ে আধুনিক শিল্পকলার আঙ্গিক শুরু করে। আধুনিক মানে একেবারে বিদেশি ছবি আঁকতে হবে তা নয়; দেশীয় লোকশিল্পকে আধুনিক চিন্তাধারার আঙ্গিক দিয়ে সাজাতে হবে।

আধুনিক শিল্পবোধকে নানাভাবে জাগ্রত করে আধুনিক শিল্পকলার মননকে চিত্রায়িত করেছেন বিশেষ করে আমিনুল ইসলাম, হামিদুর রহমান, মুর্তজা বশীর, কাইয়ুম চৌধুরী, আব্দুর রাজ্জাক, রশীদ চৌধুরীসহ অনেক প্রতিভাবান শিল্পী। এখান থেকেই আধুনিক শিল্পকলার মনন গঠন ও চর্চা বেগবান হয়।

আধুনিক শিল্পকলা এবং আমাদের নিজস্ব শিল্পের মধ্যে সম্পর্ক কী?

এ বিশ্লেষণে অনেক কথা বলতে হয়। এই ছোট্ট পরিসরে তা বলা হয়ত সম্ভব নয়। আসলে নিজস্ব যে শিল্পের গতিধারা সেটা কালের পরিক্রমায় নতুনরূপ ধারণ করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'শিল্পীর মনটা নিজস্ব; কিন্তু কালটা তাঁর নিজের নয়, কালটা সারা বিশ্বের।' কতগুলো শৈল্পিক ফিলোসফি কালের আবর্তনে মত ও পথ পরিবর্তন করে। তবে অনেক ক্ষেত্রে আবার নতুন করে দেশজ শিল্পকলায় অনুপ্রাণিত হয়ে এ দেশের শিল্পকলাকে নতুনরূপে, নতুন মননে, নতুন আকাঙ্ক্ষায় উদ্ভাসিত করে। তবে সরাসরি বিদেশি কোনো অনুকরণ দেশের জন্য মঙ্গলময় নয়।

জয়নুল আবেদিন এবং এস এম সুলতান সম্পর্কে কিছু বলুন।

জয়নুল আবেদিন সম্পর্কে বলে শেষ করা যাবে না। কারণ আজকের যে শিল্পকলার আন্দোলন, বিচরণ, প্রকাশ এবং ব্যাপ্তি সবই জয়নুল আবেদিনের দিকদর্শনে রূপ নিয়েছে। তিনি যে কত সহজে একটা দেশের দুর্দিনে, দুর্ভিক্ষের সময় মন-প্রাণ উজাড় করে দিয়ে ছবি এঁকেছেন– শিল্প সৃষ্টিতে সেটা সত্যিই এক অসাধারণ শিল্পসম্ভার। জাতির সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে যে সম্পৃক্ততা কাম্য, এ বোধটি জয়নুল আবেদিন শিল্পীদের দীক্ষা দিয়েছেন। দুর্ভিক্ষের সময় আশ্চর্যভাবে মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও পরাধীনতার অভিশাপের চরম পরিণতির চিত্র তুলে ধরেছেন তিনি। এসব দৃশ্য চিরন্তন দলিলে পরিণত করেছেন তাঁর বলিষ্ঠ তুলির উচ্চারিত রেখা দিয়ে।

এস এম সুলতানও অসাধারণ এক শিল্পী। কিন্তু তাঁর কাজ একটু রূপকধর্মী ছিল, তাঁর রূপ অন্যরকম। তিনি চেয়েছিলেন আমাদের দেশের কৃষকরা যেন বলিষ্ঠ হয়। তাঁদের আন্দোলন, তাঁদের সব কিছু মিলেই যেন কৃষকরা জাগ্রত হয়। সমাজবহির্ভূত, বঞ্চিত একটি সমাজ হিসেবে যেন কৃষকরা অবহেলায় পড়ে না থাকে। এই তাঁর মনের ভাব ছিল। সেজন্য তিনি বলিষ্ঠ কৃষক এঁকেছেন। একজন বলিষ্ঠ কৃষকই এ দেশকে উজ্জীবিত এবং জাগ্রত করতে পারে এবং সমাজের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে। এ বিশ্বাসেই তাঁর শিল্পসম্ভার গড়ে ওঠে।

এদেশের তরুণ চিত্রশিল্পীদের নিয়ে কিছু বলুন।

তরুণ শিল্পীদের একটা কথা বলতে চাই, যে করেই হোক, আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। একেবারেই বিদেশি আঙ্গিক নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না। যদিও আমরা বলি এখন বিশ্ব ছোট হয়ে গেছে, বিশ্বের চিন্তাধারা প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে; তবুও বলব, দেশের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সঙ্গে যেন আধুনিকতার অকারণ মিশ্রণ না ঘটে, যদিও এখনকার তরুণরা সে চেষ্টাই করে যাচ্ছে। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা বিভিন্ন আঙ্গিকে নতুন নতুন চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটাচ্ছে।

একজন শিল্পী হয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে ও মাধ্যমে কাজ করছেন। এটা কীভাবে সম্ভব হলো?

একজন শিল্পী বোধহয় এটা পারে। কারণ আমি ছোটোবেলায় ছবি এঁকেছি, গান শিখেছি, নাটক করেছি, লোহালক্কড়, ফেলনা যন্ত্রপাতি দিয়ে নানা রকম জিনিসপত্র বানিয়েছি– সবকিছু মিলিয়ে আমার মধ্যে নানা দিকে যাওয়ার আগ্রহ ছিল। স্কুলজীবন থেকে ফটোগ্রাফি করতাম। নিজে নিজে ডেভেলপ করতাম, প্রসেস করতাম, প্রিন্ট করতাম, এনলার্জ করতাম। বিস্কুটের টিনের কৌটা কেটে এনলার্জারও বানিয়েছিলাম। আব্বার একটা ক্যামেরা ছিল– জিইস আইকন। সেটা সামনে লাগিয়েই এনলার্জারটা বানিয়েছিলাম। সব মিলিয়ে একটা সংমিশ্রণ ছিল। আর এখনকার শিল্পীদের মাল্টিমিডিয়া এপ্রোচ রাখতে হয়, আমার মধ্যে সেই মাল্টিমিডিয়া এপ্রোচটা বেশ গভীরভাবেই ছিল।

দীর্ঘ জীবনে আপনি নিশ্চয়ই একটা সময়কে আপনার জীবনের সেরা সময় হিসেবে দেখেছেন। সে সময়টা কখন ছিল বলে মনে করেন?

সেরা সময় অবশ্যই ছাত্রজীবন। তখন নানাভাবে আমার মত ও পথ বিস্তৃত হচ্ছে। কত কি জানতে পারছি, শিখতে পারছি, ভাবতে পারছি, কল্পনা করতে পারছি– সেটাই বোধহয় আমার জীবনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সময়। সে সময় প্রতিবাদ করতে শিখেছি। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের জন্য জেল খেটেছি। সবকিছু মিলে একটা প্রতিবাদী ভাবও আমার মধ্যে ছিল, সেটা বোধহয় ছোটোবেলার 'বন্দে মাতরম'

শোনা থেকেই। আর আমরা হুগলিতে যে জেলখানার কাছে ছিলাম, সেখানে একসময় আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও বন্দি ছিলেন। সেসব গল্পও শুনেছি। সুতরাং একটা প্রতিবাদী ভাব আমার মধ্যে ছিল। সেই ছাত্র জীবনই বোধহয় মানুষের তৈরি হওয়ার সবচেয়ে বড়ো সময়, আনন্দের সময়। সেসময়ই আমার জীবনের সেরা সময়। পরিবারের সকলের অবদানেই সেটা সম্ভব হয়েছিল।

এমন একজন ব্যক্তির কথা বলুন যিনি সেরা ব্যক্তি হিসেবে আপনার জীবনকে পালটে দিয়েছেন।

এককথায় বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কিছু। তাঁর ছোটোবেলা থেকে শুরু করে, সংগীত, শিল্পচর্চা, শিল্পসাধনা, সাহিত্যসাধনা তো বটেই। আর তাঁর যে শিল্পচিন্তা, সেটা এক অসাধারণ চিন্তা। তিনি আধুনিক মানুষের এত বড়ো একজন প্রবর্তক। আমরা আধুনিক হতে শিখেছি রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে, রবীন্দ্রনাথের গান শুনে, সাহিত্য পড়ে এবং চিত্রকলা দেখে। সে জন্যই বলছি,

তিনি একমাত্র ব্যক্তি, যাঁকে নিয়ে বহুদূর এগোনো যায়। তাঁর শেষ নেই। এখনো আমরা প্রতিদিনই তাঁর কিছু না কিছু লেখা পড়ে নতুনভাবে বিশ্বকে দেখছি। বিশ্বমানবতাকে বুঝতে শিখছি। তাঁরই কথাই বলি, 'ওই মহামানব আসে।' কবিই এসেছেন সেই মহামানব হয়ে।

আপনার পড়া সেরা বই কোনটি, যা এখনো পড়তে ভালো লাগে?

সেরা বই হিসেবে আমার কেন জানি রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটক বারবার পড়তে ভালো লাগে। এতে নানারকম কথা জমা আছে। আমার কাছে এটা যেন ঠিক নাটক নয়। এতে বিভিন্ন মনের কথা আছে, জাগরণের কথা আছে, এই পৃথিবীর কথা আছে– সেজন্য আমার ভালো লাগে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন মানুষের যে চরিত্র 'রক্তকরবী'তে ফুটিয়ে তুলেছেন তা জানতে পেরে, বুঝতে পেরে নিজেকে উৎসারিত করেছি।

একান্তে বসে কী ভাবেন, যা বাস্তবায়িত হয়নি?

একান্তে ভাবি, ছোটোদের শিক্ষাব্যবস্থা কেন জানি বড়ো বেশি বাঁধাধরা নিয়মে ভরা। মনে হচ্ছে, তাদের দেখাশোনার জন্য সব সময় একজন পাহারাদার পেছনে লেগে আছে। সে তাকে বারবার বারণ করছে এটা করো না, ওটা করো না। আসলে ছোটোরা মুক্ত স্বাধীনতা পাচ্ছে না। ছোটোবেলায় আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছিলাম এখনকার বাচ্চারা তা পাচ্ছে না। তাদের জন্য মানবিক স্বাধীনতা ভীষণ প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো আনন্দ নেই এবং শিশুশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কল্পন-শক্তি বিস্তার করা।

আমাদের শিশুদের মধ্যে যেন সেই আনন্দমুখর পরিবেশ ছড়িয়ে পড়ে– সে জন্য আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় পাপেট শিল্পকলার প্রসার ঘটিয়ে তাদের আনন্দ দিতে চেষ্টা করছি। সেই আনন্দের মধ্যে অনেক কিছু রয়েছে। শিক্ষা তো আছেই। শিশুরা নিজেকে চেনার, জানার এবং মত প্রকাশের যেন সাহস পায় সেরকম চরিত্র, গল্প আমরা নির্বাচন করি। আমাদের লোকসাহিত্য থেকে এবং বিশ্বসাহিত্য থেকে
নানারকম চিরন্তন গল্পগুলোকে নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উপস্থাপন করছি।

এ বয়সে এসে নতুন কোনো পরিকল্পনা কি করছেন?

দেশের বিভিন্ন আন্দোলনের সময় আমি অনেক ছবি এঁকেছিলাম এবং রঙতুলির মাধ্যমেই বিক্ষিপ্ত এবং প্রতিবাদী মনকে প্রস্ফুটিত করতে পেরেছিলাম। এখন আবার সেই বলিষ্ঠ দেহের ছবি, বাংলাদেশের বুকভরা প্রকৃতির ছবি আঁকতে চেষ্টা করছি। এ ছাড়া পাপেট শিল্পকলা দিয়েও নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছি। পাপেট থিয়েটার নানাভাবে শিশুশিক্ষাকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। আমি দেখেছি বিভিন্ন দেশে শিশুশিক্ষার একটা কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে পাপেট। এ প্রক্রিয়ায় সেখানে অত্যন্ত ভালো ফলও অর্জন করতে পেরেছে। তেমনভাবে আমরাও চাই শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থায় পাপেট কিংবা এ ধরনের কোনো মিডিয়া ব্যবহার করা হোক। কেবল চিন্তাহীন অঙ্ক আর কিছু বাঁধাধরা নিয়ম নয়, শিশুদের স্বাধীনভাবে মুক্তচিন্তা করার অবকাশ দিতে হবে। শিশুরা কেবল দেশের মাটিকে নয়, তার সঙ্গে যদি ভাষা, দেশের সংস্কৃতি অঙ্গনের সকল ঐশ্বর্য চিনতে পারে, জানতে পারে এবং ব্যবহার করতে পারে, তাহলেই শিশুদের মধ্যে প্রকৃত

বাংলা সভ্যতার কয়েকটি দিক

অমর্ত্য সেন

বিশ্ব বাঙালি সম্মেলনে আসার সুযোগ পেয়ে নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে করছি। পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকে বাঙালিদের একত্র করে বৈঠক বসানোর মধ্যে যেমন চিন্তার প্রসারতার পরিচয় আছে, তেমনি আছে তাতে সৎ সাহসের প্রমাণ। এই সম্মেলন এবং উৎসবের কা-ারিদের অভিনন্দন জানানোর কারণ আমাদের সত্যিই আছে। এ ধরনের সম্মেলন করতে রাজনৈতিক অথবা সামাজিক কোনো সমস্যা নেই তা আমি বলছি না। তাই নজরুল ইসলামের 'কা-ারি হুঁশিয়ার' এই উপদেশের প্রয়োজন আছে, এটাও বোধ হয় ঠিক। কিন্তু হুঁশিয়ারি করেও যে প্রশস্ত ও মহান বিশ্বাসের পরিচয় এই সম্মেলনে আছে তার স্বীকৃতি জোর গলায় দেওয়ার কারণ আছে বলে আমি মনে করি।

বাঙালির সভ্যতার ভিত্তিতে যে অর্থনৈতিক সামর্থ্যের সাহায্য আছে সে কথাটা এ প্রসঙ্গে বোধ হয় বলা যেতে পারে, কারণ দারিদ্র্য আর অভাবতার প্রভাব আমাদের চিন্তাধারায় ইদানীং খুবই বেশি। কিন্তু এই অভাবগ্রস্ত অবস্থা বাঙালির ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো সত্য এটা কিন্তু একেবারেই নয়

রাজনৈতিক নানা কারণে এবং ইতিহাসের ঘটনাক্রমে প্রাচীন বাংলাদেশ এখন বিভক্ত। কিন্তু বাঙালির একাত্মতার ভিত্তি প্রধানত রাজনৈতিক নয়। সাহিত্য, কাব্য, সংগীত এবং চিন্তা-নির্ভর সভ্যতার ঐক্যের জোর রাজনীতি থেকে কম নয়। তারই সঙ্গে আছে আমাদের সমাজ চেতনার চিন্তামুখী আলাপ আলোচনা। তার প্রভাব রাজনীতির ওপর পড়বে না। এমনটিই নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু সেই নৈকট্যের ভিত্তি একমাত্র রাজনীতিতে নয়। এই বিশ্ব বাঙালির সম্মেলন সেই একতাটিকে আর একটু বড়ো করবে। যেমন করেছিল ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় রবীন্দ্রসংগীতের উৎসব।
কবি জসীমউদ্‌দীনের অন্য প্রসঙ্গে লেখা একটি কবিতার সাহায্য নিয়ে আমরা বলতে পারি :

'কেয়া পাতার নৌকা ভরে
আনব ফুলের বাস
তোমার সনে আমার সনে
আলাপ বার মাস।'

বাঙালির সভ্যতার ভিত্তিতে যে অর্থনৈতিক সামর্থ্যের সাহায্য আছে সে কথাটা এ প্রসঙ্গে বোধ হয় বলা যেতে পারে, কারণ দারিদ্র্য আর অভাবতার প্রভাব আমাদের চিন্তাধারায় ইদানীং খুবই বেশি। কিন্তু এই অভাবগ্রস্ত অবস্থা বাঙালির ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো সত্য এটা কিন্তু একেবারেই নয়।
অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ অ্যাডম স্মিথ তাঁর লেখাতে সেই যুগে বাংলাদেশকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ধনী দেশগুলোর মধ্যে ধরেছিলেন। বাংলাদেশের সঙ্গে উৎপাদন এবং বাণিজ্যভিত্তিক যোগাযোগ রাখতে খুবই উদ্‌গ্রীব ছিলেন সে সময়কার পর্তুগিজ, ডাচ্, ফরাসি, ইংরেজ, ডেনিশ ও বহু ইউরোপীয় দেশ। ১৭০৩ সালে প্রসিদ্ধ মানচিত্রশিল্পী থর্নটন (Thornton) খুব জোর দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন সেদিনের বাংলাদেশি মানচিত্র; সেটিকে বলেছিলেন, 'The Rich Kingdom of Bengal.' অর্থাৎ ধনী বাংলাদেশের ছবি। আমাদের সাহিত্যের এবং কৃষ্টির অনেক উৎস অবশ্য ধনমুখী নয় যেমন বাউল সংস্কৃতি এবং অন্যান্য হাজার রকমের সুন্দর পল্লি সংগীত আর পল্লিকাব্য। কিন্তু তারই পাশাপাশি চলেছিল শহরমুখী বর্ধিষ্ণু সংস্কৃতির প্রসার প্রবন্ধ, সমালোচনা, কবিতা, কাহিনি, গানবাজানার সুব্যবহার করে। সেই ইতিহাসটিকেও মানার প্রয়োজন আছে, কারণ বাঙালির চিন্তাধারার সাবলীলতার মধ্যে যেমন আছে আমাদের পল্লিজীবনের সামর্থ্য, তেমনি আছে আমাদের শহুরে জীবনের সমৃদ্ধির পরিচয়।

বাঙালির চিন্তাধারার ঐতিহ্যের মধ্যে কয়েকটি দিকের ওপর নজর দেওয়ার কারণ আমাদের আছেজ্জ আজকেও খুব বেশি করেই আছে। তার মধ্যে একটি গুণ বাঙালি সভ্যতার গ্রহণশক্তি এবং সমন্বয় প্রীতি। গত ডিসেম্বরে যখন আমি বাংলা একাডেমীতে কিছু কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম তখন আমি আলোচনা করেছিলাম আমাদের নানা উৎসের শব্দ গ্রহণ করার বাহাদুরি বিষয়ে। সংস্কৃত, পালি, ফারসি, আরবি, ইংরেজি এবং আদিবাসী নানান উৎস থেকে শব্দ গ্রহণ করতে বাংলাভাষা কোনো রকম ইতস্তত করে নি। অনেক সময় এই পরিভাষার সমৃদ্ধির মধ্যোব্দ অর্থের সূক্ষ্ম পার্থক্য করার সুযোগ আমরা পেয়েছি এবং এখনও পাই। শব্দচয়ন বিষয়ে সেই আলোচনায় আজ ফিরে যাব না, কিন্তু আমাদের গ্রহণশক্তির পরিচয় বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ দিয়ে ফল্‌সা করা যায়। তার আরেকটি উদাহরণ বরং দিই।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশকে সম্রাট আকবর নতুন একটি ক্যালেন্ডার স্থাপিত করার চেষ্টা করেছিলেন– এই প্রচেষ্টার মধ্যে আকবরের সর্ব-সংস্কৃতির সমন্বতা করার প্রচেষ্টা ছিল। যে বছরে তিনি সিংহাসনে উঠলেন সে বছরটি মুসলিম হিজরি সনে ৯৬৩ এবং হিন্দু শক্ বর্ষপঞ্জিতে ১৪৭৮ (সেটি ইউরোপীয় মতে ১৫৫৬ সাল)। তারিখ-ইলাহি নাম দিয়ে এই ক্যালেন্ডারটি শক্ সনের সূর্যমুখী বর্ষগণ মানল, কিন্তু বছরের হিসাবটি শুরু হলো হিজরি থেকে নেওয়া ৯৬৩ দিয়ে।

এই সমন্বিত ক্যালেন্ডারটি অবিভক্ত ভারতবর্ষের অন্য কোনো অঞ্চলে বেশিদিন চলল না। কিন্তু সেটি নতুনভাবে গ্রহণ করা হলো আমাদের সমন্বয়মুখী বাংলা সন রূপে। এর একটি আশ্চর্য ফল হচ্ছে যে বাঙালি হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সবাই এই সমন্বয়টি আজকেও মানেন। যেমন একজন হিন্দু পূজারি যখন তাঁর কাজে এ বছরের ১৪১৮ সনটিকে আহ্বান জানিয়ে শুরু করেন, তখন তাঁর বোধহয় জানা থাকে না যে এই পূজা উপলক্ষে তিনি স্মরণ করছেন মোহাম্মদের মদিনা যাত্রার পবিত্র দিনের কথা। এই যোগাযোগটি লোকের কাছে স্পষ্ট না থাকতে পারে এই কারণে যে ১৪১৮ সন শুধু যে হিন্দু শক্ সন থেকে ভিন্ন তা নয়, এটি মুসলিম হিজরি সন থেকেও পিছিয়ে পড়েছে, কারণ এটি চলছে সূর্য বছর গুনে ৯৬৩ সন থেকে, অন্যদিকে হিজরি চলেছে সব সময় চন্দ্রমুখী ছোটো বছরের হিসেবে। চান্দ্র বৎসরের দৈর্ঘ্য ৩৫৪ দিন ৮ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট সূর্য বৎসরের গণনায় (৩৬৫ দিন নয়)– সেই কারণেই বাংলা সনের সঙ্গে হিজরি সনের পার্থক্য।

‘ একজন হিন্দু পূজারি যখন তাঁর কাজে এ বছরের ১৪১৮ সনটিকে আহ্বান জানিয়ে শুরু করেন, তখন তাঁর বোধহয় জানা থাকে না যে এই পূজা উপলক্ষে তিনি স্মরণ করছেন মোহাম্মদের মদিনা যাত্রার পবিত্র দিনের কথা ’

বাংলা সভ্যতার নানা উৎস নানাদিক থেকে এসেছে সেটি আমাদের স্বীকার করার প্রয়োজন আছে। যেমন আছে আমাদের গ্রহণশীলতা এবং সমন্বয় প্রীতির মর্যাদা দেওয়া। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন অক্সফোর্ডে হিবার্ট লেকচার দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে তাঁর পারিবারিক সংস্কৃতি হিন্দু, মুসলিম ও পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের সমন্বয়ের ওপর নির্ভরশীল, তখন এই মর্যাদাটি তিনি জোর গলায় ঘোষণা করার চেষ্টা করেছিলেন। কবি নজরুল ইসলাম যখন অন্য প্রসঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন তাঁর নিজের বিদ্রোহী প্রবৃত্তির পার্থক্য করেছিলেন; তখনো রবীন্দ্রনাথকে সম্মান জানিয়েই তিনি তাঁর ভিন্ন মত প্রকাশ করেছিলেন। এর মধ্যে নজরুলের নিজস্ব চিন্তার পরিচয় আছে, কিন্তু এরই সঙ্গে আছে তাঁর প্রশ্নপ্রবণ রবীন্দ্রশ্রদ্ধা :

'ধ্যানশান্ত মৌন তব কাব্য, রবিলোকে
সহসা আসিনু আমি ধূমকেতুসম
রুদ্রের দুরন্ত দূত, ছিন্ন হর জটা
কক্ষচ্যুত উপগ্রহ। বক্ষ ধরি তুমি
ললাট চুমিয়া মোর দানিলে আশিস।'

বাঙালি সভ্যতার মধ্যে গ্রহণশীলতা এবং প্রশ্নপ্রবণতা দুটিই আছে। আজকের এই বিশ্ব বাঙালি সম্মেলনের আমাদের ঐতিহ্যের নানা দিক স্মরণ করার কারণ আছে। যে গুণগুলো এক সময়ে বড়ো রকম স্বীকার পেয়েছে, তার থেকে আমরা বিচ্যুত হয়ে থাকলে, সেই ঐশ্বর্যগুলো ফিরে পাবার চেষ্টা আমাদের করতে হবে। এটি পশ্চাৎমুখী চিন্তার পরিচায়ক নয়। নতুন চিন্তার মধ্যেও– নজরুলের ভাষায় বিদ্রোহী চিন্তার মধ্যেও– অতীতের ও ঐতিহ্যের স্বীকারের প্রয়োজন খুবই প্রশস্ত। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ইতিহাস থেকেও আমাদের আজ দূরত্ব বোধ করার কারণ হয়ত আছে। কিন্তু সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক সব সমৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক প্রসারের প্রচেষ্টাও নিশ্চয়ই চলবে। বাঙালি সম্মেলন আজ সেই সামগ্রিক প্রগতির আহ্বানেই সমবেত হয়েছে।

জসীমউদ্‌দীনের আরেকটি অপ্রকাশিত কবিতা থেকে দুটি কথা বলে শেষ করছি।

'কোথায় জ্যোৎস্না-পুলকিত রাতি
কোথায় পুষ্পরথ
অভাবের জালে আজিকে দৈত্য
ঘিরিয়েছে তব পথ।'

যে অভাবের জাল থেকে আমরা মুক্তি চাই, তা শুধু অর্থনৈতিক নয়– বাঙালি সভ্যতার সব দিকের প্রসারতা আমাদের কাম্য। আমাদের প্রয়োজন– জসীমউদ্‌দীনের ভাষায়– 'জ্যোৎস্না-পুলকিত' জীবন। সেই কামনা ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট হলে বিশ্ব বাঙালি সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ]

মাহবুব লীলেন

প্রাপ্তিযোগ

ভেঙে পড়ার আগে নিজেকে একটু ঠেস দিয়ে দাঁড় করাতে হয় যাতে
ফটোগ্রাফার ভেঙে পড়ার সবগুলো ভাঁজে ফোকাস শার্প করে নিতে
পারে। ভেঙে পড়ার আগে একটু নড়েচড়ে ভেঙেপড়া সবগুলো ভাঁজে
আলো ঢুকতে দিতে হয় যাতে ফটোগ্রাফার সবগুলো ভাঁজ
ঠিকঠাকমতো ক্যামেরাবন্দি করতে পারে। ভেঙে পড়ার আগে একটু
সোজা হয়ে ফটোগ্রাফারের রেডি-ওয়ান- টু-থ্রি শুনে ঝুপ করে ফ্রেম
বুঝে একসাথে ভেঙে পড়তে হয় যাতে ভেঙে পড়ার অ্যাকশনগুলো
ফটোগ্রাফিতে জীবন্ত হয়ে ওঠে...
ধর্ষিত হবার পর লোকালয়ে গিয়ে ধর্ষণকর্ম প্রকাশ করতে হয় যাতে
লোকজন ধর্ষণচিত্র অনুমান করতে পারে। ধর্ষিত হবার পর ধর্ষণপথ
উন্মুক্ত করে হাসপাতালে পরীক্ষা দিতে হয় যাতে ডাক্তারগণ ধর্ষণের
প্রমাণ পেতে পারে। ধর্ষিত হবার পর সাক্ষীসহ ধর্ষণ প্রক্রিয়া বর্ণনা
করে আদালতকে ধর্ষণঘটনা বিশ্বাস করাতে হয় যাতে বিনা তর্কে
সবাই ধর্ষণবিরোধী মিছিলে শামিল হতে পারে...
দরিদ্র হবার সময় খালি হাতে বাজারে যেতে হয় যাতে বিক্রেতারা
কেনাকাটায় অক্ষমতা ধরিয়ে দিতে পারে। দরিদ্র হবার সময়
অনাহারে থাকতে হয় যাতে কেনাকাটার অক্ষমতাটা সবাই বিশ্বাস
করতে পারে। দরিদ্র হবার সময় অনাহারে মারা যেতে হয় যাতে
মৌলিক অধিকার বিষয়ে নাগরিক সমাজ আন্দোলন জমিয়ে তুলতে
পারে...
এবং কেবল তারপর পত্রিকায় পাওয়া যাবে নতুন সুসমাচার যেমন-
ভেঙে পড়া ছবির আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্তি কিংবা ধর্ষকের যাবজ্জীবন
শাস্তির বিধান কিংবা সবার জন্য খাদ্যের রাষ্ট্রীয় নিশ্চয়তা যাতে মরে
যাবার পরে ভেঙে পড়া ধর্ষিত মানুষ খেয়ে দেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ধর্ষকের

সংযুক্তা দত্ত

আক্ষরিক রেলগাড়ি

রোদের ফ্লাইট মিস হয়ে গেলে
বোধের পাখিরা প্রণয়বিরতির কথা ভাবে।
বিশ্বস্ত বায়ুঘণ্টার নিশ্চয়তায় তার অব্যাহত রেলদৃষ্টি–
প্রাত্যহিক বুননের মতোই অবিকৃত থেকে যায়।
রোদকে ছুটি দেবার সময় এসে গেলে;
বাতাসের দুরবিনে তার আর চোখ রাখা হয় না।

কোনো এক দূর শহরের বৃষ্টিতে–
সারাদিন পাখি পাখি মেঘ...
ভেবে দেখেছ? এভাবেই হাওয়ায় হাওয়ায়
পাখিদের তবু পুলিশ জীবন।

জলমগ্ন ঘোষ

ঘুমসংক্রান্তি

পাথরের গায়েও অসাবধানতাবশত লেগে যেতে পারে দেবীর প্রলেপ।
তুমি– রোদ বিষয়ক পুস্তক হাতে হেঁটে যাচ্ছো মাঠশালার দিকে। তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন এক কবন্ধ ঋষি।
আমি এক প্রাচীন পাঠক– অর্বাচীন বটগাছের হাওয়া খেয়ে বেঁচে আছি তিনযুগ। আমি জলমগ্ন ঘোষ– হাওয়া রাশির জাতক; জলের ভিতর প্রাচীন পাখিদের ঘুম হয়ে শুয়ে থাকি।

চন্দন চৌধুরী

আমার জ্বর

কেবল তুমিই পারো
গাছের পাতার মতো কেঁপে কেঁপে মাতৃহীন হতে

অথচ আমার শস্যশোক, পুরোনো ঢেঁকুর থেকে
উঠে আসা লাবণ্যমায়ারা স্মৃতির প্যাকেটে পোড়ে
ভস্মের জাদুতে। কিছু অকৃতজ্ঞ ফুল ছত্রে ছত্রে
বহুবিকেলের চাষ করে–অর্গানের সুরে–
গ-ূষে ছড়িয়ে দেয় অট্টহাসি, ঝাউবন...
আর বলে–ব্রহ্মজাগানিয়া পাখি, কোনো সৌররহস্যের
মৃদু অন্ধকারে–যেখানে অভিজ্ঞতা এখনও মূলত দৃশ্য নয়–
সেইখানে–অদৃশ্যের কোষে প্রকৃত বিস্ময়

এইভাবে, গাছের ডালার মতো কেঁপে কেঁপে
আমার জ্বর আসে অদৃশ্যের বশে।

সুস্মিতা চক্রবর্তী

নৈরাজ্য বসন্তে...

তবু এখনও বসন্ত আসে– কর্মব্যস্ত বাতাসে;
বাহির ঘরকে ডাকে : দেখো, এই রূপ মোহময়!
বাতাসে ফাল্গুন ঘ্রাণ–
ভেসে আসে যেন অবিকল ।

এখনও হয় নি লুট বাতাবি ফুলের ঘ্রাণ;
আমের মুকুলে আজও গন্ধপোকা বয়!
এখনও স্বপ্নেরা বাঁচে ছোটো ছোটো প্রতিরোধে;
গান হয় অন্য কোনো– পাতা-ঝরা সময়ের পর ।

বাজার পায় নি খোঁজ নৈরাজ্য বসন্তে ফের–
কোকিলের উড়ে আসা; ডালে ডালে অসহ্য প্রণয়!

নায়েম লিটু

স্মৃতির দাসত্ব

অনেক জ্বালালো তারা জন্ম থেকে
অনেক হয়েছে তারা নত
মোহের লাবণ্যে

খুবলে নিয়েছি কোটর থেকে
তুলে এনেছি হাতের মুঠোয় রক্তাক্ত
দুটি চোখ

এখন কেবল স্মৃতির দাসত্ব

তাহলে এবার তুমি কাকে
ডেকে এনে পিষে মারবে
হে মহান জাদুকর...

সোহেল মাজহার

অজ্ঞাত স্টেশনে

জীবন একটা লোকাল ট্রেনের গতি মন্থর যাত্রা
অজ্ঞাত স্টেশনে এসে সে দীর্ঘ সময়
মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে ।
সে যেন পলেস্তারা ওঠা ক্ষয়ে যাওয়া নাম ফলকের দূরে
বিস্তীর্ণ মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন এক নিঃসঙ্গ গাছ
তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যায় অলস দুপুর বেওয়ারিশ কুকুর
সিনেমা পোস্টার রঙজ্বলা রোদ বৃষ্টির স্বপ্নে পাওয়া বিজ্ঞাপন
দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ক্লান্ত ভবঘুরে কিছু মানুষ ।

তাকে নিঃস্ব করে ছুটে চলে দ্রুত গতির এক্সপ্রেস
তারা ও জৌলুসের শহরে আলো ঝিকিমিকি

যেভাবে তোমরা হাতে পাও গতি ও লিফটের গুপ্ত চাবি ।

লোকাল স্টেশনের ওয়ার্নিংশব্দের গতি মন্থর হতে হতে
ছড়িয়ে পড়ে দীর্ঘ নৈঃশব্দ্য তোমার আমার স্নায়ুর গভীরে...

জিয়াবুল ইবন

সুড়ঙ্গপথ

বিষকাটালি আর ঢেঁকি ও গিমাশাকে ছাওয়া এই হালট যেখানে গুটিয়ে নিয়েছে একাকিত্বের লেজ, সেইখানে... দাসের ছাড়াবাড়িতে একভিটে ঘর...

ভোরের খিড়কি খুলে তুমি আড়মোড়া ভাঙো। আমিও ভাঙতে চাই... তোমার নাকফুলের সীমা। আঙড়ার ছাই দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে যাও তুমি ঘাটপুকুরে। আমি তো খুব বেশি দূরে নই, তোমাদের উঠোনের শেষপ্রান্তে কাঠমালতির ডালপাতায় ঘেরা সুড়ঙ্গপথ আমাদের এ পাড়াকে নিয়ে যায় বড়ো রাস্তার মোড়ে...

আমি চেয়ে চেয়ে দেখি– চালতাগাছের ফুলবতিস্পর্শে তুমি ঈর্ষায়িত হও। আমি চেখে চেখে দেখি পরাজিতা রাতের শিথিল বসনের ফাঁকে ফাঁকে ছোপ ছোপ উজ্জ্বল অপূর্ণতা

ফজলুল কবিরী

লুটেরা দিনে রঙিন কোকিল

গাছের নরম ডালে ঝুলে আছে প্রসন্ন রোদের তাপ
গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে আসে মাটির উপরে
বাতাসে ওড়ায় ধূলির ওড়না

হাওয়ার কু-লী ভাসিয়ে নেয় রোদমাখা ধুলোর ঘুমন্ত দেহখানি
দূরের পড়শি গাছ শঙ্কা চোখে নিয়ে
দেখে, মৃতসব ধুলোবালি ওড়ে বাতাসের পিঠে

এমন লুটেরা দিনে রঙিন কোকিল এক
উড়ে এসে ঠাঁই নেয় সুঠাম গাছের ডালে
মাথার উপরে ধুলো যায় ভেসে

যারা আজ ভেসে যায় ধুলোঝড়ে
প্রসন্ন-রোদের প্রলোভনে
তাদের স্মৃতির কোনো দাগ থাকবে কি কোলাহলে?

তবু নিসর্গ জানিস তুই
মৃত্যুঘুম শেষে
গাছের শেকড় ধরে পুনরায় জেগে ওঠে ধুলো

হাসান সাব্বির

সার্কাস

দড়ির ওপর পা কাঁপে...

অথচ দড়ির ওপর বিশ্বাস করেই
দৌড়াতে হয় সারারাত!
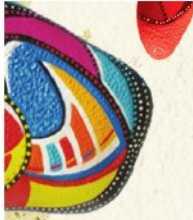
মাসুদ আনোয়ার

নাগরিক খেয়া

দুপাশে দেয়াল খাড়া–ওপরে অসীম নীল
নিরক্ত আকাশ জুড়ে পরাভূত আকাঙ্ক্ষার মৃতদেহ ওড়ে
তা-ব নিশ্বাসে, আর অনুর্বর মৃত্তিকার দেহে
পদচ্ছাপ কেঁপে ওঠে স্বস্তিহীন প্রবাসী সঙ্কোচে।

এখানে শহর জুড়ে কালো কাক উড়ে উড়ে সুচতুর ঠোঁটে
মানুষের বুক খুঁড়ে তুলে নেয় নরম ফসল
পথ পড়ে থাকে আর মানুষেরা চোখ মোছে
হারিয়েছে ঠিকানার খাতা
যান্ত্রিক কলম লেখে ভবিষ্যৎ সুখের বাখান।

মনে হয়, ভালো ছিল বয়সের স্বরবর্ণ অনধিক পাঠ
ভোরের নির্জন ঘাস, প্রান্তরের দূরায়ত ওপারের ডাক
প্রথম নদীর পাড়, যখন আসে নি খেয়া
ইট-কাঠ-পাথরের দুঃসংবাদ নিয়ে।

অদৃশ্য গেলাস থেকে মানুষেরা পান করে বিন্দু বিন্দু জল
অনিবার্য পদক্ষেপে মধ্যাহ্ন পেরিয়ে
মানুষেরা চলে যায় ধীরে ধীরে বিষণ্ন বিকেলে।

মাহমুদ সীমান্ত

নিরুপায়, তোমার অতীতে

তুমি কী এরূপ আর কোনোদিনই দাঁড়াবে না মঞ্চে?
সফল তর্জমা শেষে নিজেকেই অনূদিত ভেবে
ফিরে যাবে নিরুপায়, তোমার অতীতে!

উদাত্ত কণ্ঠের ডাক আর যত বাঁশির যাতনা
পরিণতিহীন সম্ভাবনা, ফিরে যায় কেউ কেউ
সমালোচনার ভয়ে, বিধিলিপি লিখে তার অমোঘ নিয়মে।

বিষ-কাটালির বন, ঝোপঝাড়, নদীচূড়া, ঝরনা
সোনালি ধানের মাঠ বেয়ে—
যে পথে এসেছ তুমি এই নাগরিক ভব্যতায়।

চোখের সাঁঝের মায়া নিরন্তর অপার আকাশ
চুপিচুপি কোন রাই কিশোরীর রুপালি বাসনা
এমন সোনার দেশ! কাব্যময়! তুমি কি ঘোষণা করবে না?

কবি ও কর্মী

আবুল মোমেন

মাহবুব উল আলম চৌধুরীর মুখ্য পরিচয়– তিনি কবি। একুশের প্রথম কবিতার রচয়িতা হিসেবে তাঁর খ্যাতি দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁকে শিক্ষিত বাঙালি চেনে *'কাঁদতে আসি নি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি'*– এই বিপ্লবী চেতনার কবি হিসেবে।

আত্মজীবনীতে খানিকটা আফসোস করে তিনি এই কবিতার কারণে তাঁর অন্য কবিতা ও অন্যান্য পরিচয় একাকার হয়ে যাওয়ার কথা লিখেছেন। কেবল কবি ও কলামিস্ট পরিচয়ে মাহবুব উল আলম চৌধুরীকে সম্পূর্ণ পাওয়া যাবে না। তাঁর পরিচয় আরও ব্যাপ্ত। বহুমাত্রিক মানুষ তিনি।

আত্মজীবনী'*স্মৃতির সন্ধানে*'তে তিনি '*কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি*' সম্পর্কে আরও লিখেছেন : 'এই কবিতা মুহূর্তের সৃষ্টি নয়, এই কবিতা লিখতে আমার দশ বছর সময় লেগেছে। '৪২ সালের ভারত-ছাড় আন্দোলন থেকে শুরু করে '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্যে এর ব্যাপ্তি।' (পৃষ্ঠা ৪৪১)

এ বক্তব্যটা এই কবিকে বোঝার জন্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ । শৈশবে পিতৃহারা এই মানুষটির প্রথম জীবনে বড়মামার সাহচর্য ক্ষুদ্র গণ্ডি ছাপিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বড় সহায় হয়েছিল । কিন্তু কেবল এটুকু তো শিক্ষায় বেড়ে চাকরি বা ব্যবসায়ে সফল হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার রসদ । তাঁর মধ্যে আরও কিছু ছিল । তাঁর সংবেদনশীলতা তাঁকে যতটা সৌন্দর্যপিয়াসী ও রোমান্টিক অভিসারী করেছে তার চেয়ে বেশি করেছে দুটি বড় ক্ষেত্রে অঙ্গীকারবদ্ধ– দেশ ও মানুষ । এই ভালোবাসা ও অঙ্গীকার তাঁকে অল্পবয়সেই যুগপৎ রাজনীতি ও ইতিহাস-সচেতন করে তুলেছিল ।

১৯২৭ সালে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর জন্ম । গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে যখন তাঁর বিকাশের প্রথম পর্ব তখন বাংলা, উপমহাদেশ এবং বিশ্বের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে যে তোলপাড় চলছিল তার প্রভাব ও তাৎপর্য ছিল বৈপ্লবিক ও সুদূরপ্রসারী । বাংলায় তখন বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় একটি দুর্ভিক্ষ হয়েছে যাতে ৩৮ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি হলো যার ফলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও দাঙ্গা ছড়াল যাতে বহু লোক প্রাণ হারায়, দেশ ভাগ হয়ে আবারও বিশ্ব ইতিহাসের বড় একটি জন-স্থানচ্যুতি হলো যাতে বহু মানুষ দেশত্যাগী ও উদ্বাস্তু হলো, পূর্ব বাংলা ও পাঞ্জাবে শোষণ-নির্যাতনের সূত্রপাত হলো । অন্যদিকে ভারতবর্ষে তখন স্বাধীনতা আন্দোলন তুঙ্গে উঠলেও দেশভাগও অনিবার্য হয়ে উঠছিল যা রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা ও সংকীর্ণতা এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাও ছড়িয়েছিল । এদিকে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে যদিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধই মূল ঘটনা, কিন্তু তার পাশাপাশি ছড়িয়ে পড়ছিল সাম্যবাদের রাজনীতি । রুশ বিপ্লব ও কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রভাবক ভূমিকা বাড়ছিল অনুন্নত বিশ্বের বুদ্ধিজীবী ও সচেতন মানুষদের মধ্যে । যুদ্ধবিরোধী শান্তি আন্দোলনও তখন জোরদার হচ্ছিল । ভারতবর্ষের একেবারে দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের শহর চট্টগ্রামে বসে গ্রামের কিশোর মাহবুব উল আলম চৌধুরী ইতিহাসের এই পালাবদলের সাক্ষীই শুধু হলেন না, এ থেকে শিক্ষা নিলেন এবং পালাবদলের একজন কর্মী ও সংগঠক হিসেবে ইতিহাসের কাফেলায় যুক্ত হয়ে পড়লেন ।

তাঁর প্রেক্ষাপট তো মুসলিম সামন্ত অভিজাত পরিবার, যাদের সহজাত পক্ষপাত ছিল মুসলিম লীগের প্রতি এবং যাদের ব্যক্তিজীবন ধনার্জন ও সুখবিলাসে ব্যয়িত হওয়ার কথা ছিল । কিন্তু আমরা দেখি প্রায় কৈশোরেই তিনি সাংগঠনিক কাজে জড়িয়ে পড়ছেন, যে সংগঠনের কাজ ধনী ও শাসকের বিরুদ্ধে, সাধারণের পক্ষে । ঐতিহ্যগত আভিজাত্য ও মুসলিম পরিচয় তাঁর মধ্যে তেমন কোনো দোলাচল তৈরি করতে পারে নি । বরং বাইরের সংঘাতময় জগতের অভিজ্ঞতায় তিনি নিজের পরিবার ও শ্রেণি-পরিচয় ভুলে সাধারণের কাতারে নেমে আসছিলেন । প্রথম জীবন থেকেই তাঁর কবিসত্তাকে ছাপিয়ে যায় কর্মিসত্তা– এমন একজন কর্মী যিনি ত্যাগেও এগিয়ে, নেতৃত্ব গুণেও ।

কেবল যদি সার্থক যশস্বী লেখক হতে চাইতেন তাহলে হয়ত তিনি কলকাতায় আস্তানা গাড়তেন, মামার সুবাদে সে সুযোগ তাঁর জন্যে খোলা ছিল । কিন্তু আমরা দেখি তাঁর কর্মক্ষেত্র বরাবর চট্টগ্রাম । আর তিনি যুক্ত হয়ে পড়ছেন কম্যুনিস্ট আন্দোলনে, শান্তি সংগ্রামে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায়, মানবসেবায়, সাংস্কৃতিক কাজকর্মে ।

নানান কাজের সূত্রে তাঁর যোগাযোগ হয়ে যাচ্ছিল বাংলার প্রতিষ্ঠিত সব লেখক-

সাহিত্যিক-শিল্পিদের সঙ্গে, যা সেই বয়সে ঘোর লাগিয়ে দেওয়ার জন্যে ছিল যথেষ্ট। গোপাল হালদার, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে বুদ্ধদেব বসু, আবু যয়ীদ আইয়ুব, অন্নদা শঙ্কর রায়, কিংবা দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র থেকে উদয়শংকর, শম্ভু মিত্র, চিত্তপ্রসাদসহ সাহিত্য-শিল্পের নানা শাখার নানা মতের অগ্রসর ও প্রতিষ্ঠিত সব ব্যক্তিত্বের সাথে তাঁর যখন ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তখন তিনি কুড়ি পেরুনো সদ্য-যুবক মাত্র। এসব সংযোগ এবং এঁদের প্রেরণা আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে তাঁকে চালিত করলে অবাক হওয়ার কিছু থাকত না।

কিন্তু আমরা দেখি মাহবুব উল আলম চৌধুরী প্রেরণায় প্রদীপ্ত হয়ে সেইসব হিরন্ময় রসদ নিয়ে বারবার ফিরে এসেছেন চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামই ছিল তাঁর ঠিকানা, কর্মস্থল। এখানেও তিনি পেয়ে যাচ্ছিলেন পছন্দের মানুষ। একে অভিজাত পরিবারের সন্তান তায় আবার ছোট জায়গা, ফলে তিনি বস্তুত তাঁর পক্ষের এবং প্রতিপক্ষের নেতৃস্থানীয় সকলকেই জানতেন চিনতেন। এরকম বাস্তবতায় দোলাচল পরিহার করে একটি পক্ষে কেবল অবস্থান নেওয়া নয়, নেতৃত্বগ্রহণ ও অপর পক্ষের বিরুদ্ধতায় নামা বেশ কঠিন কাজ ছিল।

স্মৃতির সন্ধানেত তিনি লিখছেন : 'চট্টগ্রামে এসব জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিদের সঙ্গে মিশে আমি মানুষকে ভালোবাসতে শিখেছি। অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী হতে চেষ্টা করেছি। আমি সাহিত্যপ্রেমী হয়েছি। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মূলধারার সঙ্গে সংযুক্ত হতে পেরেছি। বহুভাবে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছি, জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেছি। বড় মাপের মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। তারা সবাই ছিলেন ত্যাগী, সাহসী, মনেপ্রাণে ইংরেজবিদ্বেষী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, পরোপকারী ও দেশপ্রেমিক। সবাই যে সমাজবাদী ছিলেন তা নয়, কিন্তু দেশ স্বাধীন করার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ (ছিলেন)। আমি এদের কাছে মানুষ হয়েও তাঁদের নীতি নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে যেতে পারি নি। মুসলমান জনগণের কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারিনি। তারই পরিণতিতে কমিউনিস্ট পার্টির নিকটবর্তী হয়েছিলাম।' (পৃঃ ১৩৯)

সেই চল্লিশের দশকের বাংলা-ভারত-বিশ্বজুড়ে যে পরিবর্তনের ডামাডোল চলছিল তার মধ্যে এক নবযুবকের সংবেদনশীল মনের সৃজনশীল প্রণোদনাকে গতিবেগে ও প্রভাবে ছাপিয়ে গেছে তারই আদর্শিক প্রেরণায় উদ্দীপ্ত কর্মীসত্তা– যা পুষ্ট ছিল দায়িত্বগ্রহণ ও পালনের অঙ্গীকারে। তাই মাহবুব উল আলমের জীবনেই যেন প্রতিধ্বনিত হয়, কবি-কিশোর সুকান্তের ক্ষুব্ধকণ্ঠ : 'কবিতা তোমায় দিলাম ছুটি।' একেবারে ছুটি দেন নি, দেওয়া যায় না। কিন্তু কবিতা হয়ে উঠল তাঁর রাজনৈতিক চেতনা, অঙ্গীকার ও অভিজ্ঞতা প্রকাশের বাহন। সুভাষ-সুকান্ত-রামবসু, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস হয়ে সে সময় বাম ধারার রাজনৈতিক কবিতা বেশ জোরদার হয়ে উঠেছিল। মাহবুব উল আলম চৌধুরীর সাহিত্যসাধনা সেই ধারাতেই এগিয়ে গেল বটে, তবে লেখার চেয়ে তাঁর ক্ষেত্র হয়ে উঠল সংগঠন। একে তো আদর্শ ও অঙ্গীকার, তার ওপর এখানে তিনি কেবল সংগঠক নন; নেতা, ত্যাগী নেতা, প্রায় ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকায়।

দক্ষ সংগঠকের এই পরিণতি আমরা পরবর্তীকালেও অনেক দেখেছি। পরিবর্তমান সমাজে যেমন নানামুখী তৎপরতা চলে তেমনি বিচিত্র গতিপ্রবাহে তা সবসময় অস্থির, আর সেটি সংগঠক ও কর্মীদের অনবরত বিচিত্র চ্যালেঞ্জ জানায়, তাদের

জন্যে চ্যালেঞ্জিং সব কর্মক্ষেত্র তৈরি করে তোলে, যাতে প্রকৃত সংগঠক-কর্মীদের ঝাঁপিয়ে না পড়ে উপায় থাকে না। এভাবে তাঁর ওপর কাজের বোঝা, সংগঠনের দায় চাপতে থাকে, আর তাতে শুকিয়ে আসে তাঁর সৃষ্টিশীলতার প্রবাহ, সে যেন ফল্গুধারা হয়ে নীরবে নেপথ্যে সরে যেতে থাকে।

তবে এ সময়ে সংগঠক মাহবুব উল আলম চৌধুরী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক কিছু কাজে নেতৃত্ব দিলেন।

কুড়ি বছর বয়সে তিনি প্রকাশ করলেন সাহিত্য পত্রিকা 'সীমান্ত'। "১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে বের করি *সীমান্ত*'– একটি প্রতিবাদী মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। তখন আমার বয়স মাত্র বিশ। (ঐ :পৃ : ৩২৯)

পাকিস্তান আন্দোলন ও দেশভাগের স্বাধীনতাকে তিনি তাঁর রাজনৈতিক চেতনা ও আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং সামগ্রিকভাবে পিছিয়ে পড়া বলে গণ্য করেছিলেন। ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সাম্প্রদায়িকতার বিনাশ এবং মানুষের রুটি-রুজি ও মান-বিক বিকাশের অধিকার রক্ষায় মুক্তির পথ সন্ধান করতেই *সীমান্তের* প্রকাশ। তাঁর ভাষাতেই শোনা যাক *সীমান্তের* মূল লক্ষ্য : "অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী সংস্কৃতির চর্চা, জাতীয় প্রগতি, বিশ্বশান্তি, শিল্পী-সাহিত্যিকের সৃষ্টিশীল ক্ষমতাকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করা, বাংলা সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে মূলধ-ারায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সব রকম বিকৃতি, কুসংস্কার, কূপম-ূকতা, জাতি-ধর্ম-বর্ণ এবং সম্প্রদায়গত বিভেদের বিরুদ্ধে 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই আদর্শকে উর্দ্ধে তুলে সৃষ্টিশীল সাহিত্য চর্চাকে উৎসাহিত করাই ছিল 'সীমান্তের' মূল উদ্দেশ্য।" (ঐ, ৩২৯) দাঙ্গা ও দেশভাগের পটভূমি আর ধর্মান্ধ মুসলিম জাতী-য়তার উম্মাদনার মধ্যে কুড়ি বছরের তরুণ দায়িত্ব নিয়েছে 'উভয় বাংলার নবীন-প্রবীণ লেখকদের' দুই মলাটের বন্ধনে জড়িয়ে রাখার। তাই *সীমান্তের* লেখক তালিকা ছিল সমৃদ্ধ, আজকের দিনের জন্য ঈর্ষণীয়। কিছু নাম উল্লেখ করা যাক– এদেশের প্রবীণ সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিলেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সুফিয়া কামাল, জসীম উদদীন, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, মাহবুবু-উল আলম, আবুল ফজল, শওকত ওসমান, আবু জাফর শামসুদ্দীন, মোতাহের হোসেন চৌধুরী। তখনকার নবীনদের মধ্যে ছিলেন মুনীর চৌধুরী, সানাউল হক, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, শামসুর রাহমান, আলাউদ্দিন আল-আজাদ, সুচরিত চৌধুরী, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, আবদুল্লাহ আল মুতী, মুর্তজা বশীর, বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, শহীদ সাবের প্রমুখ। পশ্চিমবঙ্গ থেকে লিখেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়, সত্যেন্দ্র মজুমদার, সুশোভন সরকার, গোপাল হালদার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, পূর্ণেন্দু পত্রীসহ আরও অনেকেই।

দুই বাংলার প্রতিষ্ঠিত ও উদীয়মান, বামধারা ও মানবতাবাদী লেখকদের সমাবেশ ঘটিয়ে তিনি কিন্তু সাহিত্য সাধনা বা সাহিত্য পত্রিকা সম্পানার আনন্দে বিভোর হন নি। কেন সাহিত্য, কেন পত্রিকা– একজন অঙ্গীকারবদ্ধ মানুষের দায়িত্ববোধ থেকে তাঁর মনে এসব প্রশ্ন নিশ্চিতই ঘুরপাক খেত। সেজন্য দেশ, জাতি ও ইতিহাসের দায় গ্রহণে তাঁর তৎপরতা থামে নি। বরং সেই দায় থেকে তিনি প্রকাশ করলেন ১৯৫০-এর দাঙ্গার পটভূমিতে *সীমান্তের* দাঙ্গাবিরোধী অসামান্য সংকলন। এ সংখ্যাতেও যুক্ত করেছিলেন দুই বাংলার সেরা লেখকদের। এই

সংখ্যা হাতে পেয়ে বর্ষীয়ান কম্যুনিস্ট সাহিত্যিক ও পরিচয় পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক গোপাল হালদার আত্মসমালোচনা করে লেখেন : 'পূর্ববাংলার সুদূর চট্টগ্রাম থেকে এমনি সময়ে হাতে এসে পৌছাল *সীমান্ত* নামে মাসিক পত্রের 'দাঙ্গাবিরোধী সংখ্যা'। পূর্ববাংলায় দাঙ্গাবিরোধী মানুষ আছেন এবং তাঁরা আপনাদের সেই মতামত ঘোষণা করতে ভীত নন।' তারপর প্রশ্ন ছুড়ে দেন নিজেদের দিকে–'পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতি সেবকদের পক্ষ থেকে সম্প্রতি এই ১৯৫০-এর দুর্দিনে এরূপ কোন প্রচেষ্টা হয়েছে কিনা।' (পৃ: ৩৩১) *সীমান্তের* এই সংখ্যার উন্নত সাহিত্যমূল্যের দিকটিও শ্রীগোপাল হালদার স্বীকার করেছেন। অনেককাল পর ১৯৯৭ সালে প্রবীণ সাহিত্যিক শওকত ওসমান মন্তব্য করেন– 'দাঙ্গাবিরোধী *সীমান্ত* অগ্রযাত্রার মাইলফলক। (*অভিনন্দন*, অনোমা শিল্পীগোষ্ঠী প্রকাশিত স্মরণিকা, পৃ: ১৯)।

রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নেও সীমান্তের ভূমিকা ছিল স্পষ্ট ও সঠিক। ১৯৪৭ সালেই প্রথম সংখ্যাতে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হবে তা নিয়ে কোনো দ্বিধা তাদের ছিল না। সম্পাদকীয়তে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে– 'রাষ্ট্র যদি জনসাধারণের হয়, তবে জনসাধারণের ভাষাই রাষ্ট্রে স্থান পাবে।... কারণ সে ভাষাতেই রাষ্ট্রের মঙ্গল নিহিত।'

সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছে নানাভাবে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় *প্রান্তিক নবনাট্য সংঘের* প্রতিষ্ঠা। এ সময়ে, পঞ্চাশের দাঙ্গার পটভূমিতে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে চট্টগ্রাম চলে আসেন রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী কলিম শরাফী। তিনি যুক্ত ছিলেন ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির প্রত্যক্ষ সহায়তায় গঠিত ইতিহাস বিখ্যাত আইপিটিএ (ইন্ডিয়ান পিপলস্ থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন) বা ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সাথে। সেই সুবাদে এই উদাত্ত কণ্ঠের শিল্পী পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ ছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, শম্ভু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র প্রমুখ দিকপাল সাংস্কৃতিক ব্যক্তিদের সাথে। তাঁর সাহচর্যে গণনাট্য সংঘের আদলেই মাহবুব উল আলম চৌধুরী গড়ে তুললেন প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ। কলিম শরাফী, কামেলা শরাফী ছাড়াও তাঁর সাথে যুক্ত ছিলেন গোপাল বিশ্বাস, সুচরিত চৌধুরী, মাহবুব হাসান, চিরঞ্জীব দাশশর্মা, দীননাথ সেন, সাদেক আলী, চৌধুরী হারুনর রশীদ, মলয় ঘোষ দস্তিদার, তেজেন সেনসহ আরও অনেকেই।

১৯৫১ সালের ১৬-১৯ মার্চ চট্টগ্রামে চার দিনব্যাপী যে সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তা ছিল পাকিস্তান পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গে এ ধরনের প্রথম আয়োজন। পাকিস্তানের সেই বৈরী পরিবেশে আয়োজিত এ সম্মেলনের তাৎপর্য ও ভূমিকার কথা এদেশের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক জাগরণের ইতিহাসে আজও স্মরণ করা হয়ে থাকে। দৈনিক আজাদ ও পাকিস্তানপন্থি লেখক-সাংবাদিকদের তীব্র বিরোধিতার মধ্যেও বেগম সুফিয়া কামাল, শিল্পী জয়নুল আবেদিন, আমিনুল ইসলাম, মুর্তজা বশীর, অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আর কলকাতা থেকে *সত্যযুগের* সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়, শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্র মিত্র, ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খান, নৃত্যশিল্পী বালাকৃষ্ণ মেনন প্রমুখের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণে সম্মেলন ছিল জমজমাট। সার্থক এই সম্মেলনের মূল সভাপতি অশীতিপর বৃদ্ধ গবেষক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ দিয়েছিলেন ঐতিহাসিক এক ভাষণ। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি এবং তাঁর

অত্যন্ত স্নেহ ভাজন লেখক আবুল ফজল এ ভাষণ রচনায় তাঁকে সহায়তা করেছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে ঐতিহ্যের ওপর গুরুত্ব দিয়ে যারা ঐতিহ্য অস্বীকার করতে চায় তাদের পরভোজী, পরজীবী আখ্যায়িত করে কঠোর সমালোচনা করেছেন। চট্টগ্রামের এই সফল সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রভাবে সারাদেশের তরুণ প্রগতিশীল লেখক শিল্পী সাহিত্যিকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। বলা যেতে পারে এরই পথ ধরে পরের বছর ১৯৫২ সালে কুমিল্লায় সংস্কৃতি সম্মেলন এবং ১৯৫৪ সালে ঢাকার কার্জন হলে অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন। ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানীর আহ্বানে যে বিখ্যাত কাগমারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তার পেছনেও আদর্শ ও প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে সেই ৫১-র চট্টগ্রাম সংস্কৃতি সম্মেলন। চট্টগ্রামের বাইরে প্রতিটি সম্মেলনে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর নেতৃত্বে চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক দলের অংশগ্রহণ ছিল বিপুল ও সফল।

তাঁর সাংগঠনিক সংযোগগুলোর দিকে তাকালেও বিস্মিত হতে হয় এর ব্যাপ্তি এবং গভীরতা দেখে।

১৯৪২ সালে মাত্র পনের বছর বয়সে তিনি ছাত্র কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৪৫ সালে যোগ দেন ছাত্র ফেডারেশনে। তখনই তাঁর যোগাযোগ হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, সুকান্ত ভট্টাচার্যের মতো বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ-ব্যক্তিত্বদের সাথে। ১৯৪৯ সালে বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগ দেন এবং ১৯৫০ সালে চট্টগ্রামে এ সংগঠন গড়ে এর সম্পাদক নির্বাচিত হন। একই বছর পাকিস্তানের মূলনীতি রিপোর্টে বিরোধী কমিটির যুগ্ম আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫১ সালে যুবলীগ গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন, একই বছর চট্টগ্রাম জেলা রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সালে যুক্ত হন গণতন্ত্রী পার্টি গঠনে এবং চট্টগ্রাম জেলা শাখার সম্পাদকের দায়িত্ব নেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টকে জয়যুক্ত করার জন্য গঠিত কর্মীশিবিরের আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন। '৫৬ সালে চট্টগ্রাম জেলা যুবলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। একই বছর কৃষ্টিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময়ে চট্টগ্রামে জনগণের কল্যাণে, জনগণের দাবি আদায়ে এবং রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিকাশে তিনি যেমন অসংখ্য আন্দোলনমুখী কাজের সূচনা করেছেন তেমনি এ লক্ষ্যে সূচিত যেকোনো কাজে তিনি জড়িত থেকেছেন।

ভাষা আন্দোলন, '৫৪-র ৯২ ক ধারা জারি, ১৯৫৮-র সামরিক আইন জারি, ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধের পটভূমিতে বারবার প্রগতিশীল লেখক-বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মীদের ওপর রাষ্ট্রীয় নির্যাতন নেমে আসে। সমাজের রক্ষণশীল অংশও এই নির্যাতনে প্রতিপক্ষ হিসেবে বারবার যুক্ত হয়েছে। এসব বাধাবিঘ্নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই মাহবুব উল আলম চৌধুরীর কর্মীসত্তার এবং সাংগঠনিক প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে। তবুও সম্ভবত ভেতরের নরম কবি-মানুষটির মধ্যে অতৃপ্তিও বাসা বাঁধছিল। দুটি আঘাত সম্ভবত বড় হয়ে বেজেছিল। একদিকে তাঁদের আন্তরিক প্রাণান্ত প্রয়াস সত্ত্বেও পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘু হিন্দুদের দেশত্যাগ ছিল অব্যাহত, যার পরিণতিতে তাঁর সাংস্কৃতিক সংগ্রামের অধিকাংশ সহকর্মীকে হারিয়ে দিনে দিনে তিনি নিঃসঙ্গ হয়েছেন। এ সময়ে লেখা তাঁর গান থেকে এই বেদনার আঁচ পাওয়া যাবে– 'ও ভাই দ্যাশ ছাইড়া যাইও না, এক ভাই যখন বাঁইচা আছি আর কোনো ভয় কইরো না।' দ্বিতীয় ঘটনাটি আরও পরের, ১৯৬৫-৬৬-র দিকে

আন্তর্জাতিকভাবে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের দ্বিধাবিভক্তি, যার প্রভাবে এদেশেও তাঁর অতি পরিচিত প্রিয়জনদের মধ্যে বিভাজন, বিভেদ এবং বিতর্ক ও বিচ্ছেদ ঘটে যায়। তাঁর কর্মময় জীবন লক্ষ করলে দেখব ১৯৫৮-র পর থেকে তাঁর রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কাজের উদ্যম ও কর্মচাঞ্চল্য যেমন কমে এসেছে তেমনি সাহিত্যকর্মেও ভাটা শুরু হয়েছে।

যে অসাম্প্রদায়িক উদার মানবিক বাংলার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন এবং যে মানব ও সমাজপ্রগতির রাজনীতিতে তিনি নিজেকে শামিল করেছিলেন সে দুই ক্ষেত্রেই তাঁর স্বপ্নভঙ্গের কারণ ঘটেছিল।

একটি পশ্চাৎপদ সমাজ থেকে মেধা ও শ্রমের জোরে এবং পারিপার্শ্বিক আনুকূল্যে বিচ্ছিন্ন কোনো প্রতিভার উন্মেষ হতে পারে কিন্তু যে মেধাবী প্রতিভা তাঁর শ্রম নিয়োজিত করেন সমাজ পরিবর্তনে ও মানবকল্যাণে তাঁর পক্ষে সব সময় সৃষ্টিশীল থাকা সম্ভব হয় না। মধ্য চল্লিশ থেকে মধ্য ষাট– যে দুই দশকজুড়ে মাহবুব উল আলম চৌধুরী সৃষ্টিতে ও সংগঠনে ব্যাপৃত ছিলেন তা ছিল নানা বিচিত্র ঘটনায় বন্ধুর, অস্থির, অনিশ্চিত। যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ, দেশত্যাগ, সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ও রাজনীতির পাশাপাশি প্রগতিশীল সাম্যবাদী রাজনীতির বিভাজন ও বিপর্যয় তাঁর স্বপ্ন ও উদ্যমকে তছনছ করে দেয়। তিনি রাজনীতি, কর্মজগৎ, এমনকি লেখার জগৎ থেকেও নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। এ তাঁর সন্ন্যাস নয়, অজ্ঞাতবাসও নয়, অভিমান ও ঔদাসীন্যের মিশ্রণ যেন। মাঝখানে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের অব্যবহিত পর কিছুকাল চট্টগ্রামে একটি সংবাদপত্রের সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক মন বসে নি, তাঁর ভেতরকার সৃষ্টিশীল ও কর্মজীবী সত্তাটি তেমনভাবে সাড়া দেয় নি। পঁচাত্তরের পর ঢাকায় গিয়েও তিনি নিশ্চুপ, নিষ্ক্রিয়। অনেক পরে নব্বইয়ের দশকে তিনি যখন আবার সক্রিয় হচ্ছেন ততদিনে চার দশকের বিরতি পড়ে গেছে। দ্রুতই তিনি আবার নিজেকে এদেশের প্রগতিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনে মানিয়ে নিলেন বটে, কিন্তু দীর্ঘ বিরতির ফলে দূরত্বও কি থেকে যায় নি? এবার তাঁর ভূমিকা অভিভাবকের, কালদর্শী অভিজ্ঞজনের। অবস্থান ও অঙ্গীকার ঠিক থাকল, পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে কোনো দোলাচল নেই; কিন্তু যৌবনের সেই তর্কপ্রিয় বিশ্লেষকের ক্ষিপ্রতা ও মনোযোগ কিছুটা হরণ করেছে কাল।

জীবনের দুই পর্বে তিনি ইতিহাসের পালাবদলের অভিযাত্রী হয়েছেন– একবার সংগঠক হিসেবে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, আরেকবার অভিভাবক হিসেবে নিয়েছেন পুরোধার ভূমিকা। কর্মই তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে, তবে কাজের সূত্রে যে লেখনী, তার মূল্যও ইতিহাস নিশ্চয় ভুলবে না।

শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

রশীদ হায়দার

আজ এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়, ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে দেশ ভাগের পর নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলনের প্রথম ভাষাসৈনিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ কিংবা ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে শহীদ হন নি; নিখোঁজ হয়েছেন ১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ। অসমর্থিত সূত্রে জানা যায় ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে শহীদ হন ১৪ এপ্রিল ১৯৭১। পাকিস্তান সৃষ্টির দিন ও মাসের হিসেবে ঠিক ছয় মাস দশদিন পর করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে পরিষদের ব্যবহার্য ভাষা কি হবে, সে-সম্পর্কে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়- ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। প্রাথমিক চিন্তা ছিল, গণপরিষদের ব্যবহার্য ভাষা হবে উর্দু ও ইংরেজি।

আলোচনা বা বিতর্কের একটা পর্যায়ে আমরা দেখব পরিষদ-নেতা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের এই প্রস্তাবটিকে নির্দোষ ভেবেছিলেন, কিন্তু শ্রী দত্তের সংশোধনী প্রস্তাবের পর তিনি এর মধ্যে এমন কিছু ষড়যন্ত্রের আভাস পেলেন

প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকেই পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত। অধিবেশনের শুরুতে আলোচনা সূত্রপাত করে পূর্ব বাংলার কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন : Mr President, Sir, I move : 'That in sub-rule (1) of rule 9, after the word English in line 2, The words 'or Bengalee' be inserted.

আলোচনা বা বিতর্কের একটা পর্যায়ে আমরা দেখব পরিষদ-নেতা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের এই প্রস্তাবটিকে নির্দোষ ভেবেছিলেন, কিন্তু শ্রী দত্তের সংশোধনী প্রস্তাবের পর তিনি এর মধ্যে এমন কিছু ষড়যন্ত্রের আভাস পেলেন, যা পরবর্তীকালে পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করবে, পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। পাকিস্তানের নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দৃঢ় আস্থার সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন– 'Pakistan has come to stay.' কিন্তু ২৪ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই ১৯৭১ সালে পূর্ব বাংলার বাঙালি প্রমাণ করে ছাড়লেন– 'Pakistan has come to diveded.' বলা বাহুল্য এই সিদ্ধান্তে আসার মূলে কার্যকর ছিল ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারির পূর্বোক্ত গণপরিষদের ব্যবহার্য ভাষা বিষয়ক আলোচনার সূচনা। বলা চলে শুভ সূচনা! যদিও আমরা দেখি ১৯৪৭-১৯৭১ সালের পাকিস্তানের ইতিহাসে কবি শামসুর রাহমানের ভাষায় আমাদের বারবার ভাসতে হয়েছে রক্তগঙ্গায়।

আর এই রক্তগঙ্গার অন্যতম শিকার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ৮৫ বছরের বৃদ্ধ কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে কী অমানবিক অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন, এক সাক্ষাৎকারে সেই বিবরণ দিয়েছেন কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের নাপিত রমণীমোহন শীল। রমণীমোহন শীল হিন্দু হলেও তাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল পাকিস্তানি মিলিটারিদের প্রয়োজনেই, কারণ তাদের মৃত্যু হলে পাকিস্তানি সৈন্যদের চুল-দাড়ি কাটার মতো কোনো লোক থাকবে না।

শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের ওপর যে অমানবিক নির্যাতন হয়েছে তা দেখে কোনো সুস্থ ও বিবেকবান মানুষের চোখের জল সংবরণ করা সম্ভব নয়। সাখাওয়াত আলী খান প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে জানা যায় : "ধীরেন বাবু সম্পর্কে বলতে গিয়ে রমণী শীলের চোখের জল বাধন মানে নি। মাফলারে চোখ মুছে তিনি বললেন, 'আমার সে পাপের ক্ষমা নেই। বাবু স্কুলঘরের বারান্দায় অতি কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোথায় প্রস্রাব করবেন। আমি আঙুল দিয়ে ইশারায় তাকে প্রস্রাবের জায়গা দেখিয়ে দিই।' তখন তিনি অতি কষ্টে আস্তে আস্তে হাতে একটি পা ধরে সিঁড়ি দিয়ে উঠানে নামেন। তখন ঐ বারান্দায় বসে আমি এক জল্লাদের দাড়ি কাটছিলাম। আমি বারবার বাবুর দিকে অসহায়ভাবে তাকাচ্ছিলাম বলে জল্লাদ উর্দুতে বলে, 'এটা একটা দেখার জিনিস নয়– নিজের কাজ কর।'

এরপর বাবুর দিকে আর তাকাবার সাহস পাই নি। মনে মনে শুধু ভেবেছি বাবু জনগণের নেতা ছিলেন, আর আজ তাঁর কপালে এই দুর্ভোগ। তাঁর ক্ষতবিক্ষত সমস্ত দেহে তুলা লাগান, মাথায় ব্যান্ডেজ, চোখ ও হাত বাঁধা অবস্থায় উপর্যুপরি কয়েকদিনই ব্রিগেড অফিসে আনতে নিতে দেখি।" (শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারকগ্রন্থ : পৃষ্ঠা ৩০২)
আজ আমরা নিঃসংশয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যে দুঃসাহসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন তা পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তথা সামরিক জান্তা ভোলে নি, ভুলতে পারে নি। তাঁর অকুতোভয় ভূমিকাই যে পাকিস্তানকে দ্বিখ-িত করার বীজ বপন করেছিল তা পরবর্তীকালে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে, প্রমাণিত হয়েছে।
মুহূর্তে সমগ্র পূর্ববাংলায় এই বেদনাদায়ক ঘটনার খবর রাষ্ট্র হয়ে যায়; যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্যে পূর্ববাংলাবাসীর অবদান ও সমর্থন সবচেয়ে বেশি, সেই পূর্ববাংলার ভাষাভাষীদের প্রধান অচ্ছেদ্য বন্ধন ভাষাকে মর্যাদাহীন করার চক্রান্ত পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী তথা সামরিক জান্তাদের কেউ মেনে নিতে পারে নি। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি', আমার পূর্বপুরুষ, আমি এবং উত্তর পুরুষ কেউই ভুলতে পারে না, এবং অনিবার্যভাবেই এক্ষেত্রে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম আসবে সবার আগে। এটা ইতিহাসের রায়।
১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত আর কী ভূমিকা পালন করেছিলেন? তিনি বলেছিলেন বাংলা একটি প্রাদেশিক ভাষা হলেও সমগ্র পাকিস্তানের মোট ৬ কোটি ৯০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে, অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী বাঙালি। অথচ ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকার যে ভূমিকা পালন করেছে তা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন– পোস্ট অফিসের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে গেলে যে ফর্ম পূরণ করতে হয় সেটি মুদ্রিত উর্দু ভাষায়; খাম- পোস্টকার্ডের ওপরে ছাপানো ভাষা উর্দু; জমি বেচাকেনার জন্যে ভেন্ডার-এর কাছ থেকে যে স্ট্যাম্প কিনতে হয়, সেটাও উর্দু ভাষায়। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের এই সমস্ত উদাহরণের মধ্য দিয়ে একটা মহৎ সত্য উচ্চারিত হয়; আর সেটি হচ্ছে বাংলা হতে পারে পাকিস্তানের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা, অর্থাৎ উভয় প্রদেশের মধ্যে ভাষার মাধ্যমে যোগাযোগের মাধ্যম। শহীদ দত্ত একথা জানাতে ভোলেন না যে আজ গণপরিষদে যে ভাষায় বিতর্ক চলছে তা সংখ্যাগরিষ্ঠ

“তিনি বলেছিলেন বাংলা একটি প্রাদেশিক ভাষা হলেও সমগ্র পাকিস্তানের মোট ৬ কোটি ৯০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে, অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী বাঙালি”

সদস্যদের বোধগম্য নয়।
আবেগতাড়িত কণ্ঠে শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত জনসংখ্যার অনুপাতে বাংলার সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করতে গিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করেন; যেটি পরবর্তীকালে সমগ্র বাংলা ভাষাভাষীর প্রাণের দাবিতে পরিণত হয়। যেহেতু পাকিস্তানের ৬ কোটি ৯০ লক্ষের মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লক্ষই বাঙালি, সেজন্য তাঁর সঙ্গত প্রশ্ন : Sir what should be the State Language of the State? The state Language of the State Should be the Language which is used by the majority of the people of the State.
ভাষা-সম্পর্কিত একটি নির্দোষ সংশোধন আলোচনা যে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষার দাবিতে পর্যবসিত হয়, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত-লিয়াকত আলী খানের তর্কযুদ্ধে। শহীদ দত্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানান, So, Sir, I Know I am voicing the sentiments of the vast millions of our State and therefore Bengalee should not be treated as a Provincial Language. It should be treated as the Language of the State. সময় এবং সঠিক সময়ই প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করে। শেষ বাক্য It should be treated as the language of the state-ই ঘোষণা দেয় রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। সেই দাবি তুঙ্গে ওঠে ঠিক চার বছর পর; ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সালে। ১৯৫৬ সালে তথাকথিত ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও কার্যক্ষেত্রে তা ছিল চরমভাবে অবহেলিত; দেখেছি আরবি হরফে বাংলা লেখা, রোমান হরফে বাংলা, সোজা বাংলার নামে সওজা বাংলা, বাংলা ভাষার মধ্যে দুর্বোধ্য আরবি-ফারসি-উর্দু ভাষার আমদানি ঘটানো হয়েছে অবাধে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নি।
এবারে আমরা লিয়াকত আলী খানের প্রতিক্রিয়ার দিকে মনোযোগী হতে পারি। লিয়াকত আলী খানের বক্তব্য ছিল সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ; তিনি বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন পাকিস্তান যেহেতু একটি মুসলিম রাষ্ট্র, সেজন্যে ভাষার ক্ষেত্রেও ধর্মীয় চারিত্র্য রক্ষা করার জন্যে উর্দুর প্রাধান্য থাকা প্রয়োজন। যেহেতু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দুই অংশেই মুসলমানদের সংখ্যা বেশি, সেজন্য রাষ্ট্রভাষার ক্ষেত্রে উর্দুর প্রাধান্য আবশ্যিক; যদিও তিনি প্রাদেশিক ভাষা হিসেবে প্রদেশের সব মানুষের কথ্য, লিখিত ও ব্যবহৃত ভাষা বাংলা ব্যবহার প্রসঙ্গে আপত্তি তোলেন নি; কিন্তু মূল আলোচনা অর্থাৎ বাংলার রাষ্ট্রীয় অধিকার শুধু অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবেই ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে ভারতীয় চর, কমিউনিস্ট, বিচ্ছিন্নতাবাদী ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছিলেন। দুর্ভাগ্যজনক সত্য হচ্ছে, কোনো বাঙালি মুসলিম লীগ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে সমর্থন জানান নি, বাংলার পক্ষে বক্তব্য রাখেন নি। এমনকি সংসদের স্পিকার বাঙালি তমিজউদ্দিন খানও শেষে রায় দিয়েছেন : 'Sir I cannot accept this amendment.'
১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে ভাষা-বিতর্কে শেষ বাক্যটি হচ্ছে 'The Motion was negative.'
কিন্তু সেই negative-ই কতখানি positive হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ আমরা পেলাম কয়েকদিন পরই। করাচিতে গণপরিষদের অধিবেশন শেষে পূর্ববাংলার সদস্যরা ঢাকা ফিরলেন। তেজগাঁও বিমানবন্দর। তেমন কোনো নিরাপত্তা বা প্রহরা নেই; পূর্ববঙ্গের সংসদ সদস্য বিমান থেকে নেমে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ধীরেন্দ্রনাথ লক্ষ করলেন মূল গেটের কাছে কিছু যুবক চাদর গায়ে দাঁড়িয়ে।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশটি এখানে উদ্ধৃত করা অপরিহার্য মনে করছি। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'স্মৃতি : ১৯৭১'-এর তৃতীয় খণ্ডের প্রথম রচনাটিই ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাতনি আরমা দত্তের। ধীরেন দত্তকে উদ্ধৃত করে লিখছেন আরমা : 'প্রথম গণ-পরিষদ অধিবেশন শেষে করাচি থেকে ফিরলাম। অনুন্নত তেজগাঁও বিমানবন্দরে সিকিউরিটি বলতে কিছুই নেই। প্লেন থেকে নেমে দেখলাম, প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশজন যুবক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। তাদের প্রত্যেকের গায়ে চাদর। আমরা ধারণা হলো, গণ-পরিষদে বাংলার সপক্ষে কথা বলার দরুণ এরা বিক্ষোভ জানাতে এসেছে, এদের চাদরের আড়ালে অস্ত্রও থাকতে পারে। সংশয় নিয়ে এগিয়ে গেলাম। যখন ওদের একেবারে নাগালের মধ্যে চলে গেছি তখন হঠাৎ প্রত্যেকে চাদরের তলা থেকে রাশি রাশি ফুল বের করে আমার ওপর বর্ষণ করতে লাগল। ওরা সবাই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।'
সেই সূচনা। এর পরই ১১ মার্চ ১৯৪৮, পূর্ববাংলায় 'ভাষা দিবস' পালিত হলো; এবং ওই মার্চেই ২১ তারিখে ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে, বর্তমানে যেটি সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সেখানে প্রথম ঘোষণা করলেন Urdu, and Urdu shall be the state language of Pakistan, ২৪ মার্চ তারিখে সেই একই ঘোষণা তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন কার্জন হল সমাবর্তন অনুষ্ঠানে; এবং ঐতিহাসিক ঘটনা হচ্ছে রেসকোর্স ময়দানে জিন্নাহর উক্তিতে ছাত্রদের যে 'নো' প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছিল, তা কার্জন হলে দ্বিগুণ ধ্বনিতে উচ্চারিত হলে থমকে গিয়েছিলেন জিন্নাহ, স্তম্ভিত হয়েছিলেন তিনি। বলা বাহুল্য ছাত্রদের এই সাহসের গোড়াপত্তনটি করেছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের রাজনৈতিক পরিচয়ের পাশাপাশি ব্যক্তি-পরিচয়ও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেগুলো নিঃসন্দেহে আদর্শ অনুপ্রেরণা, যুবসমাজের জন্য, রাজনীতিবিদদের জন্য, দেশবাসীর জন্য।
শহীদ দত্তের পূর্বপুরুষের ইতিহাস থেকে জানা যায় তাঁরা ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসী। তিনি কেন কুমিল্লা চলে এলেন তার বিবরণীতে অর্থনৈতিক ও সমাজতত্ত্বের যেমন একটি চমকপ্রদ ইতিহাস আছে, তেমনি আছে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা। মানুষের জন্য রাজনীতি করতে গেলে ওই দৃঢ়তার প্রয়োজন যে সর্বাগ্রে, সেই চরম সত্য আজ প্রায় নির্বাসিত। বলছেন শহীদ ধীরেন দত্ত : "ত্রিপুরা রাজ্য এক সময় জঙ্গল ছিল, চাষাবাদের উপযোগী ছিল না। এই এলাকায় কিছু কাঠুরিয়া কাঠ কেটে জীবন ধারণ করত। এইসব এলাকায় তখন হাতীও ছিল। তখনকার একটা নিয়ম ছিল যে, ত্রিপুরার রাজাকে যে যত হাতী ধরে দিতে পারবে- সে ত্রিপুরা স্টেট থেকে তত জমি পাবে এবং মন্ত্রিপরিষদে পদও পাবে। এতে জঙ্গল পরিষ্কার হতে থাকল, স্টেটের চাষোপযোগী জমিও বাড়তে থাকল। যার যত ভালো পদ রাজা তাকে তত বেশি জমির মালিকানা দিতে থাকল। পত্তনদার থেকে জমিদারি। দাদু এরপরে সামাজিক স্তর বিন্যাস, সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধনীতির ব্যাখ্যা তো দিলেনই তার সাথে এই এলাকার ভৌগোলিক ও তৎকালীন সমাজের নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও দিলেন। (যদিও আমার দাদু নৃতত্ত্ব বা সমাজতত্ত্ব কিছুই পড়েন নি) শেষে বললেন, 'আমি ধীরেন দত্ত-এই প্রথাকে ঘৃণা করি এবং এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে জমিদার প্রথা থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম ৮ সন্তান, ৩ বোন, বৃদ্ধ পিতা-মাতার হাত ধরে।' আমার দাদুদের পুর্বপুরুষ এমনিভাবেই জমিদার হয়েছিলেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রী হয়েছিলেন। দাদু সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। দাদু আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, জমিদার বংশের

কথা কাউকে বলবে না- খুব কলঙ্কময় ও লজ্জাকর অধ্যায়-আমাদের পূর্বপুরুষ কাঠুরিয়া-আমরা মানুষ, এই হলো আমাদের সবচেয়ে বড়ো পরিচয়-আমরা খেটে খাওয়া মানুষ-তুমি মানুষ হতে চেষ্টা কর এটাই হবে তোমার সবচেয়ে বড়ো পরিচয় ।''

'মানুষ' হওয়ার প্রধানতম শর্ত কি? আমরা ধীরেন দত্তের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, দেশপ্রেমের পরীক্ষায় তিনি শর্তহীনভাবে উজ্জ্বলতম সফলতা লাভ করেছেন, কারণ দেশভাগের পর তাঁরই অনেক আপনজন ভারতে চলে গেছেন, বন্ধুরা দেশত্যাগী হয়েছেন । কিন্তু তিনি যান নি, নিঃসন্দেহে একটা সম্মানজনক অবস্থান তিনি লাভ করতেন, বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতেন, আইনজীবী হিসেবে সুনাম অর্জন করতেন, মন্ত্রিতও লাভ করতেন । কিন্তু দেশের মাটির সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গের কাজ তিনি করেন নি । না করার ফলে তাঁকে প্রায়ই জেলে যেতে হয়েছে, রাজবন্দি হিসেবে থাকতে হয়েছে, গৃহবন্দিও থেকেছেন একাধিকবার । তবু তিনি দেশ ছাড়েন নি ।

কুমিল্লা থেকে ত্রিপুরা কতদূর? গোমতী নদী পার হয়ে কিছু দূর গেলেই ত্রিপুরা সীমান্ত, আর সেখানে পৌঁছলেই নিরাপদ । কিন্তু আমরা দত্তের লেখা থেকে জেনেছি, ধীরেন দত্ত মাতৃভূমি ছাড়েন নি, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, তাঁর রক্তের ওপর দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়বে, চেয়েছিলেন তিনি নিজ হাতে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করবেন । আশ্চর্য দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন শহীদ ধীরেন দত্ত । এ-দেশ যে তাঁরই জীবদ্দশায় স্বাধীন হবে, সে-ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন । এই বিশ্বাস পরবর্তীকালে অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায় ।

মানুষটিকে চিনবার জন্য আমাদের অনেক পথ, পথের বাঁক অতিক্রম করলে তবেই চেনা যাবে, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় তিনি কীভাবে দেশটা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন । তিনি বিশ্বাস করতেন ধর্ম নয়; ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে মানুষ-মানুষে ভালোবাসা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তিতে পরস্পরের মধ্যে বিবাহ হলে শান্তি বিরাজ করবে । নারী জাতিকে তিনি দিয়েছেন সর্বোচ্চ সম্মান, গৃহস্থালি কাজের মেয়েদের তিনি 'মা' ছাড়া সম্বোধন করতেন না । তিনি নির্দেশ দিয়েই বলতেন গরিবের সমস্যা ও দুঃখ বুঝতে চেষ্টা করবে, নইলে মানুষ হতে পারবে না । রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন মানুষকে অবিশ্বাস করা মহাপাপ । মানুষকে অবিশ্বাস করলে, বঞ্চিত করলে আমরা হয়ত মারা যাব না, কিন্তু ওরা মারা যাবে । বাড়িতে মেয়ে-বৌদের কুড়ি টাকার বেশি দামের শাড়ি পরা ছিল বারণ, সাধারণ মানুষের কাছে ওই মূল্যের শাড়িই মহামূল্যবান ।

শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সবচেয়ে বড়ো অপছন্দ ও ঘৃণার বিষয় ছিল– ধর্ম ব্যবসা । ধর্ম ব্যবসায়ীদের তিনি বাড়ির ত্রিসীমানায় ঢুকতে দিতেন না । ধর্ম ব্যবসা করে ধর্মকে সমুন্নত রাখা যায় এ-কথা তিনি বিশ্বাস করতেন না । পারিবারিক অবস্থানও মানুষকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবে, এই প্রথাও তাঁর কাছে ছিল ঘোর আপত্তিকর । একটি উদাহরণে তাঁর আপত্তির স্বরূপটি উপলব্ধি করা যাবে । বিষয়টি হচ্ছে : তাঁর নাতনি আরমা দত্ত শিশুকালে নূরজাহান নামে এক ধূনকরের মেয়ের সাথে খেলা করত । ওই পাড়ারই এক উকিল আরমাকে শাসন করে বলেছিলেন তুমি হচ্ছো জমিদার বংশের মেয়ে, তোমার ওই ধূনকরের মেয়ের সঙ্গে খেলা করা উচিত নয়, অশোভন । বংশ মর্যাদার কথাও বলেছিলেন সেই উকিল । আর তারই প্রতিক্রিয়ায় ধীরেন্দ্রনাথ সগর্বে নাতনি আরমা বলেছিলেন, তারা মূলত কাঠুরিয়া, জঙ্গল সাফ করতে এসেছেন । অর্থাৎ মানুষ এবং মানুষের মর্যাদাই প্রধান

ছিল বলে আরমা ও নূরজাহানে কোনো পার্থক্য তার নিকট ছিল না।

২

১৯৫৬ সালে ৮ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রে চৌধুরী মুহম্মদ আলী মন্ত্রিসভার পতন হলে ১২ সেপ্টেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিম-লি গঠন করেন। অপরদিকে প্রদেশে আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভার পতন হলে 'আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল না থাকার দরুন কোয়ালিশন মন্ত্রিম-লি গঠনে বাধ্য হয়। এই মন্ত্রিম-লিকে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস, স্বতন্ত্র, তফসিল হিন্দু আর আমাদের দল গণসমিতির ৬ জন সদস্য সমর্থন করেন। তাঁহাদের সমর্থনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।' (শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের আত্মকথা।)
আওয়ামী লীগের আইনসভার নেতা আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, সেখানে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তও অন্তর্ভুক্ত হন। শ্রী দত্ত পেয়েছিলেন মেডিক্যাল পাবলিক হেলথ ও সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের দায়িত্ব। মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করার আগে গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটি তাঁর মনে আসে। মনে মনে তিনবার তিনি শ্লোকটি উচ্চারণ করে শপথ বাক্য পাঠ করেন। তিনি সংকল্প করেছিলেন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে কর্তব্য করে যেতে হবে। তাঁর সংকল্পে নিঃশব্দ উচ্চারণ ছিল : 'আমি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিলাম। বস্তুত যে কোনো দেশের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা, বিশেষ করিয়া অনুন্নত দেশের, সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করা ছাড়া আর কিছুই নহে।' (শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের আত্মকথা।)
দুর্ভাগ্য হচ্ছে, আমরা এই চরম আত্মত্যাগী সংগ্রামীকে যথাযোগ্য সম্মান দিই নি, তাঁকে মর্যাদা দিই নি, ইতিহাসে যথোপযুক্ত স্থান দিই নি; পক্ষান্তরে, যে মানুষটির দুঃসাহসিক ভূমিকার জন্য আজ আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলছি, সরকারি কাজে বাংলা ব্যবহার করছি, তাঁর নামটি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের কোথাও, কোনো জায়গায় খুঁজে পাওয়া যাবে না।
তবে ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে আমরা আশাবাদী থেকে শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের আত্মকথার 'সম্পাদকের নিবেদন' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েই লেখাটি শেষ করব। ওই 'আত্মকথা'র সম্পাদক অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের কথায় :
'স্রোতকে যেমন আলাদা করা যায় না নদীর থেকে, তেমনি শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮৬-১৯৭১) নাম পৃথক করা যায় না বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে। সে-ইতিহাসের আগের যে-ইতিহাস, সেই পর্বেরও এক শক্তিমান চরিত্র তিনি। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভারতে ব্রিটিশশাসন-বিরোধী সংগ্রামের সৈনিক, পাকিস্তান-রাষ্ট্রে বাংলাভাষার মর্যাদা-প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রবর্তক, বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বাপ্নিক। এর প্রতিটি পর্যায়ে নিজের বিশ্বাস ও কর্মের জন্যে মূল্য দিয়েছেন তিনি– সর্বাধিক মূল্য দিয়েছেন ১৯৭১ এর মার্চে। তখন তিনি নিজের হাতে কুমিল্লার বাড়িতে তুলেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। তার কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর রক্তে সিঞ্চিত হয়েছিল বাংলাদেশের মাটি। তাঁর আর সকল কাজের মতো সে আত্মদানও বৃথা হয় নি। যে-মাটিতে বোনা হয়েছিল স্বাধীনতার বীজ, সে-মাটি উর্বর হয়েছিল তাঁর রক্তে,– ফসল ফলতে দেরি হয় নি।'
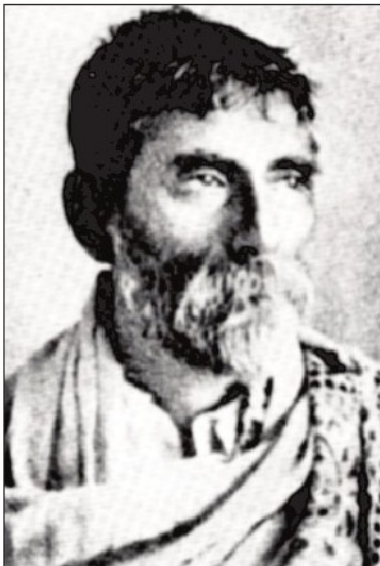
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

তপন চক্রবর্তী

ক্রান্তদর্শী মনীষী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সার্ধশত জন্মবর্ষে আমরা তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবন, কর্ম ও আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা তাঁর জন্মের দেড়শত বছর পরেও প্রাসঙ্গিক। আমাদের সমাজে তাঁর মতো একজন সাধাসিদে জীবন-যাপনকারী জ্ঞানপিপাসু, সুপ-িত ও বিদ্যোৎসাহী, তাঁর মতো নিঃস্বার্থ ছাত্রদরদী ও ছাত্র-বৎসল শিক্ষক ও নিষ্ঠাবান গবেষক-বিজ্ঞানী এবং সর্বোপরি তাঁর মতো মাতৃভাষা-প্রেমী, দেশসেবক ও বাঙালির হিতাকাঙ্ক্ষী মানুষের সংখ্যা খুব কম। নূতন প্রজন্মের কাছে তাঁর জীবন ও কর্মের বিবরণ পরিবেশন আমাদের কর্তব্য। অনেকে শুধু জানেন, প্রফুল্লচন্দ্র ভারতের প্রথম সফল রসায়ন বিজ্ঞানী ও সার্থক শিল্পোদ্যমী। এর বাইরেও মানুষটির কর্মসংস্কৃতির যে বিশাল পরিধি

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবীত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে অকৃপণভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখনো সম্ভব হতো না। এই যে আত্মদানমূলক সৃষ্টিশক্তি এ দৈবীশক্তি। আচার্যের এই শক্তির মহিমা জরাগ্রস্ত হবে না

তার পরিচয় তুলে ধরা আবশ্যক।
মার্কিউরিয়াস নাইট্রাইট $\{Hg_2(NO_2)_2\}$ যৌগের আবিষ্কারক, ভারতবর্ষে স্কুল অব কেমেস্ট্রির অনন্য সংঘটক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিজ্ঞানে পাঠদান, বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার মধ্যে কেবল নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি। তিনি শিক্ষা, বাণিজ্য, অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি নিয়েও ভেবেছেন। বিশেষ করে তিনি বাঙালির আর্থিক দুর্দশা, বাঙালির দীনতা, বাঙালি চরিত্রের দুর্বলতা নিয়েই ভাবতেন বেশি। তিনিই একমাত্র বিজ্ঞানী যিনি শিক্ষাদান ও গবেষণার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে নানান সামাজিক কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেন। শীর্ণ দেহের মানুষটির মধ্যে ছিল অফুরাণ প্রাণশক্তি এবং ছিল মানুষকে আকর্ষণের অসাধারণ ক্ষমতা। যার দরুন তিনি অনায়াসে অনেক বড়ো বড়ো কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। অকৃতদার প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনযাপন, ধ্যান-ধারণা প্রাচীন ভারতের ঋষিদের মতো। দেশবাসী তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তাঁকে আচার্য উপাধিতে ভূষিত করেছেন। প্রকৃত অর্থেই তিনি আচার্য।
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই কৃতি পুরুষ সম্বন্ধে লেখেন, "সংসারে জ্ঞান তপস্বী দুর্লভ নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়া প্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান করতে পারেন এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়।
উপনিষদে কথিত আছে, যিনি এক তিনি বললেন, আমি বহু হব। সৃষ্টির মূলে এই আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টিও সেই ইচ্ছার নিয়মে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবীত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে অকৃপণভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখনো সম্ভব হতো না। এই যে আত্মদানমূলক সৃষ্টিশক্তি এ দৈবীশক্তি। আচার্যের এই শক্তির মহিমা জরাগ্রস্ত হবে না। তরুণের হৃদয়ে হৃদয়ে নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির মধ্যে দিয়ে তা দূরকালে প্রসারিত হবে। দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে জয় করবে নব নব জ্ঞানের সম্পদ। আচার্য নিজের জয়কীর্ত্তি নিজে স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে। আমরাও তাঁর জয়ধ্বনি করি।"
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বাংলাদেশের খুলনা জেলার (প্রাক্তন যশোহর জেলা) কপোতাক্ষ নদের তীরে রাড়ুলি-কাঠিপাড়া গ্রামে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ২ আগস্ট (১২৬৮ সন, ১৮ শ্রাবণ) সম্ভ্রান্ত রায় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা হরিশ্চন্দ্র রায় ও মাতা ভুবনমোহিনী দেবী। রায় পরিবার বিত্ত, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ ছিল। হরিশ্চন্দ্র সুপ-িত, বহুভাষাবিদ, বিদ্যোৎসাহী ও জনদরদী ছিলেন।
ভুবনমোহিনী স্বাধীনচেতা, নারী শিক্ষায় উৎসাহী, সংস্কারমুক্ত, উদারমনা ও

সেবাপরায়ণা ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁদের সুযোগ্য পুত্র প্রফুল্লচন্দ্র তাঁদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পা-িত্য অর্জনে, জনসেবায় ও পরার্থে
জীবনযাপনে ব্রতী হয়েছিলেন।
গ্রামে প-িত মশাইয়ের পাঠশালায় চার বছরের 'ফুনু'র (প্রফুল্লচন্দ্রের ডাকনাম) হাতেখড়ি হয়। পরে তাকে পিতার প্রতিষ্ঠিত মধ্য ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করানো হয়। হরিশ্চন্দ্র পুত্র-কন্যাকে (জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র, নলিনীকান্ত, প্রফুল্লচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, গোপালচন্দ্র ও ইন্দুমতী) আরো উন্নত শিক্ষাদানের লক্ষ্যে, দেশের জমিজমা ও ব্যবসার ক্ষতির বিষয় না ভেবে কলকাতায় বাসা ভাড়া করে সস্ত্রীক চলে আসেন। প্রফুল্লচন্দ্রকে কলকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি করেন।
প্রফুল্লচন্দ্র মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাঁর অদম্য জ্ঞান-পিপাসা ছিল। আত্মচরিতে তিনি লেখেন, "আমার বই পড়ার দিকে খুব ঝোঁক ছিল এবং যখন আমার বয়স বার সেই সময় আমি শেষরাত্রে ৩টা, ৪টার সময় উঠিয়া কোন প্রিয় গ্রন্থকারের বই নির্জনে বসিয়া পড়িতাম।" হেয়ার স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ার সময় তিনি গুরুতর আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। ফলে, ১৮৭৪–৭৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর স্কুল যাওয়া বন্ধ থাকে। প্রফুল্লচন্দ্র এই দুঃসময়ে শেকসপিয়র, কার্লাইল, এমার্সন, ডিকেন্স প্রমুখের রচনা ও বাংলা সাহিত্য গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে পড়েন। সাহিত্যে তীব্র অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন বিজ্ঞানকে জীবিকা রূপে বরণ করলেন সেই প্রসঙ্গে তিনি আত্মচরিতে লেখেন, "... আমাকে সাহিত্য ও বিজ্ঞান এই দুটির মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে হইল। আমি সাহিত্যের মায়া ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানেরই আনুগত্য স্বীকার করিলাম এবং বিজ্ঞান নিঃসংশয় একনিষ্ঠ সেবককেই চাহিল।"
বছরের মাঝখানে হেয়ার স্কুলে ভর্তি হওয়া যায় না। তাই তাঁকে এলবার্ট স্কুলে ভর্তি করানো হয়। প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হলে তাঁকে মেট্রোপলিটান স্কুলে এফ.এ ক্লাসে ভর্তি করানো হয়। এখানে এই ক্লাসে রসায়ন পড়ানো হতো না। তিনি রসায়ন পড়ার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে বহিরাগত ছাত্র হিসেবে ভর্তি হন। এখানে অধ্যাপক-গবেষক পেডলার সাহেবের বক্তৃতা তাঁকে মুগ্ধ করে এবং অধ্যাপক পেডলারই তাঁর মধ্যে রসায়নে উচ্চশিক্ষা লাভের প্রেরণা সঞ্চার করেন। এফ.এ পাস করার পর তিনি এই কলেজেই বি-কোর্সে ভর্তি হন। বি-কোর্সে বিজ্ঞান পড়ানো হতো। এই সময়ে তিনি গোপনে লন্ডন থেকে পরিচালিত সেখানকার প্রবেশিকা মানের গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নেন। এই

"প্রফুল্লচন্দ্র মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাঁর অদম্য জ্ঞান-পিপাসা ছিল। আত্মচরিতে তিনি লেখেন, "আমার বই পড়ার দিকে খুব ঝোঁক ছিল এবং যখন আমার বয়স বার সেই সময় আমি শেষরাত্রে ৩টা, ৪টার সময় উঠিয়া কোন প্রিয় গ্রন্থকারের বই নির্জনে বসিয়া পড়িতাম"

পরীক্ষায় অংশ নিতে হলে ন্যূনতম চারটি ভাষা জানা থাকা চাই। সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে দুই জন এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইংল্যান্ডে লেখাপড়ার জন্য বৃত্তি লাভ করেন।

প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৮২ সালে ইংল্যান্ডের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এসসি ক্লাসে ভর্তি হন। ১৮৮৫ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শিক্ষার্থীদেরকে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেন। প্রবন্ধের বিষয় 'সিপাহী বিদ্রোহের আগে ও পরে ভারতের অবস্থা'। প্রফুল্লচন্দ্র সেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁর বৃত্তি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা মাথায় রেখেও তিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কটু মন্তব্য করেন। প্রবন্ধটি খুবই প্রশংসিত হয়। পরে এটি এডিনবরায় পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। পুস্তিকার ভূমিকায় প্রফুল্লচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতার সপক্ষে আবেগময় আবেদন রাখেন।

প্রফুল্লচন্দ্র কৃতিত্বের সঙ্গে বি.এসসি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ডি.এসসি উপাধি অর্জনের লক্ষ্যে গবেষণা শুরু করেন। ২৭ বছর বয়সে তিনি উচ্চমানের প্রশংসনীয় গবেষণাকর্মের জন্য ডি.এসসি উপাধি ও 'হোপ প্রাইজে' ভূষিত হন। রসায়নে ডি.এসসি লাভে তিনিই দ্বিতীয় বাঙালি। তাঁর গবেষণাকর্মে সন্তুষ্ট হয়ে 'গিলক্রাইস্ট বৃত্তি' পরিচালনা পর্ষদ তাঁর জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করেন। তাঁর অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ছিল On the Conjugated Sulphates of Copper Magnesium Group। অভিসন্দর্ভের অংশবিশেষ প্রথম গবেষণাপত্র হিসেবে ১৮৮৮ সালে Proceedings of Royal Society-তে প্রকাশিত হয়। এই বছরই তিনি ভারতে ফিরে আসেন।

অনেক তদবিরের পর ১৮৮৯ সালে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বেকারত্বের অবসান ঘটে। ব্রিটিশ শিক্ষা প্রশাসন তাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজে সহকারি অধ্যাপকের পদে নিয়োগ দেন। এই কলেজে তিনি অধ্যাপনার সাথে গবেষণার কাজ চালাতে থাকেন। গবেষণাগারটি ছিল আটপৌরে। এই গবেষণাগারেই প্রফুল্লচন্দ্র গবেষণা করে বিশ্ব শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন।

স্বদেশভাবনা যে এই মনীষীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিক তা তাঁর গবেষণা কর্মের সূচনাতেই স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি প্রথমে যে গবেষণা কাজ হাতে নেন তা হলো ঘি ও সর্ষের তেলে ভেজাল পরীক্ষা। সেসঙ্গে বিভিন্ন প্রসাধনী ও ওষুধ এবং এসবের কাঁচামাল তৈরির অনুসন্ধানমূলক কাজ। শেষোক্ত সম্বন্ধে তিনি আত্মচরিত লেখেন, "... আমি যখন প্রাথমিক প্রয়াস গ্রহণ করি, এই বিষয়ে পথ প্রদর্শক কোনো নির্দেশক অথবা অনুসরণ করার মতো কোনো গবেষণাকর্মের ঐতিহ্য আমার সম্মুখে ছিলো না এবং আমার পূর্ব অভিজ্ঞতাও ছিলো না– আমার তরী পার করে বন্দরে নোঙর করার জন্য সমুদ্র অভিযাত্রীর কোনো কম্পাস বা দিগদর্শকও আমার কাছে ছিলো না।" প্রসাধনী ও ওষুধের কাঁচামাল তৈরির কাজ শুরু হয় ১৯০১ সালে বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠার পর। ঘি ও সর্ষের তেলের ওপর সম্পাদিত গবেষণাকর্মের শিরোনাম On the Chemical Examination of certain Indian food stuff. part-1, Fat and Oils। এটি ১৮৯৪ সালে Journal of Asiatic Society of Bengal-এ প্রকাশিত হয়।

প্রফুল্লচন্দ্র পানিতে দ্রবণীয় মার্কিউরাস নাইট্রেট তৈরির প্রয়াস পান। কারণ, মার্কিউরাস নাইট্রেট থেকে সহজে মার্কিউরাস ক্লোরাইড তৈরি করা যায়। মার্কিউরাস নাইট্রেট তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার বিষয়ে তিনি আত্মচরিত লেখেন,

"সম্প্রতি পারদের উপর অ্যাসিডের ক্রিয়া দ্বারা মার্কিউরাস নাইট্রেট প্রস্তুত করতে গিয়ে আমি এক প্রকার দানা পড়িতে দেখিয়ে কিয়ৎ পরিমাণে বিস্মিত হইলাম। প্রথম দৃষ্টিতে ইহা কোনো বেসিক সল্ট বলিয়া মনে হইল। কিন্তু এরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা ঐ শ্রেণীর সল্টের উৎপত্তি সাধারণ অভিজ্ঞতার বিপরীত। যাহা হউক, প্রাথমিক পরীক্ষা দ্বারা ইহা মার্কিউরাস সল্ট এবং নাইট্রাইট উভয়ই প্রমাণিত হইল।" ১৮৯৫ সালের ডিসেম্বরে তিনি এই বিষয়ক গবেষণাপত্র On Mercurous Nitrite এশিয়াটিক সোসাইটিক সোসাইটির জার্নালে উপস্থাপন করেন। সোসাইটি এটি ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত করে। প্রফুল্লচন্দ্র এই আবিষ্কার জার্মানির Zeiffschriff for Anorganische Chemic-যে প্রকাশিত হতেই তিনি বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন। গবেষক-বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সর্বমোট দেড়শত গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। এসবের মধ্যে ৬০টি ছিল নাইট্রাইট বিষয়ে। নাইট্রাইটের উপর ব্যাপক গবেষণার জন্য বিশ্বের শীর্ষ বিজ্ঞানীরা তাঁকে Master of Nitrites উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৯৭ সালে লন্ডনের Proceedings of the Chemical Society-তে প্রকাশিত Conjugated Sulpualis and Isomporphus mixture of the Copper-Molybdinum বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে।
অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায় অধ্যাপনার অবসরে গবেষণায় মগ্ন থাকেন। সেই সঙ্গে ছাত্রদের গবেষণায় উৎসাহিত করায় এবং কৃতি গবেষক তৈরি করার কাজে ব্যাপৃত থাকেন। ছাত্রদের ও ছাত্র-শিক্ষকের গবেষণাপত্র রসায়নবিজ্ঞানে পৃথিবীর প্রতিনিধিত্বকারী জার্নালসমূহে প্রকাশের ব্যবস্থা করতেন। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল বন্ধু ও পিতার। তাঁর বেতনের বেশির ভাগই তিনি দরিদ্র ছাত্রদের জন্য ব্যয় করতেন। তিনি অনেক ছাত্রকে নিজের বাসস্থানে মাথা ঠাঁই করে দিতেন এবং তাদের আহারের ব্যবস্থা করতেন।
প্রফুল্লচন্দ্রের সরল জীবনযাপন ও দানশীলতা সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী লেখেন, "... আটপৌরে ভারতীয় পোশাক পরা অনাড়ম্বর সহজ মনের মানুষটি বিজ্ঞানী ও অধ্যাপকের চেয়ে মাপের ছিলেন। তাঁর বেতনের মাত্র সামান্য কয়টা টাকা নিজের জন্য রেখে বাদবাকী টাকা জনগণের বিশেষ করে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যয় করার কথা শুনে আমি বিস্মিত হলাম।"
তাঁর ছাত্রদের নিয়েই তিনি দেশের আনাচে-কানাচে বন্যা, ঝড় ও মড়কে বিধ্বস্ত, বিপন্ন মানুষের কাছে ছুটে যেতেন। তিনি বলতেন, "আমার ছাত্ররা সর্বদাই আমার প্রিয় বন্ধু ও সঙ্গী। আমি তাদের সুখ ও দুঃখের ভার নিই এবং তাদেরই একজন মনে করি। তারাও আজকের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবনা প্রসঙ্গে আমার মতামতের অংশীদার হয়।" ছাত্রদের স্মরণ করিয়ে দিতেন, "দেশের গরীব মানুষের পয়সায় লেখাপড়া শিখছিস। এদের কৃতজ্ঞতার ঋণের বোঝা কিন্তু একদিন ফিরিয়ে দিতে হবে।"
প্রেসিডেন্সি কলেজের ভিতরের ও বাইরের প্রতিবন্ধকতাও প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও ধৈর্য্যের সঙ্গে মোকাবেলা করতে হয়েছে। বিজ্ঞান গবেষণার অপ্রতুল যন্ত্রপাতি, অর্থাভাব ও বিজ্ঞানের অনুকূল পরিবেশের ঘাটতি তো ছিলই। তবু এগিয়ে যাওয়া ও এগিয়ে নেওয়ার দুর্মর সাধনার আচার্য সফল হয়েছিলেন কেবল তাঁর মানসিক দৃঢ়তার জোরে। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র লেখেন, "...গণনাহীন যে সব অসুবিধা ও বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে, আজকের দিনে তা অন্য কারও পক্ষে অনুধাবন করা অসম্ভব, কিন্তু এই সব বিঘ্ন তাঁর নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার পথে কোনওদিন কোন অবরোধ সৃষ্টি করতে পারেনি বরং তাঁর

সুপ্ত শক্তি সম্যক কারণে প্রেরণা-জুগিয়েছে।"
তাঁর গুণী ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, ডাক্তার নীলরতন ধরসহ আরো অনেক গবেষক-বিজ্ঞানী এঁরা বিজ্ঞান জগতে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের দীপ্তি ছড়িয়েছিলেন এবং ভারতবর্ষকে পৃথিবীর বিজ্ঞান আসরে গৌরবের আসনে বসিয়েছিলেন। ভারতবর্ষেও বিজ্ঞান গবেষণা ও বিজ্ঞানচর্চার আন্দোলনে এঁরা যথেষ্ট অবদান রাখেন।
অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর নিয়ে ১৯১৬ সালে ২রা নভেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে পালিত অধ্যাপকের পদে যোগদান করেন। তিনি ১৯৩৬ সালে সক্রিয় কর্মজীবন শেষ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে প্রফেসর ইমেরিটাস পদে নিযুক্তি দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন। তিনি তাঁর ৬০ বছর বয়সে ১৯২১ সাল থেকে তাঁর চাকুরির বেতন বাবদে প্রাপ্য সব টাকা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন গবেষণাগারের উন্নয়ন কল্পে দান করেন। তিনি রসায়নে সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষণাকর্মের জন্য ১৯২২ সালে নাগার্জুন পুরস্কার এবং ১৯৩৭ সালে প্রাণিবিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ গবেষণার জন্য আশুতোষ মুখার্জী পুরস্কার প্রবর্তন করেন।
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯০৮ সালে পি.এইচডি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৬ সালে ডি.এসসি এবং ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১২ সালে প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে ডি.এসসি উপাধিতে ভূষিত করেন। ব্রিটিশ সরকার অধ্যাপক রায়কে ১৯১১ সালে 'কম্প্যানিয়ন অব দ্য অর্ডার অব দ্য ইন্ডিয়ান এমপ্যায়ার' (সিআই. ই) ও ১৯১৯ সালে নাইট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। জার্মানির মিউনিকের কেমিক্যাল সোসাইটি ও Deutche Akademie আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে Honarary Fellow নির্বাচিত করেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৯২০ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন।
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় নিজে বিশাল শিল্প প্রতিষ্ঠান 'বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিকলস' গড়ে তোলেন এবং অন্যদের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ায় পরামর্শ দেন, সাহায্য করেন। তিনি একজন মহান দেশপ্রেমিক। তিনি ও তাঁর স্ত্রী গ্রামাঞ্চলে প্রথম মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ছেলেদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন মধ্য-ইংরেজি স্কুল। তিনি তাঁর গ্রামের দরিদ্র জনগণকে মহাজনী চক্রবৃদ্ধি সুদ ও দাদন প্রদানকারীদের ফাঁদ থেকে উদ্ধারকল্পে কো-অপারেটিভ ব্যাংক স্থাপন করেন। ভারতের বিজ্ঞান ঐতিহ্য অন্বেষণে বহু সময় ও শ্রম ব্যয় করে দেশ-বিদেশে নন্দিত রসায়নের ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থ দুই খ- প্রণয়ন করেন। তিনি বাংলা ও ইংরেজিতে আরো অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এ ছাড়া তিনি শিক্ষা, অর্থনীতি, সমাজ সংস্কার, মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা, জাতিকে বিজ্ঞানমনস্ক করার জন্য বিজ্ঞান পড়ার অপরিহার্যতা ইত্যাদি বিষয়ে সারা ভারত ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়েছেন এবং অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

প্রফুল্লচন্দ্র ১৯১২ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে 'বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানচর্চা' শীর্ষক বক্তৃতায় বলেন, "বিজ্ঞানের শিক্ষা স্বয়ং প্রকৃতির নিকট হইতেই শিক্ষালাভ। উহা মাতৃভাষাতেই হওয়া উচিত। একটি বিদেশী ভাষার কবলে ইহাকে আবদ্ধ রাখা উচিত নহে।... তোমরা ইংরাজীতে বিজ্ঞানালোচনা করিবে; প্রথমে ভাব দেখি, তোমার দেশবাসীর মধ্যে কয়জন ইংরাজী বুঝিবে। অথচ সামান্য বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি না জানা থাকায় রোগে কত কষ্ট ভোগ করিতেছে।

ম্যালেরিয়া ও মশকে কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, পতঙ্গ কি প্রকারে শস্য ধ্বংস করে, রেশম কীটের কোন্ কোন্ ব্যাধি হয় এবং কিরূপে তাহা নিবারণ করা যায়, সারের প্রকারভেদের সহিত চাষের কি সম্বন্ধ এবং সামাজিক রীতিনীতির উপর সামাজিক উন্নতি কতখানি নির্ভর করে এই সকল অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের বৈজ্ঞানিক আলোচনা যদি দেশের লোকের নিকট সুপ্রাপ্য হয় তাহা হইলে অনেক উপকার হয় ।... যদি ঘাটে পাটে বাটে মাঠে এই সকল বিষয়ের আলোচনা দেখিতে চাও, তাহা হইলে মাতৃভাষার শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই ।"

রাজশাহীতে দ্বিতীয় সাহিত্য সম্মেলনে তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান' শীর্ষক বক্তৃতায় বাংলা বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের উন্নতিবিধান কল্পে তিনি বলেন, "আমরা যতদিন স্বাধীনভাবে নূতন নূতন গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া মাতৃভাষায় সেই সকল তত্ত্ব প্রচার করিতে সক্ষম না হইব, ততদিন আমাদের ভাষার এই দারিদ্র ঘুচিবে না ।... ।"

'বৈজ্ঞানিক জগতে ভারতবাসীর স্থান নির্ণয়' প্রবন্ধে তিনি বলেন, "আমাদের এই দরিদ্র দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইলে, জাতীয় শক্তি ও স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইলে পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে বিজ্ঞান শিক্ষা, বিজ্ঞানের সাধনা ও বিজ্ঞান অনুশীলনের একান্ত প্রয়োজন ।"

প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়নে পরিভাষা সৃষ্টির আবশ্যকতা উপলব্ধি করেছেন এবং পরিভাষা প্রণয়নের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত বিতর্ক নিরসনে একটি সুস্পষ্ট নীতি অবলম্বন প্রসঙ্গে লেখেন, "জাপানীরা জার্ম্মানীর ও রুষিয়ার ন্যায় যাবতীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মাতৃভাষায় প্রচার করিতে সক্ষম হন নাই । তাঁহারা মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন অর্থাৎ মৌলিক গবেষণাসমূহ ইংরাজি ও জার্ম্মান ভাষায় প্রকাশিত করেন, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে বিজ্ঞানের নানাবিধ মূলতত্ত্ব প্রচার হইতে পারে তজ্জন্য মাতৃভাষা অবলম্বন করিয়াছেন ।" দ্বিতীয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে পরিভাষা প্রণয়নের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ সমিতি গঠিত হয় । সমিতির সদস্য ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায় (সভাপতি), হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত (সম্পাদক), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায়সহ আরো ১৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি । পরের বছর অনুষ্ঠিত

তৃতীয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে প্রফুল্লচন্দ্র ও প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'রাসায়নিক পরিভাষা' শীর্ষক গ্রন্থ প্রদর্শিত হয় ।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিজ্ঞান কলেজে তাঁর পূর্বেকার কক্ষে বাস করেছেন । এসময় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপকের পদে নিয়োজিত ছিলেন । ১৯৪৪ সালের ১৬ জুন প্রায় চুরাশি বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন । তাঁর তিরোধানের সংবাদ পেয়ে সর্বস্তরের মানুষ ছুটে এসে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান । বিজ্ঞান কলেজে দেশবিদেশ থেকে অসংখ্য শোকবার্তা আসে । বিভিন্ন জেলের কয়েদিরাও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পত্র পাঠান । প্রেসিডেন্সি জেলের বন্দিদের আবেগমি-ত একটি চিঠির কথা উল্লেখ করে প্রবন্ধ শেষ করব ।

আজ গুরুহীন বিদ্যাতীর্থের মন্দির, পিতৃহীন বিজ্ঞানাবিষ্করণ পরিষদ, উৎস-বিলুপ্ত মানবত্ব-উদ্বোধন প্রেরণা । আজ সম্বললুণ্ঠিত, অভাববিধুর ভারতভূমি । জ্ঞান-সাধনা-সিদ্ধ যুগাচার্য্য আজ দেহাতীত । তবু, চরম সান্ত্বনার বাণী আমাদের জানা আছে । মহা-মানবের মহোত্তম জীবনোত্থিত সেই বাণী অন্তহীন অমরত্বে আছে বিছিয়ে । ক্ষয়শূন্য সৌন্দর্যে থাকবে তা বেঁচে ভারতীয় বিজ্ঞান-যাত্রার প্রতি পদক্ষেপে, শিল্পবাণিজ্যানুগ প্রতিষ্ঠান কামনার সকল মর্ম্মে, চরিত্র সংগঠন প্রয়াসের

ঋষভের গল্প

হাবিব আনিসুর রহমান

পীরপুরের ইতিহাসে এমন বিশাল মিছিল আর কখনো হয় নি। শুধু বিশাল বললে ভুল হবে, এটা অভাবনীয় এবং অদ্ভুত এক মিছিল। একটা রিকশাভ্যানের ওপর মোটা কাঁথা তার ওপর দামি চাদর। বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছে পীরপুর ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান চেঙ্গিস খান। তার পেছনে পশ্চিমের কোনো এক দেশ থেকে আনা হাতির মতো বৃহৎ এক ষাঁড়। ষাঁড়টাকে দুঘণ্টা ধরে

টুলে বসে অপেক্ষমাণ খাদেম বলে– এসিছিলাম সার কিনতি, দুকান তো এখুনো খুলল না, দাও এক কাপ চা। এস্কান্দারের চা-দোকান যখন জমজমাট তখন সবাই দেখল বড়ো রাস্তা ধরে সোজা কেদারগঞ্জ বাজারের দিকে এগিয়ে আসছে বিশাল লম্বা এক মিছিল

গোসল করিয়েছে ইমান আলী। শিঙে কমলা রং, চোখে কালো সুরমা, গলায় গাঁদা ফুলের মালা। সাহেবদের মতো ফরসা রঙ গায়ের। মাঝে মাঝে ডানে-বাঁয়ে মাথা উঁচু করে উপস্থিত গ্রামবাসীর দিকে তাকাচ্ছে, বুক ফুলিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ষাঁড়টা। যেন সে বুঝে ফেলেছে এটা তার সংবর্ধনা। তা না হলে এত ঢোল কাঁসি আর বাঁশির শব্দে তার সাথে চেঙ্গিস খান জিন্দাবাদ স্লোগানে সে একটুও ঘাবড়াচ্ছে না কেনো। মনে হচ্ছে এই মিছিলে যোগদানকারী সমস্ত জনগণের ভাষা বুঝে ফেলেছে সে। স্লোগানের সাথে সাথে ষাঁড়টাকে নিয়ে বাঁধা গান গাচ্ছে পেছনের মাইল দুয়েক লম্বা মিছিলের জনগণ। মিছিলটা চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ি থেকে বের হয়েছে। যাবে সামনের বাসস্ট্যান্ড অর্থাৎ কেদারগঞ্জ বাজারে। বাজারটা এখন ছোট্ট শহরে পরিণত হয়েছে। বিদ্যুৎ আসার সাথে সাথে ডিশ টিভি কম্পিউটার তার সাথে ইন্টারনেটও চলে এসেছে।
বাজার ঘুরে মিছিল আসবে চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ি।
আম্বিয়া খাতুন ঘরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সংসার ছোটো হলেও কাজের কোনো শেষ নেই। একটা শেষ হলে আরেকটা। সেই ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠেই সংসারের কাজে লেগে যায় সে আর তার স্বামী খাদেম আলী। উঠোন লেপা, গরুগুলোর খাবার দেয়া, রান্নাবান্না গোসল, মেয়েটার এটা-ওটা আবদার রাখা, একেবারে নাস্তানাবুদ অবস্থা। স্বামী সকালেই লাঙল-গরু নিয়ে মাঠে চলে যায় জমি চষতে, ফিরে আসতে আসতে একেবারে বিকেল।
আম্বিয়া হাতের কাজ ফেলে দৌড়ে যায় রাস্তার ধারে। একটু আগে থেকে তার কানে ঢোল কাঁসি আর স্লোগানের শব্দ ভেসে আসছিল বহু দূর থেকে। বাড়ির কাছে আসতেই সে ছুটে গিয়ে দাঁড়ায় রাস্তার ধারে, দেখে রিকশাভ্যানে বসে আছে চেঙ্গিস খান। পেছনে হাতির মতো বিশাল এক সাদা ষাঁড়। তাদের পেছনে ঢোলবাঁশিকাঁসি নিয়ে নৃত্যরত বিশাল এক মিছিল। স্লোগানে স্লোগানে গ্রামের আকাশ বিদীর্ণ হবার দশা। আম্বিয়া মিছিল দেখে আর বলে– টাকা থাকলি মানুষ কতো কিচু করতি পারে, বাপরে বাপ!
খাদেম আলী সার কিনতে গেছে কেদারগঞ্জ বাজারে। দোকান খোলে নি তখনো। মিনিট বিশেক অপেক্ষার পর খাদেম আলী চায়ের দোকানে বসলে চা দোকানি এস্কান্দার মিয়া বলে– চা দেব খাদেম ভাই? টুলে বসে অপেক্ষমাণ খাদেম বলে– এসিছিলাম সার কিনতি, দুকান তো এখুনো খুলল না, দাও এক কাপ চা। এস্কান্দারের চা-দোকান যখন জমজমাট তখন সবাই দেখল বড়ো রাস্তা ধরে সোজা কেদারগঞ্জ বাজারের দিকে এগিয়ে আসছে বিশাল লম্বা এক মিছিল। মিছিলের সামনে রিকশাভ্যানের ওপর বসে আছে চেঙ্গিস খান, পেছনে হাতির মতো বড়ো বিদেশি ষাঁড়, তার পেছনে বাদ্য বাজনার সাথে নাচেগানে

ভরপুর মিছিল। বাজারের এদিক ওদিক থেকে কেউ কেউ দৌড়ে গিয়ে চেয়ারম্যানের সাথে হ্যান্ডশেক করে মিছিলে মিশে যেতে লাগল। অদ্ভুত উন্মাদনায় যুবক ছেলেগুলোর নাচের গতি গেল বেড়ে, মিছিলের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ল বাজারে । মিছিল যাবে চেঙ্গিস খানের বাড়ি, সেখানে ষাঁড়কে দাঁড় করিয়ে রেখে স্থানীয় নেতারা ভাষণ দেবে– কেন এই পশ্চিমা ষাঁড় আনা হয়েছে, কী তাদের উদ্দেশ্য। ইতোমধ্যে চেয়ারম্যান সাহেবের অনুগত কর্মীবাহিনী গবেষণা করে ষাঁড়ের নাম দিয়েছে রক। এখন সবাই ওকে ডাকে রক সাহেব বলে। অধিকাংশ মানুষ জানে আজ কী কী হবে। একজনের মুখ থেকে অন্যজনের মুখে ছড়িয়ে পড়েছে আজকের সভার কর্মসূচি। রককে নিয়ে জনসভা হবে। ইতোমধ্যে চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ির পাশে পুকুর পাড়ে দুটো বড়ো গরু জবাই করা হয়েছে। ঐ গরুর মাংস আর সাদা চালের ভাতের ভোজ হবে, তার আগে মিছিলে অংশগ্রহণকারী এবং সমস্ত গ্রামবাসীর সামনে রককে নিয়ে ভাষণ দেবে লিডাররা। শেষে সভাপতির ভাষণ দেবে পীরপুরের চেয়ারম্যান আলহাজ চেঙ্গিস খান। চেয়ারম্যানের ভাষণের আগে দলের সহসভাপতি আলহাজ তৈমুর মোল্লা দীর্ঘ সময় ধরে চেঙ্গিস খানের নানা গুণ এবং উপাধি নিয়ে ভাষণ দেবেন। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে স্লোগান উঠবে– চেঙ্গিস খানের চরিত্র ... মতো পবিত্র। তারপর শুরু হবে হাততালি, উঠে দাঁড়াবেন চেঙ্গিস খান, দুহাত নেড়ে তিনি তাঁর স্বভাব-সুলভ ভাষণ দেবেন রককে নিয়ে। তার বক্তৃতার চিৎকারে মনে হবে এই বুঝি মাইকগুলো ফেটে যাবে। তার ঘর্মাক্ত শরীরের ওপর পাঞ্জাবি ভিজে যাবে। সব শেষে শুরু হবে ভোজ।

মিছিল চলে গেল বাজার ছাড়িয়ে । চা খেতে খেতে খাদেম আলী সেদিকে তাকিয়ে থাকে, তার দেহ মনেও কেমন একটা উত্তেজনা। হঠাৎ বিদ্যুৎ এলে সারা বাজারের টিভিগুলো শব্দ করে ওঠে। এস্কেন্দারের চা-দোকানের টিভিটাও বেজে ওঠে– কাজরা রে কাজরা রে তেরে কালে কালে নায়না... গানের তালে তালে উদ্দাম নৃত্য। লম্বা লোকটা কী সুন্দর নাচছে, এই বয়সেও কি দুর্দান্ত হাতপা নাড়ানোর বাহার, বয়স্ক লোকটার সাথে এক যুবক আর এক অপ্সরা গানের তালে তালে নেচে চলেছে। অবাক হয়ে দেখে খাদেম আলী, ওর নিজের টেলিভিশন নেই। আম্বিয়া আর পরি মাঝে মাঝে অন্যের বাড়ি গিয়ে বাংলা সিনেমা দেখে, কখনো দেখতে দেখতে দুচোখ ভিজে যায়। বাড়ি ফিরেও চোখের পানি

“ মিছিল চলে গেল বাজার ছাড়িয়ে । চা খেতে খেতে খাদেম আলী সেদিকে তাকিয়ে থাকে, তার দেহ মনেও কেমন একটা উত্তেজনা। হঠাৎ বিদ্যুৎ এলে সারা বাজারের টিভিগুলো শব্দ করে ওঠে। এস্কেন্দারের চা-দোকানের টিভিটাও বেজে ওঠে– কাজরা রে কাজরা রে তেরে কালে কালে নায়না ”

থামতে চায় না। খাদেম আলীর অবাক হয়ে টিভি দেখা নিয়ে ঠাট্টা করে রশিদ মিয়া– খাদেম ভাই মনে হয় এ জগতে নেই, তুমার চা যে ঠান্ডা হয়ি গেল। খাদেমের কানে রশিদের কথা ঢোকে না– বুড়োটা আর যুবক-যুবতী দুটো কি আশ্চর্য নাচ নেচে চলেছে। রশিদ আঙুল দিয়ে গুঁতো মারে খাদেমকে– কি খাদেম ভাই তুমি কি চা খাচ্ছু, না ওই ছুঁড়ির বুক দেকচু?– ছিঃ ছিঃ, কি বলছিস রশিদ, বলে রশিদের হাত সরিয়ে দেয় খাদেম। তবুও সে রশিদের দিকে তাকায় না, শুধু চায়ের কাপে মুখ ঠেকিয়ে দেখে চা পানি হয়ে গেছে। নাচ থামলে রশিদ বলে– যাদের নাচ দেখলি, ওদের তুমি চেনো? খাদেম আলী বোকার মতো তাকিয়ে থেকে বলে,– দেক দিনি, ওদের কি করি চিনবু! রশিদ একটু খ্যাঁক করে হাসি দেয়– উরা তিন জন হলু বাপ, ছেলি আর ছেলির বউ বুজিচো? বুড়োটা হলো অমিতাভ বচ্চন আর ছোড়াটা হলু ওর ছেলি, সুন্দর মেয়িডা হলু ওই ছেলির বউ। খাদেম বোকার মতো বলে– মিত্যি কতা বলার জায়গা পাও না, যত সব ফাজিল! রশিদ বলে– এস্কান্দার ভাই, তুমি একটু খাদেম ভাইকে বুজিয়ি দাও তো উরা কারা। এস্কান্দার চায়ের কাপে টুংটাং আওয়াজ করতে করতে হেসে বলে– মিত্যি না খাদেম ভাই, সত্যি উডা বাপ ছেলি আর ছেলির বউ। ততক্ষণে আবার অন্য নায়ক-নায়িকাদের নাচ শুরু হয়ে গেছে– এ এক আশ্চর্য নাচ, ধুম মাচালে, ধুম মাচালে... । খাদেম ভাই তোমার সারের দোকান তো খুলিছে, সার কিনবা না? কে একজন বলল। টিভির পর্দার দিকে তাকিয়েই এস্কান্দারকে একটা পাঁচ টাকার নোট দিলে দুটাকা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, আবার এসো খাদেম ভাই। দোকান থেকে বের হলেও খাদেমের মস্তিষ্কের কুঠুরিতে পর্দার নাচ খেলা করে– আশ্চর্য সব কারবার, বাপ ছেলি ছেলির বউ এক সাতে সব নেমি পড়িছে নাচ করতি!

সে ষাঁড় কিনে দ্রুত বাড়ি ফেরে।

সকালে রান্না ঘরের মেঝে লেপতে লেপতে হঠাৎ আম্বিয়া খাতুনের কানে গেল হাম্বা ডাক। হাত থামিয়ে অপেক্ষা করে সে– কলি না? বাইরে বের হয়ে দেখে উঠোনে নাদার পাশে দড়ি দিয়ে বাঁধা কলি দূর আকাশের দিকে দৃষ্টি রেখে হাম্বা রবে আবার ডেকে উঠল। মাটির সাদা উঠোনটার একপাশে মাচার ওপর পুঁইয়ের সবুজ ডাঁটা লকলক করছে, ছোট্ট কুলগাছটার পাতার ওপর দিয়ে বাতাসে মিশে গেল তার হাম্বা ডাক। আম্বিয়া এগিয়ে গিয়ে মুখোমুখি হয় কলির– কিরে কলি হঠাৎ ডাকাডাকি করচিস যে, পেট ভরি নি? আম্বিয়ার মুখের দিকে তাকায় কলি। আবার ডেকে ওঠে– হাম্বা। আম্বিয়া ঘুরে ঘুরে কলির শরীর দেখে। পেছনের লেজের গোড়ায় চোখ পড়তেই বিষয়টা বুজতে পারে বংশপরম্পরায় কৃষককন্যা আম্বিয়া খাতুন। সে কথা বলে কলির সাথে– কিরে ষাঁড় দেখাতি হবে বুজি? কলি একটু মাথা নাড়ে, লেজ ঘুরায়। ফিরে এসে কাজে হাত লাগায় আম্বিয়া। কালো বকন তাই সবাই বলত– ওর নাম রাকো কালি। এ সব মানতে পারে নি আম্বিয়া সে বলেছে– কালি না, ও হলু আমার কলি। কালো তাই কি, কালো গরুর দুদ ভালো। কালোই আমার ভালো। বিকেলে খাদেম আলী গরু আর লাঙল নিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়ালে আম্বিয়া বলে– কাল দুপুরে কিন্তু সব কাজ বন্ধ। খাদেম কাঁধের লাঙল না নামিয়েই প্রশ্ন করে– ক্যানে, ক্যানে, কি হইয়িছে?– কিছু হয় নি, আগে লাঙল নামাও কাঁদ থেকি, পুকুরে যাও গোসল করো ভাত খাও, তারপর বলচি।

কাজের লোক খাদেম আলী, এটা ওটা করতে গিয়ে সে ভুলে যায় আম্বিয়াকে

জিজ্ঞাসা করতে বিকালে সে কী বলতে চেয়েছিল। রাতের বেলা স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে আম্বিয়া বলে– আমাদের কলির বতর হয়িচে, ওর এখুন ষাঁড় লাগবি।– বল কি, সব কিচু দেখি শুনি বলচু তো? খাদেম বলে।– হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সব দেখি শুনি বলচি, আম্বিয়া উত্তর দেয়।– ঠিক আচে কাল দপুরে খান সায়িবের বাড়ি যাবো ষাঁড় দেখাতি, বিদেশের নতুন ষাঁড় এনিচে, পিরায় হাতির সুমান, ঐ ষাঁড়ের বীজ ভালো, বাচ্চাও হবে তাগড়াই মুটাতাজা, কি বলো? আম্বিয়া স্বামীকে জড়িয়ে ধরে স্বপ্ন দেখে কলির বাচ্চা হবে, দুধ দেবে, কত কিছু। খাদেম আম্বিয়াকে জড়িয়ে ধরে বলে, আচ্ছা খুকির মা, ষাঁড় হিসাবে আমি কিরাম বলো তো? স্বামীর কথা শুনে হেসে মরে যায় আম্বিয়া! মিনসির কতা শুনলি গা জ্বলি যায়! তুমি তো ষাঁড় না, তুমি একখান বলদ, আরে মানুষ আর ষাঁড় এক হলু? আম্বিয়ার ওপরে উঠে জোরে চেপে ধরে খাদেম– কিন্তু কাজডা তো ঐ একই! হাসতে হাসতে আম্বিয়াও প্রাণবন্ত সাড়া দেয়। টিনের ঘরের মাঝখানে বাঁশের বেড়ার পার্টিশান। ওদের মেয়ে পরি এখন ক্লাস থ্রিতে পড়ে। সকালে সংসারের নানান কাজে দেরি হয়ে যায় খাদেম আলীর। সে ভাবে দুপুরের খাওয়া সেরে রওনা দেবে খান সাহেবের বাড়ি। দ্রুত সে কলিকে নিয়ে নদীতে যায়। হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে হাতের জড়ানো বিচালি দিয়ে কলির গা পরিষ্কার করতে থাকে। কলির সমস্ত শরীরে পানি ছিটিয়ে দেয়, শিং ধরে ডুব দেয়ায়। তারপর নিজে গোসল করে কলিকে নিয়ে বাড়ি ফেরে। নাদায় বিচালি কেটে দিয়েছে আম্বিয়া, সঙ্গে দুপুরের ভাতের মাড়। একটু শক্তিশালী হোক গরুটা, ভীষণ রোগা পটকা কলি।

খেয়ে উঠে খাদেম আলী কলির গলার দড়িটা ধরে উঠোনে দাঁড়ালে আম্বিয়া কলিকে আদর করে– যা নতুন ষাঁড়, তোর কপাল ভালো, বাচ্চা হবে তাগড়াই, একটা বকনা বাচুর হলি আমি খুশ হবো। কলির হেঁটে যাওয়ার দিকে অনিমেষ তাকিয়ে থেকে স্বপ্নের জাল বোনে।

খাদেম রাস্তায় নামলে দেখা হয় কোরবান পরামানিকের সাথে।

কোরবান বলে,

–অসুময়ে বকন নিয়ি কুতায় যাচ্চ খাদেম ভাই?

–যাবো বাপু ঐ খান সায়িবের বাড়ি।

–ও বুজিচি, ষাঁড় দেকাবা তাই না, সুমায় হয়িচি? তুমার গরুটাকে কি খাবার দাও না হাগো?

–ক্যানে, খাবার দোবো না ক্যানে, খুকির মা তো সব সুমায় যত্ন নেয়।

–তা গরুডা তুমার বেজায় রুগাপটকা!

–ধর সুংসারের নানা কাজে ব্যস্ত থাকি, ইডা করতি গেলে উডা হয় না, এট্টু যে মাটে চড়াব, সবুজ গাছগাছালি খাওয়বো তার জো নেই। তবে গাবীন হলি দেকবা এই গরুই একেবারে সুন্দরীকইন্যার মতো দেকাবে।

মোল্লাবাড়ি ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে যেতেই রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এক জোয়ান মরদ এঁড়ে ছুটি এসে কলির পথ আগলায়। হঠাৎ সে কলির গায়ের ওপর উঠতে চায়, কিন্তু খাদেম আলীর পাঁচনের ঘা খেয়ে পালিয়ে যায় জোয়ান এঁড়েটা। আম্বিয়ার কথা তাহলে সব ঠিক, সত্যি ঋতুমতী হয়েছে তাদের কলি! দ্রুত পা চালায় খাদেম, খান সাহেবের বাড়ি এখনো অনেক দূর।

চেয়ারম্যানের বাড়ির চৌহদ্দীর মধ্যে ঢুকে খাদেম আলী ভড়কে যায়। আজকেও চারপাশে লোকে লোকারণ্য। নতুন ষাঁড় এসে পৌছানোর পর জেলা শহরে খবর

হয়ে গেছে। টিভি সাংবাদিকরা ক্যামেরা আর মাইক্রোফোন হাতে কৃষকদের ইন্টারভিউ নিতে ব্যস্ত। সবার আফসোস এখন যদি একটা ঋতুমতী বকনা পাওয়া যেত তাহলেই সব কামাল হয়ে যেত! কী বিস্ময়কর ব্যাপার তখনি খাদেম আলী কলিকে নিয়ে হাজির হয়! তখন চারদিকে শোর ওঠে, হবে হবে এবার হবে! ষোলকলা পূর্ণ হবে। চেঙ্গিস আর ইমান আলী উচ্ছ্বসিত জনতাকে বসতে বলে। তখনি চেঙ্গিস খানের সামনে একজন সাংবাদিক মাইক্রোফোন ধরে– এখন আমরা কথা বলব এই এলাকার জনদরদি সমাজসেবক চেয়ারম্যান চেঙ্গিস খানের সাথে, যিনি আগামীবার এমপি ইলেকশান করবেন এবং অবশ্যই জিতে যাবেন (সাথে সাথে চেঙ্গিস খানের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে)। আচ্ছা এই যে বিদেশি ষাঁড়, এই অঞ্চলের গাভিগুলোকে গর্ভবতী করবে এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী? চেঙ্গিস খান বুক ফুলিয়ে বললেন– প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম, যে বিদেশি ষাঁড় আনা হয়েছে তা দিয়ে আমাদের গাভিগুলোকে গর্ভবতী করানো হবে, তারা স্বাস্থ্যবান বাছুর উপহার দেবে, সেই বাছুর বড়ো হয়ে দৈনিক দশপনের কেজি দুধ দেবে এবং সেই দুধ খেয়ে আমাদের ছেলেমেয়েরা স্বাস্থ্যবান হবে, এরকম একটা হাতপা লিকলিকে চিকন দুর্বল জাতি শুধুমাত্র কূটচালে নয়, গায়ের শক্তিতেও এই বিশ্বায়নের যুগে মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হবে। সে জন্যই এই ষাঁড় নিয়ে আসা। –আপনাকে ধন্যবাদ স্যার। এবার সাংবাদিক ঢাকায় ফোন করে প্রযোজককে– কিবরিয়া ভাই, যখন ষাঁড়টা গাভীটার ওপরে উঠবে তখন কি পিকচার টেক করব? ওপার থেকে প্রযোজক বলে– অবশ্যই অবশ্যই, তবে সেটা নিউজে যাবে না, ওটা আমি বাসায় নিয়ে তোমার ভাবিকে দেখাব, তুমি মারুফকে বল পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবিটা ধরতে, ওকে?
চেয়ারম্যানের সহকারী খাদেমকে বলে– ষাঁড় দেখাবি টাকা এনেচিস? খাদেম আলী বলে, এনিচি, তুমি সব ব্যবস্থা করো, কত টাকা ইমান ভাই? ইমান আলী বলে দুশো টাকা। খাদেম বিস্ময় প্রকাশ করে, দুশো টাকা? সবাই যে বললু পঞ্চাশ টাকা করি নিবা! ইমান আলী তুচ্ছ করে বলে, ইডা কি তোর দেশি জিনিস পেয়িচিস যে দুপাঁচ টাকা দিলিই কাজ হয়ি যাবে, ও বিদেশি জিনিস, ওর খরচ অনেক, তোর কাচে আচে কত টাকা? খাদেম মুখ কাঁচুমাচু করে বলে, একশ টাকা আচে, তুমি কাজডা কইরি দাও ভাই। খাদেম দশটা দশটাকার ময়লা নোট ওর হাতে গুঁজে দেয়। খাদেম ভাবে, এই একটা মাত্র কাজের জন্য আজ সে তার সমস্ত কাজ বন্ধ রেখেছে, আম্বিয়াও অপেক্ষা করে আছে, এখন কাজটা ভালোয় ভালোয় শেষ হলে খুব ভালো হয়। চেঙ্গিস খান ইমান আলীকে ইশারায় কাছে ডাকে, বলে– যা দিয়িচে তাই নিয়ি কাজডা করি দে, যত সব বুকাচুদার দল! সে তখন অপলক দৃষ্টিতে দেখছিল রককে– শালা একটা সুপুরুষ বটে, দেখ না কেমন তাকিয়ে আছে বকনাটার দিকে!
চেঙ্গিস খান বসে আছেন একটা চেয়ারে, চারপাশে শত শত লোক, তার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। এবার সে গভীর মনোযোগ দিয়ে রক আর খাদেমের বকনার বিষয়টা প্রত্যক্ষ করবে। কলিকে বাঁধা হয়েছে একটা মেহগিনি গাছের সাথে আর রক উন্মুক্ত। রক কলির গায়ের ঘ্রাণ নেয়, সে যখন কলির গা চাটে তখন বিশাল রকের কাছে কলিকে খুব ছোটো আর দুর্বল মনে হয়। চেঙ্গিস খান বলেন, তোর বকনা তো একদম দেশি রে, ওর মধ্যি কোনো দো-আশলা ভাবও নেই, বেজায় রুগা। আকস্মিক রক কলির পেটের পেছন দিকে দুপা তুলে দিলে রকের নাভির

কাছে যেন গোলাপি রঙের একটা সাপ বের হয়ে এলো চকিতে। কলি পড়ে যেতে যেতে খুব কষ্টে রককে সামলে নিল। চেঙ্গিস খান আবার সিগারেটে আগুন দিয়ে একটা গভীর টান দিয়ে বললেন, শোন খাদেম, কাজডা কিন্তু ভালো মতো হলু না! আরেকবার উঠা ইমান। রককে মোটেও ক্লান্ত লাগে না কিন্তু কলিকে বেশ আতঙ্কিত মনে হলো খাদেমের কাছে। সে বলে, চাচা একবার উঠায় হবে নাকো? – আরে না না, আরেকবার হোক, সিগারেটে টান দিয়ে চেঙ্গিস খান বললেন।

খান সাহেবের কথার জবাব না দিয়ে হাতের পাচনটা নিয়ে লুঙ্গি ঠিক করে খাদেম। সে এগিয়ে যায় কলির দিকে। খান সাহেবের তখন অন্য কোনো দিকে মনোযোগ নেই। হাতের সিগারেট আর কলির দিকেই তার দৃষ্টি। আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে রক তার সামনের পা দুটো তুলে দেয় কলির পেটের পেছন দিকে, বেশ জোরে একটা চাপ দেয়। এবার চাপ সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে যায় কলি। চারপাশের দাঁড়িয়ে থাকা জনতা হো হো করে হেসে ওঠে। কেউ কেউ মন্তব্য করে– শালা কিসির সাতে কি!

রক কিন্তু পরিপূর্ণ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় ভীষণ রুষ্ট, তার চাহনি আর শরীরের ভাষাতেই তা বোঝা যায়। দ্রুত খাদেম ছুটে যায় মাটিতে পড়ে থাকা কলির কাছে– হায় আলা ইডা কী হলু ! একটা করুণ দৃষ্টিতে খাদেমের দিকে তাকিয়ে থাকে কলি।

ততক্ষণে মানুষের ভিড় কমতে থাকে। চেয়ারম্যান সাহেবও কখন সিগেরেট ফেলে চলে গেছে কেউ তা খেয়াল করে না। খাদেম দ্রুত পশুর ডাক্তার গামাকে ডেকে আনে। গামা কলির গায়ে এখানে ওখানে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে শেষে বলে, গরুর পেছনের পায়ের জোড়া খুলে গেছে, আর কখনো উঠে দাঁড়াতে পারবে না। খাদেম মরিয়া, সে কলিকে বাড়ি নিয়ে যাবে। ইমানকে বলে, ভাই একটা ভ্যান গাড়ি হলিই আমি ওকে বাড়ি নিয়ি যেতি পারি। ডাক্তার গরুর চোখমুখ দেখে হঠাৎ বলে ওঠে, তুমার এই গরু মনে হয় বাঁচবি না। – ক্যানো ক্যানো বাঁচবি না ডাক্তার? দ্রুত খাদেম জিজ্ঞাসা করে। – ওর চোখ মুখ দেকি মনে হচ্চি ওর হার্টে মনে হয় কিছু হয়িচি, দেখছ না বুকটা ক্যামন ধুক্ ধুক্ করচি। – তাইলি কি করবু এখন, খাদেম উৎকণ্ঠা নিয়ে বলে মাটিতে বসে পড়ে, তার চোখ দিয়ে পানি গড়ায়। ডাক্তার দুঃখ প্রকাশ করে, এখন আর কেঁদি কি হবে বল, এত বড়ো বিদেশি ষাঁড় আর এইটুকু বকনা, একি ওর শরীরের ভর নিতি পারে বোকা কোথাকার! এখুন কসাই ডাকো, দেখ জবাই করি যদি কিছু টাকা পাও! ডাক্তারের শেষ কথা শুনে খাদেম আলী জোরে কেঁদে ওঠে, হায় আল্লা, ইডা আমার কী হলু, কী করতি এসি কী হয়ি গেল!

শেষ পর্যন্ত কসাইয়ের সাথে রফা করে দিল ইমান আলী। কসাই চেয়েছিল পাঁচ হাজার, দর কষাকষি করে ইমান সাতে ঠিক করে দিল।

জবাই শেষ। মাথা নত করে বসে আছে খাদেম। কসাই চামড়া ছাড়াচ্ছে আর তার সহকারী ততক্ষণে মাংস বিক্রির প্রচারে নেমে গেছে।

অপেক্ষা করে আছে আম্বিয়া। সন্ধ্যা হয়ে গেছে মানুষটা এখনও ফিরছে না কেন? এত দেরি তো হবার কথা না! মেয়েকে বলে– তোর বাপজান তো এত দেরি করার লোক না মা। মনে হয় চেয়ারম্যানের বাড়ি থুয়ি অন্য কুনোখানে গিয়িচে, এত সময় তো লাগার কতা না। পরি কোনো কথা বলে না, সে চুপচাপ।

সন্ধ্যার পর খাদেম আলী গামছায় জড়ানো দুকেজি মাংস আর বুক পকেটে সাত হাজার টাকা নিয়ে বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়ায় । তার কানে যায়, পরি বলছে– মা, রোজ তিন কেজি দুধ একশ টাকা । তারপর কলির বাছুর থেকি আবার বাচ্চা হবি, উডা বিক্রি করি কত টাকা পাব, শোন আমার কিন্তু নতুন জামা কিনি দিতি হবি । মেয়ের মাথায় হাত রেখে মা বলে– আল্লা যদি ইবার মুখ তুলি চায় তো দেখবি ঐ কলিই আমাদের ভাগ্য ঘুরিয়ে দেবে, আগে ঘরের টিন পাল্টাব তারপর অন্য সব কিছু হবি ।
উঠোনে দাঁড়ানো খাদেম আলী কথাগুলো শোনে । চারপাশে নিকষ কালো অন্ধকারে জোনাকিগুলো ভেসে বেড়ায় । তার সামনে পিছনে ডানে বামে চারপাশে ভাসমান জোনাকি দেখে খাদেম । উঠোনের পাশে সজনে গাছটার দিকে চোখ পড়ে, ওখানে দাঁড়িয়ে আছে কলি । দুচোখ মুছে ভালো করে তাকায় কলির দিকে, সে একজন আসামির মতো কাঠগড়ায় দাঁড়াতে চায়, সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিতে চায় কিন্তু কেউ এসব শোনে না । সে উঠোন থেকে ঘরে ঢুকতে গিয়ে ফিরে আসে আবার ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করে আবার ফিরে আসে । ফিরে এসে আবার ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করে কিন্তু সে তা পারে না ।

জুলফিকার মতিন

খানজাদা বেগম

দূর পাহাড়ের চূড়া থেকে আসে দেহাতীত আত্মারা,
খোলা বুক পেতে ভয়ে বিবর্ণ পামিরের মালভূমি,
সরাইখানায় ভিড় জমে যায় ...
সাঁঝ আকাশের কোলে
তারারা কেবলই মিটিমিটি জ্বলে হারিয়ে যাবার ভয়ে,
আলো-আঁধারের এ প্রহরটুকু ধরে রাখে মহাকাল।
প্রবল বাতাস ছুটে আসে বেগে– থমকায় পাথরেতে,
কাঁকর-বালির পিছলানো বুকে আঁকা থাকে পদরেখা,
নিঃসীম তার চিহ্ন মলিন মুছে যাবে এক দিন,
পাওয়া না পাওয়ার দুঃখবোধের করুণ প্রণতি মাখা।

গোয়ালিয়র আর মঙ্গোলিয়ার ঘোড়ার সওদাগর,
হীরা-জহরত-মণি-মুক্তোর ব্যবসায়ী গজনির,
বাঙাল থেকে এসেছে গাধার পিঠে বেঁধে মসলিন,
তাজা মশলার ঘ্রাণ ভরা বোঝা রয়েছে বা কারও কাছে।
আতর বেচতে কেউ কেউ আসে নিশাপুর থেকে হেঁটে,
বাগদাদ থেকে নুরানি-হেকিম রয়েছেন ভিড়ে মিশে,
রাজপুতানার ধারাল কৃপাণও অতি সুলভেই মেলে।
পথের মায়ায় বেরিয়েছে কেউ ঘরের ঠিকানা ভুলে,
ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে অনেকে পড়ে আছে রাতদিন,
যুদ্ধক্লান্ত সৈন্যরা এসে এখানে পেতেছে থানা,
আমি তো এসেছি রূপের জাদুতে খানজাদা বেগমের।

ফারগানা থেকে ফোটা সেই ফুল প্রস্ফুট দুনিয়ায়,
বাবরের বোন– দুর্ভাগ্যের নিয়তি-শাসনে ঘেরা,
যেন তার সাথে পাল্লা দিয়েই সৌন্দর্যের দ্যুতি
বিজলির মতো চিরেছে আকাশ করে দিয়ে ফালা ফালা।

সেই বহ্নিতে প্রভা-প্রদীপ্ত সারা তাজাকিস্তান,
বাদাখশানেও প্রজ্বলন্ত তারই তো মায়াবী শিখা,
তুর্কিস্তানে লোকমুখে মুখে ঘুরেফিরে শুধু আসে
ছায়া-প্রতিভাস অনেক চাওয়ার খানজাদা বেগমের
মুখশ্রী যেন চিত্রপটের– গোলাপি অধরে রস,
পক্ক গমের বর্ণিলতাতে লাবণ্য সারা দেহে,
মৃণাল বাহুতে কোমলতা দিয়ে সুরভি আলিঙ্গনের
মত্ত মাধুরী ঢেউ খেলে যায় উদ্দাম সাগরের।
সুপুষ্ট বুক মায়ায় জড়ানো তলহীন গভীরতা,
ক্ষীণ কটিদেশে ভারি নিতম্ব দোল খায় অবিরাম।
আপেলের মতো টসটসে গালে প্রভাত বেলার রোদ,
না বলা কথার মোহন ভাষারা দুই চোখ রাখে ধরে,
মেদহীন তার সরাল শরীর একহারা তরবারি,
পায়ের ছন্দে অমরাবতীর নৃত্যের মাধুরিমা।
সুকণ্ঠ তার পাইন বনের সুললিত মর্মর,
বসন্ত দিনে যেন বাতাসের মুগ্ধ নিমন্ত্রণ।
সাদা ওড়নায় ঢাকা আধো মুখ খানজাদা বেগমের,
স্নিগ্ধ চাঁদের আলোর মতোই মাটির ধরণী জুড়ে
চেনা অচেনার রহস্য গড়ে চিরকাল থাকে বেঁচে।

ঘূর্ণাবর্তে ইতিহাস জুড়ে রক্তের হোলিখেলা,
অসি ঝংকারে টগবগ ফোটে প্রতিহিংসার ক্রোধ,
ঘোড়ার খুরের উল্লাস দিয়ে অবিরত ছুটে চলা,
সিংহাসনের বড়ো উপহার কর্তিত মস্তক।
প্রবল প্লাবনে নেমে আসে বেগে যুদ্ধের ঘনঘটা,
মাটির পৃথিবী মৃতদেহে ভরে যায়,
তাজা খুন দিয়ে লালে লাল হয় আমু দরিয়ার পানি।
আঙুরের ক্ষেতে দাবানল জ্বলে– ভস্মরাশির স্তূপে
ঢাকা পড়ে যায় মানবমহিমা– জান্তবতাই বড়ো।
স্বজন হারানো বিয়োগ ব্যথারা নক্ষত্রের মতো
অনিদ্র শুধু জেগে থাকে দূর বোবা আকাশের গায়।

শত্রু হস্তে বেদখল হয় বাবরের ফারগানা,
এক বার ছোটা সমরখন্দে– খোরাসান-খারেজমে,
হিন্দুকুশের ভয়াল গুহাতে আশ্রয় খুঁজে ফেরা,
আবার কখনো ঘাঁটি পেতে বসা কাবুল-কান্দাহারে ।
এখানে সেখানে– ছিন্নভিন্ন সৈন্যদলের সাথে,
যাযাবর পাখি– শীত ও গ্রীষ্ম ঘোড়ার পিঠেতে কাটে,
চরকির মতো বনবন ঘুরে জীবনের থিতি খোঁজা,
ভাগ্যচক্র বড়ো প্রতারক আশানিরাশায় দোলে ।
অস্থির দিনে কখনো তাঁবুতে– কখনো দুর্গ মাঝে–
রাতের আঁধারে ঢাকা কাফেলাতে খানজাদা বেগমের
তবু যৌবন বাড়ে ।
ঝড়ের ভেতরে ফুটে থাকা এই পুষ্প সঙ্গহীনা
সৌরভ তার ছড়ায় কেবল দিকদিগন্ত জুড়ে ।

তাকেই খুঁজতে আমি তো এসেছি কত পথ পাড়ি দিয়ে
ধূসর উষর মরুভূমি ভেঙে– মাড়িয়ে অরণ্যানী,
উত্তাল স্রোত খরতরঙ্গ– মানি নি সে সব বাঁধা
গিরিসঙ্কুল দুর্গমতার পাহারা করেছি জয় ।
পৃথিবীর সব প্রেম
তাকে দেব বলে হৃদয়ে করেছি জড়ো,
সৌন্দর্যের কাছে হবে তবে মানবেরই পূর্ণতা ।

অতীতের ঘ্রাণ শুঁকে শুঁকে পথ চলি,
আমার সামনে মৃত ইতিহাস হয়ে ওঠে বাঙ্ময়,
জীবন্ত ছবি হাসিতে মধুর খানজাদা বেগমের
শত ঝরনার কলকাকলিতে সমুদ্র পানে ছোটে ।
অধরের ভাষা অধরে মিলায়,
কানে কানে কথা কত বার হয়,
চোখে চোখ রাখা গোপন-চকিতে হৃদয়ের বিনিময়
দুইটি প্রাণের মেলবন্ধন নিমেষেই দেয় গড়ে ।

আবার কখনো ঘুমভাঙা রাতে সে আসে আমার
জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সে নরম ক্ষণ কখনও হয় না শেষ....
শিয়রে দাঁড়ায়– আঙুলের মধু ঢেলে দেয় কপালেতে,
রিনিরিনি সুর হাতের চুড়ির অনাদ্যন্ত বাজে ।
দীর্ঘ ছায়াটি পড়ে থাকে তার মধ্য এশিয়া জুড়ে,
তারই তলে বসে প্রেমের প্রতিমা গেঁথে গেঁথে শুধু তুলি ।
একবার শুধু দেখা পেতে চাই খানজাদা বেগমের,
তাকে ভালোবাসি– এ কথা বলাটা শত জনমের দায় ।
ছাতিফাটা রোদে গায়ের চামড়া ঝলসায় বারে বারে,
শীতরাত্রির হিমেল কাফন মুড়ে দেয় সারা দেহ,
ছোঁয়া তো যায় না কারাকোরামের চূড়া,
ইন্দ্‌জিল নদী ঢেকে যায় বরফেতে,
চিনারের গাছে রিক্ত বাতাস হাহাকার করে মরে,
দিন ও রাতের ভেদ মুছে দেয় তুষারপাতের ঝড় ।
পাহাড় দাঁড়ায় সামনে প্রাচীর হয়ে,
গিরিকন্দরে তমস আঁধার বীভৎস চিৎকারে
খুলে দেয় প্রেতলোক,
মরুভূমি তার লেলিহান জিভে বের করে আক্রোশে ।
ভুল হয়ে যায় আন্দিজানের পথ,
যত দূর যাই খুঁজে পাই না তো মার্ভ আর কুন্দুজ ।
হিরাটের ধূলি ঘন হয়ে আসে– হীসারে যায় না ঢোকা,
বলখের ভাঙা দুর্গশিখরে প্রলয়ঘণ্টা বাজে ।

সরাইখানাতে গোধূলির শেষ চিহ্নটি মুছে যায়,
সাঁঝরাত্রিতে তখন সবাই গল্পগাথাতে মাতে,
রূপকথা শোনে খানজাদা বেগমের,
কথকপ্রবর, আমারও কথাটা বলে দিও তার সাথে ।

আলতাফ হোসেন

ঘুড়ি

যে আমাকে সবটা শেখাল তার কিছু মনে নেই।

তিনহাট্টিতে ওড়াচ্ছি ঘুড়ি সবুজ ও নীল। উড়ছে আপন মনে তিনদিকে
তিনটি। কোনোটিই কারো দিকে তেড়ে যেতে আরম্ভ করে নি।
জগতে দুপুর। ঘুম পেতে থাকে। সুতা ছাড়তে থাকি। আর
টের পাই সব ছেড়ে যাচ্ছে লালুখেত। সমস্ত তিনহাট্টি।
সব বাস, ট্রাক, দেশ, ভাটিয়ার ।
স্টেশন কখন গজিয়েছে। সারি সারি ট্রেন।
এখানে এদেশে কোনো যুদ্ধ শুরু হয়েছে জানি না।
লোকেরা আসছে। আসছেই। দু হাতে লাগেজ।
কালো কোট। কালো কালো।
লাটাই ছাড়ছি। কখন ফুরাবে? ঘুড়ি আর নজরে আসছে না।
আহাহাহা, কোথায় দাঁড়িয়ে? এ যে ওয়েইং মেশিন।
মিটারের কাঁটা নামছে দ্রুত।
কতদিন পর কত হালকা যে হচ্ছি বেশ লাগে। হতে-হতে পালকের প্রায়।
দুলছি দুলছি।

আমাকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে কী দৃপ্ত একদার এক নীল ও সবুজ...

খালেদ হোসাইন

শুক্রবারে লেকের ধারে

বুঝতে পারছি বয়স বাড়লে রাগ অনুরাগ সবই বাড়ে
তোমার জন্যে বসেছিলাম শুক্রবারে লেকের ধারে ।

তুমি তো নেই হঠাৎ এলেন রূপসী এক মৎস্যকন্যা
গল্প হলো যৎসামান্য বসতে তেমন রাজি হন না ।

তবে তুমি ভেবে দেখ, কীভাবে সেই সময় কাটে
তুমি তখন ভিড়ে আটকা কে জানে কোন রাস্তা-ঘাটে ।

আমার তখন রাগ হলো খুব, রাগ বাড়লে বয়স বাড়ে
এক কালে তা বুঝতামই না, এখন বুঝি হাড়ে হাড়ে ।

আমিনুল ইসলাম

শিকস্তি-পয়স্তি

চারপাশে করাতের শব্দে বৃক্ষপাড়ায় আজ ঘুম নেই
যেন একাত্তরের ক্রসফায়ারে চর ইসলামপুর গ্রাম!
শ্যামা কি ফিলিস্তিনি নারী?
এতটা বিমর্ষ স্বর আগে তো শুনি নি!
মুনিয়া কোয়েল রাতচোরা– কোথায় তারা?
কেবলই পাখশাটের শব্দ –
আর বাতাসের গায়ে বিহ্বলতার স্বেদ
কিন্তু আজ তো কোথাও কোনো শরণার্থী ক্যাম্প নেই!
তারপরও ওইটুকু পক্ষপুটের দিকে
তাকিয়ে আছে সভ্যতার নল
এবং এ ব্যাপারে অ্যারিস্টটলের ন্যায়বিজ্ঞানও আজ বিস্তর নীরব!
এদিকে মাচানে নাকডাকার শব্দে
সিঁধেল চোরের পা পেয়েছে কুড়াল-করাত–
ইতোমধ্যেই আরশিনগরে এসে গেছে
মেয়রের বুলডোজার– মড়-মড় মড়-মড়
আর ইটকাঠের গুঁড়োয় ঝাপসা হয়েছে সাফুচাচার পুথিপড়া চোখ।

প্রসঙ্গত আমাদের পিতা নদীবাসী ছিলেন;
তার ছিল চর-অন্বেষার নেশা
মাঝে মাঝে আমাকেও সঙ্গে নিতেন;
হয়ত তাই আমি দেখে ফেলি–
সংহারপ্লাবনের ঢেউগুলো অনুকূল হাওয়ায় উথলে উঠেছে
আর তার শুভ্রচুড়োয় ধাক্কা খেয়ে আছড়ে পড়ছে একজোড়া গাঙচিল
তাদের ঠোঁটের সীমানায় উঠে আর ডোবে– উর্বর এক ভূগোল।

আলমগীর রেজা চৌধুরী

টমাহকের পাশে শুয়ে আছি

টমাহকের পাশে শুয়ে আছি।
দিশে হারা।
ওই সব ভয়ানক মারণাস্ত্রের পাশে শুয়ে
তুমি মন পবনের নৌকায় পালতুলে
বাণিজ্যের কড়ি বাজিয়ে ধেয়ে আসো
দজলার তটরেখায়।
সত্যি দিশেহারা।
মুঠোফোনে ছবি–
আরব সাগরে রণতরীর মাস্তুল,
বঙ্গোপসাগরে হাঙরের উৎপাত
মধ্যপ্রাচ্য পুড়ে জনতার তীব্র চিৎকার।

আমি বলি, আমার অন্ধ পিতার শিয়রে কিছু নেই।
শূন্যতা, আহ!
ধোয়াশায় আড়াল আছে,
অন্ধকারের দেয়াল।
কারো কিছু জানা নেই–
শুধু এ কান থেকে ও কান...।
টমাহকের পাশে শুয়ে আছি
নিদ্রাহীন স্বপ্নহীন ভেজা চোখ
শুধু হন্তারকের বসবাস,
টুক টাক এক্কা-দোক্কা খেলা।
সাবাস টমাহক মামা।

আরব সাগরের নীল জলরাশি
শেষ সূর্যের সন্ধে মীনের লম্ফ ঝম্প নেই,
আলবাট্রাসের ডানায় নীলাভ আকাশ
শুধু ফিসফাস গুঞ্জন নিয়ে আসে
এক খ- কালো মেঘ
আর লালমুখো ঈগলের লোভাতুর চোখ।
আকস্মিক আমার অন্ধ পিতা বলে,
নীলেই থাকো বঙ্গোপসাগরের ঘোলাজল।

আর আমি টমাহকের পাশে দেখি
পরান শেখ কাস্তে উঁচিয়ে আছে।

সৈয়দ আখতারুজ্জামান

আনসারিং মেশিন

এখন সময় নেই কারো
ইঁদুর-দৌড় ধাওয়া করে খুলির ভেতরে
দরজায় কড়া নাড়ো
আমরা ঘরে নেই কেউ
জেগে ওঠে আনসারিং মেশিন
অথবা কুকুরের ঘেউ ভাঙে নিস্তব্ধতা
এ যাত্রা মেসেজ রেখে যাও
দারুণ আকাল আজ হৃদয়ের ভেতর-বাহির।

আমার এখানে এখনো মাঘের শীত আর
মাথার ওপর বিস্ফোরিত মহাকাশ
ধূমকেতু ভাঙে হঠাৎ তমসা
বিমানের প্রোপেলার ভাঙে মেঘের বিন্যাস
ভাঙা চাঁদ আধখানা জেগে ওঠে মাঠের কিনারে
অগাধ সময় সজাগ এখানে
প্রশ্ন না করতেই এখানে সহস্র উত্তর রাশি রাশি...

খালের গোড়ায় মজিদের নৌকা নিথর দাঁড়িয়ে
হারিকেন টিপটিপ জ্বলে
বাড়িতে আমরাও কেউ নেই
আনসারিং মেশিন ঝিঁঝি পোকা হয়ে আছে।

কচি রেজা

ভোরবেলা এই অজস্র প্রজাপতি

ভোরবেলা এই অজস্র প্রজাপতির গন্ধ আমার ভালোই লাগে
তবু কেন যে তুমি বাগানে যাও!
বাগানের সব ফুলের গায়ে কি আর প্রজাপতির ঘ্রাণ?
তোমার গায়ে গন্ধ না থাকলে আমার ভয় লাগে
আর তুমি দুঃখ পাও আমি পুড়লে,
পুড়ুক না,
তুমি একটার পর একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে যাও!

বাইরের অপরিমেয় রোদে স্বচ্ছ আমার মুখ
আমি মুখটাকে একটু ভালো করে দেখি, মিথ্যে বলছে নাতো!
সকাল থেকে কত ব্যর্থতা আর বিনাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা
এই মুখের,
এ কি অন্য কারুর মুখ? এমন শীতে এমন শাদা মেঘ জমবার
কথাতো নয়!

পরদিন কান্নাটা আবার ডুকরে ওঠে, প্রজাপতি ধরে পাখনা ছিঁড়ে
কী লাভ?
জগতের এই ছন্নছাড়া খেলা আমার ভালো লাগে না,
এখনই যদি নদীর ধারে অথবা তেপান্তরে যাওয়া যেত!
কিন্তু আমি যে আগুনের পক্ষে কথা বলি সে তো আগুনের
আভিজাত্যের জন্যে,
আগুন পোড়ালে ছাইটুকু থাকে তুমি পোড়ালে কিছুই থাকে না!

তবু তুমি আর একবার দুটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাও তো!
বাতাসে নিভে যাক এই বনেদি মেঘ,
তুমি কি আবার বাগানে চলে যাবে?
বাগানে তোমাকে দেখি বিষ পিঁপড়ের ভেতর আটকে যেতে!
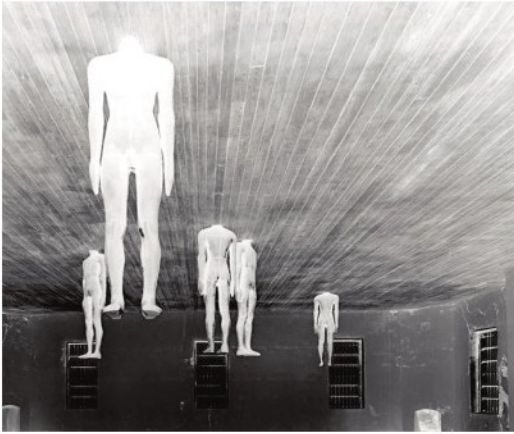
জন্ম-কয়েদী

দীপন জুবায়ের

শরীরের ওপর বসা মশাটা ঠাস করে মেরে নিজেই ভয়ানক চমকে উঠল বাদশা। ইশ্ এত জোরে শব্দ করা ঠিক হলো না। বিরাট ভুল হয়েছে। আর ভুল করা যাবে না। রাস্তার এই নির্জন অন্ধকার দিকটাতে ভয়ঙ্কর মশার উৎপাত। কতক্ষণ সহ্য করা যায়। মানুষের শরীর তো। আর প্রতিবাদ না করলে মশাগুলো এসে ভীষণ হুল ফোটায়। বোধহয় মনে করে যাক এবার একটা আজব চিড়িয়া

এখনও সময় আসে নি। সময়ের কাজ সময়ে নিয়ম এর বাইরে গেলেই ধরা। ওর পেটে আজ তিন রাত তিন দিন একমুঠো ভাত পড়েনি। রাস্তার ওইসব গু-ছাই খেয়ে আর কতক্ষণ সহ্য করা যায়। কুকুরের খাবার মানুষের পেটে সহ্য হবে কেন

পাওয়া গেল। পেটের ভেতর ভীষণ ক্ষুধা, সে সাথে অসহ্য মশার যন্ত্রণা। সহ্য করা যায় কতক্ষণ। ও চুপচাপ বসে আছে অন্ধকারে। কতক্ষণ বসে আছে বলতে পারবে না। ওর কি আর সময়ের হিসাব আছে? ওর এখন শুধু একটাই চিন্তা খাবার আর খাবার। সবকিছু সহ্য করা যায়; কিন্তু এই ভীষণ ক্ষুধা সহ্য করা যায় না। ওর চোখের সামনে, ঠিক রাস্তার ওপাশটাতে একটা হোটেল। বেশ রমরমা ব্যবসা। মানুষ ঢুকছে আর বের হয়ে যাচ্ছে। বাইরে বিরাট উনুনে তাওয়ায় নানান সাইজের রুটি ছ্যাঁকা হচ্ছে। মাঝে মাঝে ডিম ভাজি। বাতাসে ওগুলোর মিষ্টি গন্ধে বাদশার পেট মুচড়ে উঠছে। কিছুই করা যাবে না এখন। এখনও সময় আসে নি। সময়ের কাজ সময়ে নিয়ম এর বাইরে গেলেই ধরা। ওর পেটে আজ তিন রাত তিন দিন একমুঠো ভাত পড়েনি। রাস্তার ওইসব গু-ছাই খেয়ে আর কতক্ষণ সহ্য করা যায়। কুকুরের খাবার মানুষের পেটে সহ্য হবে কেন? জ্বলন্ত উনুনে তাওয়ার ওপর গরম গরম রুটি দেখে বাদশার চোখে জল এসে গেল। যেভাবেই হোক আজ একটা রুটি খেতেই হবে। হোটেলে গিয়ে মালিকের পা জড়িয়ে ধরলে কি একটা রুটি দেবে না? সবাই কি তার বাবার মতো এত নিষ্ঠুর এই দুনিয়ায়। আর ওই ডাইনি মহিলার মতো, ওর সৎমা? ওর আবার বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল। আজ তিনদিন হলো বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে ও। পালিয়ে এসেছে বলাটা ঠিক হলো না বোধহয়, চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। ওকে তো একরকম বাড়ি থেকে বের করেই দিয়েছে ওরা। ওরা মানে ওর বাবা আর সৎমা। ওকে ওরা একটু সহ্য করতে পারত না। সব সময় লাথি-ঝাঁটা, গালাগালি, দূর-দূর করত ওরা। মা কতদিন মারা গেছে তা হিসাব করে বলতে পারবে না ও। কিন্তু সেই যে মা মরল আর কপাল পুড়ল বাদশার। মার ওপরও ভীষণ রাগ হয় বাদশার। রাগ না অভিমান ও বোঝে না। কেন হুট করে মরে গেল মা? মা বেঁচে থাকলে আজ ওর কি এই অবস্থা হয়? আহারে কি জীবন ছিল ওর।

বাবা-মার একটাই মাত্র সন্তান ও। বাবা শখ করে নাম রেখেছিল বাদশা। ওর বাবা গরিব রিকশা চালক হলে কি হবে, মনে মনে স্বপ্ন দেখত বাদশা বড়ো হলে ওরা আর গরিব থাকবে না। সংসারের শত টানাটানির মধ্যেও ওকে স্কুলে ভর্তি করেছিল বাবা। যে সে স্কুলে না, ওদের এলাকার সেরা স্কুল। মা একটু আপত্তি যে করে নি তা না। এত ভালো স্কুলে পড়ার খরচ-খরচা কি কম? কিন্তু বাবা কারো কথা শুনলে তো, বাবা খেঁকিয়ে উঠে বলেছিল– তুই কি আমার মতন আমার ছাওয়ালরেও রিকশাচালক বানাতে চাস? মা আর কোনো কথা বলে নি। হয়ত মনে মনে খুশিই হয়েছিল। কোনো মা কি সন্তানের ভালো দেখলে খুশি না হয়ে পারে?

স্কুলে ভর্তি হয়েই সেদিন সন্ধ্যার পর বাবা বাদশাকে নিয়ে গেল কালু দর্জির দোকানে। দোকানে ঢুকতেই বাবাকে উদ্দেশ্য করে কালু দর্জি বলল– কি মিয়া, ছাওয়ালের জামা-প্যান্ট বানাইতে হবে? শুনলাম নাকি ছাওয়ালরে স্কুলে ভর্তি করাইছ?

–হ, কালু ভাই কথা সত্য, ছাওয়াল কি সারা জীবন আমার মতন রিকশা টানবে নাকি? বাবার কথায় দৃঢ়তা, বাবার কথা শুনে শুধু কালু দর্জিই না, দোকানের সবাই হো হো করে উঠল। কালু এবার একটু টিপ্পনী কেটে বলল, হক কথা, হক কতা, এই না হলি বাপ।

কালুর কথার ভেতরের সূক্ষ্ম ব্যঙ্গটা বোধহয় বুঝতে অসুবিধা হয় নি বাবার। তার মেজাজ গেল চড়ে। চড়া মেজাজে বলল– কালু ভাই তোমার দোকানে সবচাইতে দামি কি কাপড় আছে দেখাও দেখি। ছাওয়ালের জামা-প্যান্ট বাইতে দিমু।

–হ, হ দেখাইতাছি। রাগলা নাকি আমার ওপর মিয়া? তোমার ছাওয়াল যদি জজ ব্যারিস্টার হয় তাইলে আমাদের ভালো লাগবে না? কি বলো? বলো মিয়া?

–প্যাঁচাল বাদ দাও। কাপড় দেখাও। বাবা আর এ বিষয়ে বেশি কথা বলতে চায় না বোঝা গেল। কালু মিয়ার দোকানের সবথেকে দামি কাপড় দিয়ে বাদশার জামা প্যান্ট বানাবার অর্ডার দেওয়া হলো। বাড়ি ফেরার পথে বাদশার জন্য একটা সুন্দর স্কুল ব্যাগও কিনে দিল বাবা। সেদিন কি যে খুশির দিন ছিল ওর। সারারাত ঘুমাতে পারে নি বাদশা। নতুন কেনা স্কুলব্যাগটা মাথার কাছে নিয়ে শুয়ে শুধু এপাশ-ওপাশ করে আর মাঝে মাঝে গন্ধ শুঁকে দেখে। আহ্! কি সুন্দর গন্ধ। চোখের কাছে এরকম একটা নতুন ঝকঝকা জিনিস নিয়ে কি ঘুমানো যায়?

ঠাস করে একটা মশা মারল বাদশা। সেই একই ভুল আবার। শব্দ করা যাবে না একটুও তবু বার বার ভুল হয়ে যাচ্ছে। বাড়ির কথা ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে গেছিল।

ও। মশার কামড়ে বাস্তবে ফিরে আসল। আবার সেই রুটি আর ডিম ভাজির মিষ্টি গন্ধ আল্লাহ তুমি কি একটা রুটি আমার কাছে কোনোভাবে পাঠিয়ে দিতে পারো না? আমি একটা খেলে কার এমন কি ক্ষতি হবে? বাদশা মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। না, আজ যেভাবেই হোক রুটি একটা খেতেই হবে। রাস্তার ঐসব গু-গোবর আর খাওয়া যাবে না। এখনও সময় হয় নি। লোকজন গমগম করছে হোটেলের ভেতর। সকালে একবারও গিয়েছিল হোটেলে একটা রুটি আর একটু ভাজি চেতে।

“
মশার কামড়ে বাস্তবে ফিরে আসল। আবার সেই রুটি আর ডিম ভাজির মিষ্টি গন্ধ আল্লাহ তুমি কি একটা রুটি আমার কাছে কোনোভাবে পাঠিয়ে দিতে পারো না? আমি একটা খেলে কার এমন কি ক্ষতি হবে? বাদশা মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। না, আজ যেভাবেই হোক রুটি একটা খেতেই হবে। রাস্তার ঐসব গু-গোবর আর খাওয়া যাবে না
”

তখন হোটেল লোকজনে ভরা। সবাই খাচ্ছে। এতগুলো কাস্টমারের ভেতর বোধহয় ওকে বড্ড বেমানান লাগছিল। উদোম শরীর। গরমে একটা জিন্স-ছেঁড়া হোক প্যান্ট। সমস্ত গা-ভর্তি ধুলা ময়লা। তিনদিন গাসল না করে চুলে ময়লার জট ধরে গেছে। মুখে ময়লা জমে। ওকে একেবারে রাস্তার টোকাইদের মতো লাগছে। ওর এই কাকতাড়ুয়ামার্কা চেহারা দেখে হোটেলের ম্যানেজার ভীষণ বিরক্ত হলো। সাথে সাথে ওকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল। একটাও কথা বলার সুযোগ দিল না ওকে। হিড়হিড় করে যেন রাস্তায় নিয়ে দুটো থাপ্পড় মারল মাথায়। তখনই বাদশা বুঝে গিয়েছিল ওর মারাত্মক ভুল হয়েছে। হোটেল রানিং থাকা অবস্থায় ওর উপস্থিত হওয়া বিরাট রকমের ভুল হয়েছে। এভাবে হবে না। সব কিছুর সময় আছে। নিয়ম আছে। নিয়মের বাইরে গেলেই ধরা। তখন থেকেই ওর মাথায় একটা ফন্দি এসেছে। যখন হোটেলে কোনো কাস্টমার থাকবে না ঠিক তখন সুযোগ বুঝে ঢুকে পড়তে হবে। তখন কি ওকে আর একটা রুটি ওরা না দিয়ে পারবে? নিশ্চয় দেবে। প্রতিদিন কত খাবার তো নষ্ট হয়। সকাল থেকে বাদশা হোটেলের ঠিক বিপরীত দিকে রাস্তার এপাশে এসে বসে আছে। এখানটায় একটু ঝোপঝাড় আছে, এইটাই সুবিধা ওর লুকিয়ে থাকার জন্য। কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকে অবিরত মশার কামড় আর কাহাতক সহ্য করা যায়। একদিকে মানুষের নির্দয়তা আরেক দিকে মশার নির্মমতা ওকে অতিষ্ঠ করে তুলছে। এভাবে কি বেঁচে থাকা যায়? কেন মাটা হুট করে মরে গেল। আর মরে যখন গেলই কেন ওদের বাড়ি এনে তুললে। ওর পড়াশোনার মাথাও ভালো ছিল। প্রতি ক্লাসে পাস করে ভালো মার্কস নিয়ে বড়ো ক্লাসে উঠছিল। হঠাৎ করে সব এমন হয়ে গেল কেন? ওর কি দোষ ছিল? এসব কিছু চিন্তা করার মতো শক্তি ওর এখন নেই। বহুবার এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে বাদশা। কিন্তু কোনো উত্তর পায় নি। ভুস করে রাস্তার ওপর দিয়ে একটা গাড়ি চলে গেল। ঝটকা এক বাতাস এসে লাগল ওর গায়। নাহ্ আর সহ্য করা যাচ্ছে না। চোখের সামনে গরম গরম রুটি দেখে দেখে ওর ধৈর্য আর বাদ মানতে চাচ্ছে না। কিন্তু এখন কি করা যায়? অনেক চিন্তা করে একটা বুদ্ধি বের করল বাদশা। চোখ বন্ধ করে রাখলেই তো হয়। সব থেকে সহজ বুদ্ধি। তাহলে আর দেখতে হবে না। ও জোরে দুচোখের পাতা চেপে ধরল। আর ঠিক তখনই আবার বাড়ির কথার ভেসে উঠল মনের পর্দায়। তিনদিনের জ্বর আর ডায়রিয়ায় মা টুপ করে মরে গেল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ও দেখে মার কবর দেওয়া শেষ। চারদিকে দুচারজন পাড়া প্রতিবেশী আকুলি-বিকুলি করে বিলাপ করছে। কিন্তু ওর একটুও কান্না পায় নি। বাবাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কোথায় গেল কে জানে? মায়ের কবর দেওয়া শেষ হলেও এক-পা, দু-পা করে ঘরে এসে চুপচাপ বসে থাকল। বাইরে থেকে কোনো এক মহিলা কণ্ঠ বারবার বিলাপ করে বলছে, ও আল্লাগো। ওই মাসুম বাচ্চাডার এখন কি হবে? কি যার জন্য এই বিলাপ তার ভেতর কোনো ভাবার নেই। নিশ্চুপ, নির্বিকার। মায়ের মৃত্যুটা বাদশা এত সহজে মেনে নিল যে পাড়া-পড়শি দারুণ অবাক না হয়ে পারল না। কেউ কেউ বলতে শুরু করল। বাপরে কি নিষ্ঠুর ছাওয়াল রে আল্লা। মার জন্যি একফোঁটাও কাঁনল না। এইরকম ছাওয়ালের মুখে ঝাঁটা। যে যাই বলুক বাদশা নির্বিকার। ওর দিন আগের মতোই চলছে। স্কুলে যাচ্ছে। বাড়ি বসে পড়ছে। বন্ধুদের সাথে খেলা করছে। শুধু একটু সমস্যা শুরু হলো খাওয়াদাওয়া নিয়ে। তারও সমাধান হলো। বাদশার এক ফুফু এসে ওদের সাথে থাকা শুরু করল। সেই এখন পরিবারে মায়ের সব

কাজ করে। কিন্তু তারও তো সংসার আছে। মা মরার একমাসের ভেতর বাবা আবার বিয়ে করে নতুন বউ নিয়ে বাড়ি এসে উঠল।
—বাদশা আজ থেইকে এই তোর নতুন মা। মা যখন যা বলে সব কথা শুনে চলবি। বাদশা নীরবে একবার নতুন মার মুখের দিকে দেখে নিয়ে ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল, সেই শুরু হলো, কোনো কারণ ছাড়াই বাদশার ওপর শুরু হলো নানারকম অত্যাচার, প্রথম ধাক্কা আসল স্কুল যাওয়া বন্ধ করে দিলে। ওই একটা ব্যাপারে বাদশা ভীষণ কষ্ট পায় এখনও। পড়াশোনাটা কেন জানি তার প্রথম থেকে ভালোই লাগে। ওটা যখন ছেড়ে দিতে হলো নতুন মায়ের নির্দেশে তখন থেকেই শুরু হলো কথা কাটাকাটি আর ঝগড়া। বাবাও হয়ত ব্যাপারটা মেনে নিতে পারে নি প্রথমে। সে একটু প্রতিবাদ করতে যেতেই নতুন মায়ের মুখ ঝামটি— আপনের বয়স হচ্ছে না? একা একা আর কতদিন সংসার চালাবেন। ছাওয়াল বড়ো হইছে আজ থেইকে একবেলা আপনে একবেলা ছাওয়াল রিকশা টানবে। এই আমার শেষ কথা। রিকশা আলার ধাড়ি ছাওয়ালেই আবার লেখাপড়া কি। যা করছে অনেক করছে, না, আর দরকার নাই। বাদশা আর কিছু না বুঝুক এটা বুঝেছিল এখন থেকে জীবনটা আগের মতো থাকবে না। এত শখের লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হবে। বাপের মতো পশুর জীবন-যাপন করতে হবে। এই ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না বাদশা। এরপরও ও বই-খাতা নিয়ে স্কুলে গিয়েছিল। কিন্তু স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতেই তুলকালাম কা-। বাবা বাড়ি ছিল না। নতুন মা চিৎকার করে বলল, ও বাবা, কি বিদ্যান ছাওয়াল রে আল্লা। ভালো মুখে বললাম কানে ধরল না। আচ্ছা মতন প্যাদানি দিলেই সব ঠিক হইয়ে যাবে। নতুন মার দুই চোখ জ্বলছিল, যেন চোখ দিয়ে বাদশাকে ভস্য করে দেবে। বই খাতাগুলো টেবিলের ওপর রেখে বাদশা পুকুরে গোসলে গেছিল। বাড়ি ফিরে যা দেখল সেটা ভাষায় বর্ণনা করার মতো না। ওর সব বই-খাতা জ্বলন্ত উনুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। বাদশার যে হঠাৎ কি হলো ও হুংকার দিয়ে বলল, এই মাগি এটা তুই কি করলি? বল কি করলি? তুই বিদ্যা পোড়ালি। তুই দোজখে যাবি কুত্তি। আমি তোরে খুন করব। এই পর্যন্ত বলে বাদশা অন্ধ আক্রোশে ফুঁসতে থাকে। ওর তখন হিতাহিত জ্ঞান নেই। চুলার পাশ থেকে একটা শুকনা বাঁশের চটা তুলে দিল কয়-ঘা বসিয়ে। আর যাবে কোথায়। প্রথমে তুমুল গালিগালাজ, বাপ-মা তুলে গালি। তারপর শুরু হলো চিৎকার করে মরাকান্না,— ও আল্লারে আমারে খুন কইরে ফ্যালবে এই ইবলিশ। ও আল্লা তুমি আমারে এ কোথায় নিয়ে আসলে খোদা। চিৎকার চেঁচামেচি একটু একটু করে উচ্চস্বরে উঠছে। একটু পরই বাড়ির সামনে আশেপাশের মানুষ জমতে শুরু করল। বাদশা তখন নিজের ঘরে যেয়ে দরজা এঁটে বসে আছে। বাইরে মানুষের তুমুল হট্টগোল। নানা মানুষের নানান প্রশ্ন। বিশেষ করে মহিলাদের গলা শোনা যাচ্ছে বেশি। নতুন মা মানুষ দেখে যেন মনে জোর পেয়ে গেল। যা ঘটেছে তার সাথে নানান রং চং মাখিয়ে বাদশার বিষেদগার করতে লাগল।
—আমি এই সংসারে থাকব না খালা। এই ইবলিশ আমারে খুন করে ফ্যালবে। হয় ও শয়তানের বাচ্চা থাকবে নয় আমি থাকব। এই তোমাদের বলে রাখলাম। নতুন মার একপেশে কথা শুনে বেশিরভাগ মহিলা বাদশার বিরুদ্ধে চলে গেল। একজন মহিলার গলা শোনা গেল— আহারে। এতভালো ছাওয়ালডা অমানুষ হইয়ে গেল। কার মনে যে কি আছে আল্লা ছাড়া কেউ জানে না। তুমি কাইন্দো না বইন। ওর বাবা আসুক। তারে সব বলো।

বাদশা ঘরে বসে সব শুনতে পাচ্ছে। তার ভেতর কোনো ভাবান্তর নেই। পুড়ে যাওয়া বই খাতাগুলোর কথা চিন্তা করে ওর চোখে পানি এসে গেল। সারাদুপুর বন্ধ ঘরে ভোম হয়ে থাকল ও। বাইরে নতুন মার গলা শোনা গেল। আইজ আসুক তোর বাপ। থাকব না আমি এই সংসারে। এই সংসারে ভাত মুখে দেব না আমি আজ এর বিহিত না করে আমি কিছু মুখে দেব না।
বাদশা বুঝতে পারছিল জীবনটা আর আগের মতো থাকবে না। থাকতে পারে না আজকের পর থেকে। বাপ কি ও কথা শুনবে? নাহ্, এই বাড়িতে আর থাকা হবে না ওর। এখন শুধু বাপের জন্য অপেক্ষা। ওর ভেতরের রাগটা এখনও পড়ে নি। ভেতরে ভেতরে গুমরে মরছে। তারপর যা হওয়ার কথা তাই হলো। বাপ বাড়ি এসে ঢোকার সাথে সাথে সাথে নতুন মার দ্বিগুণ জোরে মরাকান্না জুড়ে দিল। বাবা সব কিছু শুনল। সারা দুপুর ধরে ওই রাক্ষসী যেসব কথা মনে মনে সাজিয়ে রেখেছিল বাবার কাছে সব উগরে দিল। সারাদিন কাটফাটা রোদে রিকশা টেনে এমনিতেই বাবার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে থাকে। বাবা সোজা ওর বন্ধ দরজার সামনে এসে বলল, দরজা খোল হারামজাদা। খুব বাড় বাড়ছস, দরজা খোল। বাদশা নীরবে দরজা খুলে বাপের সামনে এসে দাঁড়াল। বাপের তখন অগ্নিমূর্তি। ভীষণ কড়া কড়ায় বলল– করছিস কি তুই শয়তানের বাচ্চা? তোর মার পায়ে ধরে মাফ চাইয়ে নে। আর কাইল থেকে স্কুলে যাওয়া বন্ধ। আমার সাথে যাবি, রিকশা টানবি। কিন্তু বাদশা আগের মতোই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।
–কি হলো। যা মাফ চা। বাদশা বেশ কিছুক্ষণ পর মুখ শক্ত করে শুধু একটা শব্দ উচ্চারণ করল– না। ব্যস। বাপ আর ধৈর্য ধরতে পারল না।
–কি তোর এত সাহস হইছে হারামজাদা। আমার কথার ওপর কথা। তুই দূর হ আমার সামনে থাইকে। দূর হ। তোর মতন ছাওয়ালের আমার দরকার নাই। দূর হ তুই। বাদশা হতভম্ব হয়ে গেল। এই বাবাকে সে চেনে না। সে এতদিন ছিল তার জানের টুকরা। ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর ওকে আরও অবাক করে দিয়ে বাবা দুই হাতে ধুমধাম মারতে শুরু করে দিল। ঘর থেকে মারতে মারতে বাইরে নিয়ে এল, সে কি মার! বাদশার ব্যথা লাগছিল না। সে শুধু অবাক হয়ে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এটা কি সত্যিই তার বাবা?
–দূর হ তুই। আমার বাড়ির ত্রিসীমানায় যেন না দেখি তোরে। দূর হ। বাবা গজগজ করতে করতে ঘরে চলে গেল। ও কয়েকবার চেষ্টা করেছিল বাবাকে আসল ঘটনা কি হয়েছিল বলবে। কিন্তু বিন্দুমাত্র সময় পাওয়া গেল না। এখন মার আর কিছু সম্ভব না। যা হয়ে গেছে আর কিছু করার নাই। এখন নিজের পথ নিজে বেছে নিতে হবে। বাদশা আরও ঘণ্টা দুয়েক একটানা দাঁড়িয়ে ছিল বাড়ির সামনে চুপচাপ। মনে একটা ক্ষীণ আশা যদি বাবার রাগ পড়ে যাবার পর আবার ওকে ঘরে ডেকে নেয়। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামল। অন্ধকার গাঢ় হলো। কিন্তু কোথায় কি, বাবার কোনো সাড়াশব্দ নেই। এখন বাবা মোড়ে চায়ের দোকানে যাবে টিভি দেখতে। যদি ওই সময় তার কাছে সত্যি ঘটনা বলা যায়। মনে এখনও একটু আশা উঁকি মারে। কিন্তু বাবা বাইরে বেরিয়েই ওকে দেখে হুংকার দিল– ওই হারামির পুত, তুই এখনও দাঁড়ায়া আছিস? মার কি কম হইয়ে গেল, হ্যাঁ? দূর হ বললাম। আমার চোখের সামনে দাঁড়ায়ে থাকবি না, এক্ষন দূর হ- তুই হারামজাদা। ব্যস যা বোঝার বুঝে গেল বাদশা। কপাল টলেছে। আর কোনো আশা নেই। কিন্তু এই রাতে কোথায় যাবে ও? চোখের সামনে এখন

সত্যিকারের অন্ধকার দেখল বাদশা।
সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ার কান্না আর কান্না। টিউবকলের পানি খেয়ে পেট ভরা। দোকানের বেঞ্চে রাতে ঘুমানো এই ভাবেই চলছে তিনদিন ধরে। ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে সিটি কর্পোরেশনের ময়লার স্তূপ থেকে হাতড়ে হাতড়ে আধ পচা খাবার খেয়ে এখনও ধুক ধুক করে বেঁচে আছে ও। সহ্য করতে না পেরে আজ সকালে হোটেলে গিয়েছিল একটা রুটি চাইতে। মনে বড়ো আশা ছিল। কিন্তু কি হলো? রুটি তো দিলই না, দিল চড়থাপ্পড় আর গলা ধাক্কা, ঘেয়ো কুত্তার মতো তখনই ও বুঝে গেল এভাবে হবে না। অন্যভাবে কাজ সারতে হবে। দরকার হলে চুরি করতে হবে। আগে তো জীবন বাঁচান, তারপর যা আছে কপালে। এভাবে যদি না খেয়ে মরণও হয়ে যায় তবু বাড়ি ফিরবে না ও। রাত কত হলো জানে না ও, তবে কম হয় নি বোধহয়। হোটেলের কাস্টমার কমে গেছে। এবার প্রস্তুত হতে হবে। শুধু একটা সুযোগের অপেক্ষা। দ্রুত কাজ করতে হবে। তাওয়ার ওপর যে দু-চারটা বাসি ঠান্ডা রুটি আছে চট করে নিয়েই ভোঁ-দৌড় দিতে হবে। একবার রাস্তা পার হয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেই আর চিন্তা নাই। বাদশা উঠে দাঁড়ায়। আহা কতদিন পর আজ যদি একটু খাবার জোটে কপালে। হোটেলের বাইরে এখনও পুরোপুরি ফাঁকা হয় নি। দু-একজনের আনাগোনা। এখনই কি যাওয়া ঠিক হবে। ঠিক তখনই ওর সামনে দিয়ে ভুশ করে একটা গাড়ি চলে গেল। নাহ্ আর সহ্য করা যাচ্ছে না। যাই আছে কপালে। সামনে যেতে হবে। কি আর হবে। দুটা রুটির জন্যে কি ওকে মারধর করবে? না না, মানুষ এত নিষ্ঠুর হয়ত না।
বাদশা বুক ভরে বাতাস নিল। পায়ে পায়ে হোটেলের দিকে এগিয়ে গেল। সোজা রুটির তাওয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সকালের সেই কালো চেহারার কর্মচারী ওকে দেখেই হাক ছাড়ল– ওই ছ্যাড়া তুই আবার আসছস? তোর ঘটনা কি? কি চাস? ভাগ-ভাগ।
বাদশা তবুও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। ওর লোভাতুর চোখ দুটি তখন রুটির দিকে। দুর্বল শরীরে আর একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকবারও যেন শক্তি নেই। ও কোনোরকমে মিহিন গলায় বলল,– একটা রুটি খাব।
ওর কথা শুনে লোকটা আবার খেঁকিয়ে উঠল এইডা কি তোর বাপের হোটেল? যা ভাগ। পয়সা ছাড়া রুটি হবে না। তবুও দাঁড়িয়ে থাকে বাদশা। যদি লোকটার একটু মন গলে। –ভাইজান, আমি তিনদিন কিছু খাই না।
–খাস না তো আমি কি করুম। আমি কি তোর বাপ? যা বললাম, ঝামেলা করিস না। হঠাৎ বাদশার মনে হলো এভাবে হবে না। মানুষ মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র মায়া দেখাতে ভুলে গেছে। ওর যে কি হলো হঠাৎ এক থাবায় তাওয়ার ওপর থেকে দুটা রুটির নিয়েই পেছন ফিরে দৌড়াতে শুরু করল। কিন্তু ক্লান্ত শরীরে আর কত জোরে দৌড়ানো যায়। ওর পেছন দুজন লোক চোর চোর বলে ছুটে আসছে। সর্বশক্তি দিয়ে বাদশা দৌড়াচ্ছে। কোনোরকমে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে পারলেই হয়। কিন্তু শরীরে এই ধকল সহ্য হলো না। ও হুমড়ি খেয়ে রাস্তার ওপর পড়ে গেল। হাতে রাখা রুটি রাস্তার ধূলায় মাখামাখি। পেছনের লোক দুটো এসে ধরে ফেলল ওকে। তারপর যা হয় তাই হলো। বেদম মার। চড়, ঘুষি, কিল, লাথি। এত মারের ভেতরও ও হাত থেকে রুটি দুটো ছাড়ল না। ওরা হাত ধরে টানতে টানতে হোটেলে নিয়ে গেল।
ম্যানেজারের সামনেও অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত শরীরে রক্তের

দাগ । ভীষণ মার মেরেছে ওরা । ওর চোখের সামনে তখন সমস্ত পৃথিবী ঘুরছে । এখনই বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে যাবে এবং সত্যি সত্যিই একটুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল বাদশা ।

তারপর কি হয়েছিল জানে না ও । জ্ঞান ফিরলে দেখল ও পুলিশের অফিসে শুয়ে আছে । তার মানে হোটেল মালিক ওকে পুলিশে দিয়েছে । গম্ভীর চেহারার একজন পুলিশ ওকে প্রশ্ন করল– নাম কি তোর?

–বাদশা মিয়া ।

–চুরি করিস কতদিন ধরে?

–স্যার বিশ্বাস করেন আমি চুরি করি না । শুধু একটা রুটির জন্যি এই কাজ করছি ।

–বাবা কি করে?

–বাবা নাই । বাদশার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল ।

–মা? মাও নাই?

এরপর আর বেশি কথা হয় নি । একজন পুলিশ এসে ওকে নিয়ে একটা চারকোনা ঘরের মধ্যে রেখে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিল । বাদশা বুঝল তাহলে এটাকেই হাজত বলে । ও চুপচাপ ঘরের এককোণে গিয়ে বসে পড়ল । মাথার ভেতর ফাঁকা ফাঁকা লাগছে । এখন আর ক্ষুধার বোধটা তীব্রভাবে বোঝা যাচ্ছে না । বাদশা কিন্তু হাজতে এসে মনে মনে খুশি হয়েছে । আর যাই হোক এখন থেকে তো প্রতিদিন দু-মুঠো ভাত খাওয়া যাবে । আর বাইরের ওইসব গু-ছাই খেতে হবে না । ও মনে মনে হোটেল মালিকের ওপর খুশি হলো । তিন বেলা দুমুঠো ভাত পেলে আর কি চাই? তিনদিন তিনরাত পর বাদশা শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল । আহ্ কি আরাম । এই জীবনও কত শান্তি আগের জীবন থেকে!
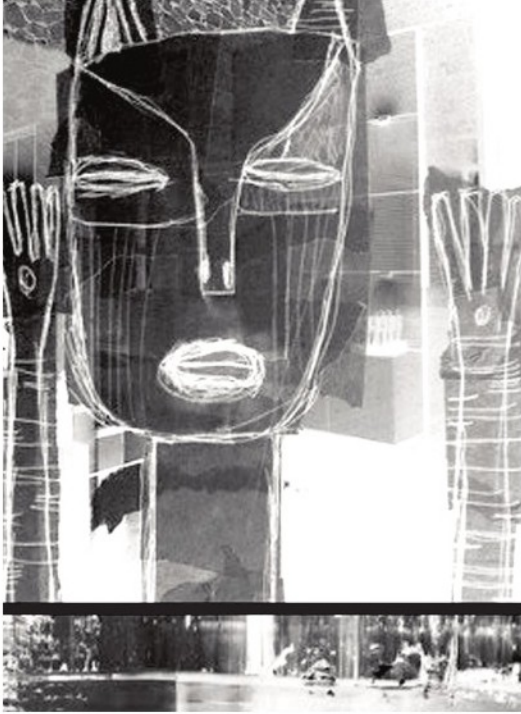
আওয়াজ

বাশার খান

দোকানে টিউবলাইট দুটো জ্বলছে তখনো। পূর্বাকাশে সূর্য উঁকি মেরেছে ঠিকই কিন্তু কাঁটাবন মার্কেটের সাউন্ড সিস্টেমের এ দোকানটি পশ্চিমমুখী হওয়ায় সূর্য কিরণ এখনও এসে পৌছায় নি। সামনের রাস্তা দিয়ে দুএকটি রিকশা আসা যাওয়া করছে। ভোরের ফাঁকা রাস্তা। কিছুক্ষণ পরপর দু একটি গাড়িও বেপরোয়া গতিতে সাঁই সাঁই করে ছুটে চলে। মাঝেমধ্যে পায়ে কেড্‌স আর ট্রাউজার

দোকানের কর্মচারীকে শাসায় হাশেম। সদ্য ঘুম থেকে জাগা কর্মচারীটি হাশেমের দিকে তাকায়। হাশেমের চোখ দুটো লাল। রাতে ঘুমায়নি- সেটি স্পষ্ট। হাশেমের মেজাজ যে খিটখিটে হয়ে আছে একবার তাকিয়েই কর্মচারী সেটি বুঝতে পারে

পরা মোটা-তাজা কাউকে দ্রুত হাঁটতে দেখা যায়। কাউকে আবার দৌড়াতেও দেখা যায়। উদ্দেশ্য- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মল চত্বর অথবা সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। কাঁটাবনের এ শান্ত মুহূর্তটি বেশিক্ষণ স্থায়ী নয়। একসময় অশান্ত হয়ে উঠবে। নয়টা বাজার আগেই ব্যস্ত হয়ে পড়বে। রিকশার টুংটাং শব্দ আর গাড়ির হর্নে রাস্তাটিও ফিরে যাবে তার আসল রূপে।

হাশেম গায়ের চাদরটা খুলে রাখে। সোয়েটারের হাতা গুটিয়ে নেয়। মাথার কান টুপিটা একটু ওপরে উঠিয়ে কান দুটিকে ঢাকনামুক্ত করে। তারপর দোকানের সামনে রাখা ভ্যানগাড়িতে দুটি ওয়ান পিয়ারের স্পিকার ওঠায়। এরমধ্যে দুটি ব্যাটারিও ওঠানো হয়েছে। হাশেম ব্যাটারি দুইটার দিকে তাকায়। একটি ব্যাটারির মান ভালো নয় তা হাশেমের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা জানান দেয়।

–এই, এইডা বদলাইয়া দে। ইনবার্সিটির কামে বালা জিনিস দেওন লাগে। এইডা কি তগো পরতেক দিন কওন লাগব। দোকানে এতদিন কাম করছ এইডা বুঝস না। না বুঝলে কাম ছাইড়া দে।

দোকানের কর্মচারীকে শাসায় হাশেম। সদ্য ঘুম থেকে জাগা কর্মচারীটি হাশেমের দিকে তাকায়। হাশেমের চোখ দুটো লাল। রাতে ঘুমায়নি- সেটি স্পষ্ট। হাশেমের মেজাজ যে খিটখিটে হয়ে আছে একবার তাকিয়েই কর্মচারী সেটি বুঝতে পারে। কোনো জবাব না দিয়ে পুরান ব্যাটারিটা নামিয়ে নতুন একটি ব্যাটারি ভ্যানগাড়িতে উঠিয়ে দেয়।

ভ্যানগাড়ি টিএসসিতে যাবে। সেখান থেকে সাউন্ড সিস্টেম উঠবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পিকনিকের গাড়িতে। গাড়িতে মাইক অপারেটর হিসেবে থাকবে হাশেম। পিকনিকে ভার্সিটির ছেলে-মেয়েরা কত রকম হই-হুল্লোড় করে। এজন্য তাদের সাথে ভালো মানের সাউন্ড সিস্টেম দিতে হয়। নইলে পথে ডিস্টার্ব করে। এতে খেপে যায় ছেলে-মেয়েরা। হাশেমের কাছেও খারাপ লাগে তখন।

–আহারে, পোলা-মাইয়াগুলা কি নাচানাচি করতাছিল। শালার ব্যাটারি বইয়া পড়ছে। মন চায় ব্যাটারিডা গাড়ি থেইকা ফালাইয়া দেই।

হাশেমের এ অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের। জীবনের বাইশটি বছর পার করেছে কাঁটাবনের সাউন্ড সিস্টেমের দোকানে মাইক অপারেটর হিসেবে কাজ করে। পিকনিকের গাড়িতে শিক্ষার্থীদের সাথে ঘুরে বেড়ায় সারাদেশ। সাউন্ড বাজিয়ে ছেলে-মেয়েদের মাতিয়ে রাখে। কখনো আবার মাঝপথে ব্যাটারি বসে যায়। আবার কখনো মেশিনে সমস্যা দেখা দেয়। শিক্ষার্থীরা যায় খেপে। একদিন হয়েছে কী, পিকনিকের চলন্ত গাড়িতে গানের তালে তালে ছেলে-মেয়েরা খুব নাচানাচি করছে। মনে হচ্ছে এটা কোনো ডান্স ক্লাব। শিক্ষকরাও তালি দিয়ে

উৎসাহ জোগাচ্ছে। গাড়ির গতি কমালে বা ব্রেক করলে দু একজন ছেলে একে অপরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। তুমুল হইচই করে এটাও সবাই উপভোগ করছে। মহাসড়কের দুধারের উৎসুক লোকের নজর গাড়ির দিকে। হাততালি আর নাচে গানে চলছে গাড়ি। হঠাৎ স্পিকার বন্ধ হয়ে গেল। শত চেষ্টা করেও হাশেম মেশিনটা আর ঠিক করতে পারল না। গাড়িতে হট্টগোল শুরু হলো। এক ছাত্র রেগে স্পিকার লাথি মেরে ফেলে দিল। আরেক ছাত্র হাশেমের দিকে তেড়ে আসল। গাড়িতে দুজন শিক্ষক থাকায় সে যাত্রায় রক্ষা হয় হাশেমের।

এখন আর এ ধরনের সমস্যা হয় না বললেই চলে। ভালো মানের মেশিন, ব্যাটারি ও স্পিকার নিয়েই হাশেম গাড়িতে ওঠে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা কাজে লাগায়। স্পিকারে গান বাজতেই থাকে। শিক্ষার্থীদের আনন্দমুখর আওয়াজে পিকনিকের গাড়িও যেন নেচে নেচে ছুটে চলে।

বয়স পঞ্চাশ পার হলেও হাশেম এখনও চনমনে স্বভাবের। পিকনিকে ছেলে-মেয়েদের গান আর নাচান-াচি ভালোই উপভোগ করে সে। নিজে না নাচলেও মাঝেমধ্যে শিক্ষার্থীদের গান গেয়ে শোনায়।

–আমার হাড় কালা করলাম রে/ ওরে আমার দেহ কালার কালার লাইগা রে/ অন্তর কালা করলাম রে, দুরন্ত পরবাসে।

গলায় গানের আওয়াজ তুলে মনের অজান্তে চোখ বুজে হাশেম। গানের মোহের গভীরে প্রবেশ করে। জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি খুঁজে। চোখের কোণে জমা হয় অশ্রুবিন্দু। শিক্ষার্থীদের হাততালি আর 'ওয়ান মোর ওয়ান মোর' ধ্বনিতে চেতনা ফিরে পায়। পুষে রাখা মেঘের ভার গলে। গায়ের কাপড়ের একাংশ টেনে তুলে চোখ মুছে। দু ফোঁটা অশ্রু বেরিয়ে বুকটা হালকা হয়। মানুষের চেপে রাখা কষ্টটা এমন– কারো সাথে শেয়ার করে অথবা কেঁদে মেঘের ভারটুকু ঝরায়। মনে বাতাস ঢুকে। খানিকটা স্বস্তি পায়। হাশেমের এ বিষয়টাকে কান্না বলা যায় না। দু ফোঁটা অশ্রুকে কি কেউ কান্না বলে। আবেগের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ হয়ত। আবেগটা ইদানীং হাশেমের নিয়ন্ত্রণ মানে না। গলে চোখের কোনে জমা হয়। তবে কোনো শব্দ হয় না। কেউ কিছু বুঝতেও পারে না। নারীরা এটা ভালো পারে। কান্নার আওয়াজ তুলে জমাট দুঃখ হালকা করে। লোকজন জড়ো হয়। প্রতিবেশী এসে সান্ত্বনা দেয়। পুরুষের কষ্টের বহিঃপ্রকাশ ঐ অতটুকুই। চোখের কোনে দু ফোঁটা অশ্রু

“ গলায় গানের আওয়াজ তুলে মনের অজান্তে চোখ বুজে হাশেম। গানের মোহের গভীরে প্রবেশ করে। জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি খুঁজে। চোখের কোণে জমা হয় অশ্রুবিন্দু। শিক্ষার্থীদের হাততালি আর 'ওয়ান মোর ওয়ান মোর' ধ্বনিতে চেতনা ফিরে পায়। পুষে রাখা মেঘের ভার গলে ”

তারপর বড়ো নিশ্বাস ফেলা। যা কেউ দেখে না। ভেতরে ভেতরে রক্তক্ষরণ চলে ঠিকই।
গানটা গেয়ে শেষ করে হাশেম। শিক্ষার্থীদের তুমুল করতালি। ওয়ান মোর ওয়ান মোর বলে আরেকটা গান আশা করে। কিন্তু হাশেম গলায় আরেকটি গান তুলতে পারে না। আবেগটা যেন একটু বেশিই পেয়ে বসে তাকে।
−না কাকা, এহন আর পারুম না। পরে আবার শোনামু। এইবার আপনারা ধরেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে হাশেমের অন্যরকম কদর। কাঁটাবনে সাউন্ড সিস্টেম বুকিং দেয়ার সময় শর্ত জুড়ে দেয়
−সাউন্ড অপারেটর হিসেবে হাশেম কাকারে দেয়া লাগবে কিন্তু।
শিক্ষার্থীরা হাশেমকে 'হাশেম কাকা' বলে ডাকে। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের দ্বারা 'হাশেম কাকা' ডাক পঞ্চাশোর্ধ্ব হাশেমও ভালোই উপভোগ করে। বয়সের তুলনায় একটু বেশি বয়সীই লাগে তাকে। একদিকে শরীরের প্রতি অযত্ন-অবহেলা, অনিয়মিত খাবার-দাবার, অপরদিকে সারা বছর ছুটে বেড়ানোর ক্লান্তি। পুরো বছরটাই ঘুরে বেড়ায়। বিশেষ করে শীতকালে। শীত মৌসুমে একটু বেশিই ধকল যায়। এসময় পিকনিকের চাপ বেশি থাকে। তবুও প্রাণবন্ত হাশেম। ভ্রমণের ক্লান্তি তাকে স্পর্শ করে না। দিব্যি ঘুরে বেড়ায় সারা দেশ। নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ, মুন্সিগঞ্জের পদ্মা রিসোর্ট, কুমিল্লার ময়নামতি, বার্ড, কোটবাড়ি, বৌদ্ধ বিহার, সিলেটের লাউয়াছড়া, জাফলং, মাধবকু-ের ঠান্ডা পানির ঝরনা ও সীতাকু-ের ইকোপার্ক ঝরনা। এদিকে গাজীপুরে লেখক হুমায়ুন আহমেদের নুহাশ পল্লি, আনসার একাডেমী, টাঙ্গাইলের মধুপুর, বগুড়ার মহাস্থানগড়সহ কত জায়গায় না ঘোরে হাশেম। তবুও ক্লান্তি নেই তার। স্পিকারের আওয়াজ আর শিক্ষার্থীদের হইচইয়ে পুরো বছরটাই আনন্দমুখর। কখনো কখনো গানের সুরে নিজের গলার আওয়াজও বেজে উঠে। শব্দ আর শব্দ। আওয়াজের সাথে বাইশ বছর বসবাস। কখনো বিরক্তি লাগে না। জনসভা, কনসার্টসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও সাউন্ড বাজায়। আওয়াজ আর আওয়াজ− হাশেমের জীবনতরীর একটি বিরাট অংশ। ক্লান্তিহীনভাবে বাজিয়ে চলে। যেদিন কাজ থাকে না দিনটি কেমন যেন নিরামিষ লাগে। সময় পার হতে চায় না। কামরাঙ্গীর চরের একচালা টিনশেড ভাড়া বাসায় অস্থির লাগে। হাত-পা ব্যথা করে। কিছুক্ষণ পর পর উঠে দাঁড়ায়। এদিক ওদিক করে। পা বাড়ায় কঁ-াটাবনের দিকে। স্ত্রী জোবেদা চেঁচিয়ে উঠে।
−কই যান ? আইজ ত কাম নাই। চা বানাইতাছি, খাইয়া ঘুমান!
চায়ে চুমুক দিয়ে আবার পা বাড়ায় হাশেম। জোবেদা চেঁচায়−
−মানুষটা এমন ক্যা? বাসায় থাকলে কি আফনারে কোনো কিছু কামড়ায় নি? কাম না থাকলেও কাঁটাবনে যাওন লাগব। এইডা কেমন মানুষের লগে জীবন কাডাইলাম এহনো বুজার পারি নাই। যান যান তাড়াতাড়ি যান। মাইক আফনারে হাশেম হাশেম কইয়া ডাকতাছে।
রাগের বুলি আওড়ায় জোবেদা। কোনো প্রত্যুত্তর করে না হাশেম। পায়ের গতি বাড়িয়ে দেয়। হাঁটতে থাকে কাঁটাবনের দিকে।
দুই ছেলে আর স্ত্রী জোবেদাকে নিয়ে সংসার। উত্তাল নদীতে হাশেমের সংসার তরী আজ অস্থির। ডুবু ডুবু ভাব। বাতাসে টলমল করে। নদীতে ভাসমান বাতাসে দোলা তরীর ছন্দ আছে কিন্তু হাশেমের সংসার তরীর কোনো ছন্দ নেই।

জীবনভর খাটুনির পরও হাশেমের সুখ যেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। ছেলে দুটো ছোটোবেলায় ভালোই ছিল। বড়ো হয়ে হয়েছে কাল। বেড়েছে জ্বালা। লোকে কত স্বপ্ন নিয়ে সন্তান বড়ো করে। বৃদ্ধ বয়সে নাতি-নাতনি নিয়ে হাসবে খেলবে। সংসারের দায়িত্ব থাকবে ছেলেদের ওপর। আটদশজনের মতো এমন আশাই তো ছিল হাশেমের। কিন্তু সুখ যেন কোথায় উড়ে গেল। বড়ো ছেলে বউ নিয়ে আলাদা থাকে। আলাদা খায়। ছোটোটা গার্মেন্টে চাকরি করত। গত তিন দিন আগে গার্মেন্টের কোনো মেয়েকে নিয়ে উধাও হয়ে গেছে। শেষ ভরসাটাও শুরুতেই ভেঙে গেল। সুখ গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে।

মনটা আজ বেশ ভারি। চেহারাটা গম্ভীর। কারো সঙ্গে যেচে কথা বলছে না হাশেম। চোখে নির্ঘুম রাতের ছায়া স্পষ্ট। লাল হয়ে আছে চোখ। কালোমেঘ ঘুরপাক খাচ্ছে মনে। কি এক ভাবনায় ডুবে আছে সে। ভাবনাটা সুখের না দুঃখের, হাশেমের চেহারাই তা বলে দিচ্ছে।

আশপাশ গরম হয়ে ওঠেনি তখনো। শিক্ষার্থী সবাই এখনও আসে নি। দুএকজন করে আসছে। কেউ গাড়িতে বসেছে। কেউ মোবাইলে অন্য বন্ধুকে তাড়াতাড়ি আসার তাগিদ দিচ্ছে। কয়েকজন নিচে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। রংবেরংয়ের পোশাকে কাকে কেমন মানিয়েছে তা পরখ করে নিচ্ছে। গাড়ির সামনে শিক্ষা সফরের ব্যানার টানাচ্ছে কেউ। হাশেম বসে আছে গাড়ির ইঞ্জিনের ঢাকনার ওপর। কে আসল কে সিটে বসল সেদিকে খেয়াল নেই তার। চিন্তার অন্ধকার রাজ্যে বিচরণ করছে সে। মাঝেমধ্যে বড়ো নিশ্বাস ফেলছে। গাড়ির ইঞ্জিনের ঢাকনার ওপরটি বা তার আশপাশকেই নিজের নির্ধারিত আসন মনে করে হাশেম। সিটগুলো ফাঁকা থাকলেও এ জায়গাটিই বেছে নেয়। শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা সিটগুলোতে বসে। হাশেমও মাঝেমধ্যে সিটে বসে তবে সে সুযোগ খুবই কম। কোনো পিকনিকে সিটের তুলনায় শিক্ষার্থী কম হলে ফাঁকা আসনে বসে সে। আজকের মতো ব্যতিক্রমও হয় কখনো, পরিচিত কোনো এক ছাত্র নিজ আসন ছেড়ে হাশেমকে ডাকে।

–কাকা, ইঞ্জিনের ওপরটা তো গরম হয়ে গেছে। আপনে এখানে বসেন।

–না কাকা, আপনে বহেন। অসুবিধা নাই। অভ্যাস হইয়া গেছে।

হাশেমের নিষেধ উপেক্ষা করে সেই ছাত্রটি যখন তার নিজ আসন ছেড়ে সেই আসনে হাশেমকে জোর করে বসায় হাশেমের কাছে মনে হয় আজ সে কত সুখী। প্রাণটা ভরে যায়। ভার্সিটির শিক্ষিত পোলা-পান কত ইজ্জত করে তাকে। সুখ নিজের দখলে আজ। বড়ো নিশ্বাস ফেলে। মনে মনে ভাবে

–আহা! এমন ইজ্জত যদি নিজের ছেলে করত। সুখের কি আর সীমা ছিল?

অনাকাঙ্ক্ষিত সম্মান পেয়ে ছেলেকে মনে পড়ে। ভার্সিটির ছাত্র নিজ আসন ছেড়ে তাকে বসিয়েছে। এ সম্মানটুকু বেদনাকেই মনে করিয়ে দেয়। নিজ সন্তানের পিতৃবিমুখতার ছবি ভেসে উঠে। তাই এই অনাকাঙ্ক্ষিত সুখে অস্বস্তি ঠেকে হাশেমের। কিছুক্ষণ পর ওঠে দাঁড়ায়।

–কাকা, আফনে বসেন!

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে যথারীতি ফিরে যায় ইঞ্জিনের ঢাকনার ওপর। ভাবতে থাকে। সেদিন কী ইজ্জত না করল বড়ো ছেলে। জোবেদার চিকিৎসার জন্য টাকা চেয়েছিল। জোবেদার তলপেটে ব্যথা দীর্ঘদিনের। ইদানীং ব্যথাটা বেড়েছে। ডাক্তারও দেখিয়েছে হাশেম। আল্ট্রাসনোগ্রাফি ও এন্ডোসকপি করাতে হবে। ওষুধ আর পরীক্ষা মিলিয়ে হাজার তিনেক টাকা লেগে যাবে। ছেলে বারেক এক

হাজার টাকা দিল ঠিকই কিন্তু তার বউ শিউলির হাত দিয়ে। টাকা দিতে দিতে শিউলি যা বলল তাতে টাকাটা নিতে ইচ্ছে হচ্ছিল না হাশেমের।
-নেন, টেকা লইয়া যান। এইডা আমার জমাইয়া রাখা টেকা থেইক্কা দিলাম। ঠিকমতো আবার দিয়া দিয়েন। আপনাগরে টেকা দিলে ত আবার দেওনের নাম লননা। দিয়া দিবেন কইলাম।
-হ বাবা, এইডা শিউলিরই টেকা। আমার হাতে কোনো টেকা নাই। আমার টেকা হইলে নাহয় একটা কথা আছিল- বারেক বলে।
দুদিন না যেতেই শিউলি এসে হাজির।
-টেকাটা দেন। আগারগাঁওয়ে বাণিজ্য মেলা শেষ হইয়া যাইতাছে। পুরানা টিভিডা নষ্ট অইয়া গেছে। ছবি-টবি কিচ্ছু দেখা যায় না। ভর্‌ভর্ শব্দ করে। নতুন একটা টিভি কিনুম। মেলা শেষ হইয়া গেলে দাম বাইড়া যাইব।
-টেকাডা কয়দিন পরে নেও বউ। তোমার শ্বশুর ত এই কয়দিন কামে যাইতে পারে নাই। আমারে লইয়াই দৌড়াইছে। জোবেদা বলে- চেঁচিয়ে উঠে শিউলি-
-ক্যান পরে নেমু? পরে আর মেলা থাকব নি। ঐ বাসার সোনিয়ার মা আজই টিভি কিনতে যাইব। একলগে দুইডা কিনলে কম দামে আনতে পারুম। দেন টেকা দেন।
-ঘরে এহন টেকা নাই। কেমনে দেমু বউ?
-ক্যান, টেকা কইগেছে। কার লাইগা আয় করেন, আমি বুঝি না। আপনার ছোটো পুলার লাইগা কবে থেইকাই টেকা জমাইতাছেন। ছোডো পুলা ত মাইয়া লইয়া ফুরুত মারছে। কোনহানের কোন মাইয়া কেডা জানে। ভালোঘরের পুলা-মাইয়া কি আজকাল ফুরুত মারে নি? পুলা যেমন, মাইয়াও অমন ঘরেরই অইব। শিউলির গলার আওয়াজে ঘর থেকে বের হয়ে আসে বারেক। জোবেদা এগিয়ে যায় বারেকের দিকে।
-বাজান, তুই ত দেখছস তর বাপে এই কয়দিন কামে যায় নাই। আমারে লইয়াই দৌড়াইছে।
-টেকা দেওনের সময়ই ত কইলাম এইডা শিউলির টেকা। কথায়কামে মিল না থাকলে শিউলির মাথা গরম হইয়া যায় তাতো জানো তোমরা।
হাশেম দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো। মুখফুটে কিছুই বলছে না। বলছে মনে মনে।
-কুলাঙ্গার পুলা আমার। তোর কথাকামে খুব ঠিক আছে। মায়ের চিকিৎসার লাইগা টেকা দিছস বউয়ের টেকা বইলা। তাও আবার ধার। বাপ-মার লগে এই কতাই আছিল তর। তর বউ তরেও কোন ঘরের পুলা বানাইয়া ফালাইল। তুই দাঁড়াইয়া তামশা দেখস।
গাড়ি আজ কুমিল্লার ময়নামতির উদ্দেশে ছুটে চলেছে। চলন্ত গাড়িতে ছেলে-মেয়েগুলো উল্লাস আর হইচইয়ের মাতম তুলেছে। কেউ গিটার বাজাচ্ছে। কেউ সিট থাবড়িয়ে গান ধরেছে। গান শেষে তুমুল হাততালিতে 'ওয়ান মোর ওয়ান মোর' আওয়াজ করছে। জমে উঠেছে পিকনিক। এদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই হাশেমের। কি এক ভাবনা ঘিরে রেখেছে তাকে। ভেবেই চলেছে। ছোটো ছেলে তারেকও কি শেষ পর্যন্ত... ভেবে পায় না। জোবেদা বলত-।
–আমার এই পুলাডা হইছে এক্কেবারে আফনার লাহান। গায়ের রং, চেহারা সবই আফনার পাইছে। দেখবেন বড়ো অইলে আফনার মতোই গতর ভরা পশম গজাইব।

ছেলে তো দেখতে হাশেমের মতোই হলো। কিন্তু হঠাৎ কি এসে ভর করল তার ওপর। হাশেম ভেবে কুল কিনারা পায় না। তবুও ভাবতে থাকে–
–বিয়া করবি ত কর। দরকার হইলে তর বড়ো ভাইয়ের মতো বউ লইয়া আলাদা থাক, আলাদা খা। কিন্তু মাইয়া লইয়া উধাও হইলি ক্যান? লোকজন তাগো মাইয়া খুঁজতে আমার বাড়িতে আইব ক্যান? এই নিয়া তর ভাইয়ের বউ জুবেদারে দিন-রাত জ্বালাইব ক্যান? জীবনে ত কোনো অন্যায় করি নাই আমি। বুড়ো বয়সে মাইনষের কতা হুনতে অইব ক্যান? তবে কি কামরাঙ্গীর চরের চায়ের দোকান্দার রমিজের কতাই ঠিক।
–আগের লাঙ্গল যেইভাবে যায় পিছের লাঙ্গলও সেইভাবে যায়। ছোডোডা দেখতে তোমার মতো হইছে বইলা অত বড়াই কইরো না হাশেম। সময় হইলে ঠিকই টের পাইবা। যেই যুগ পড়ছে, ছেলেপুলে লইয়া কোনো আশা নাই। দেহনা, তিনপুলা থাইকাও বুড়া বয়সে আমার চায়ের দোকান লইতে হইছে। হেগো নিজেগই নাকি অভাবের শেষ নাই। আবার বাপ মারে খাওয়াইব !
–রমিজের কথাই কি শেষ পর্যন্ত হাশেমকে মানতে হবে। দিন কি এতই খারাপ যাচ্ছে! বুড়ো বাবা মার লাইগা দরদ লাগে না সন্তানের! কোনো জবাব খুঁজে পায় না হাশেম। হঠাৎ গাড়ির জানালা দিয়ে দূরে পানির ওপর চলন্ত লঞ্চ চোখে পড়ে। চেতনা ফিরে পায় যেন। একটু নড়ে চড়ে বসে। গাড়ি এরমধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মেঘনা ব্রিজ অতিক্রম করছে। বড়ো নিশ্বাস ফেলে এদিক ওদিক তাকায়। শিক্ষার্থীরা নাচে-গানে ব্যস্ত। এতক্ষণে মনে হলো হাশেম আজ পিকনিকে যাচ্ছে। ব্যাটারি, মেশিন ও স্পিকার ভালোই চলছে। কোনোটিতেই ডিস্টার্ব নেই। অবিরাম বেজে চলেছে। গাড়িতে হই-হুল্লোড় হচ্ছে কিন্তু এতে হাশেমের কোনো আকর্ষণ নেই আজ। হইচই থেকে ছিটকে পড়ে আবার। কিছুটা ঝিমুনিও আসে। কাল রাতে ঘুমায় নি সে। স্ত্রী জোবেদা সারারাতই কান্নাকাটি করেছে। ছোটো ছেলের জন্য বিলাপ। তিন দিন হলো ছেলেটার হদিস নাই।
–বাজান তুই কই গেলি রে। অ বাজান ফিরা আয়! তরে কিচ্ছু কমু না। বাজান ফিরা আয়! তর বউরেও মাইন্না লমু। বাজান কই আছস তুই, ফিরা আয়!
জোবেদার কান্নার আওয়াজ বেসুরে লাগলেও কিছু বলতে ইচ্ছে করে না হাশেমের। চুপচাপ শুয়ে আছে। জোবেদা আবার বিলাপ ধরে–
–বাজান কই গেলি রে। অ বাজান ফিরা আয়!
চেঁচিয়ে উঠে হাশেম।
–চুপকর! তর ভ্যানর ভ্যানর আর বাল্লাগেনা। ভোর বেলা কামে যাইতে অইব। একটু ঘুমাইতে দে। দুইডা হারামজাদা বিয়াইছস। একটা বউ লইয়া আলাদা থাহে আলাদা খায়। আরেকটা মান-ইজ্জত ডুবাইছে।
আওয়াজের ওপর জীবন কেটেছে হাশেমের। বাইশ বছরে সাইন্ড সিস্টেমের আওয়াজে কখনো বিরক্ত হয় নি। কিন্তু আজ জোবেদার কান্নার আওয়াজ বড়ো বেসুরে লাগে। অস্থির হয়ে উঠে। জোবেদাকে ধমকায়। জোবেদাও দুএকবার চেঁচিয়ে ওঠে।
–কেমন বাপ আফনে? নিজের পুলার লেইগা কদ্দুর মায়াও নাই। পুলাডা কই আছে কেমনে আছে- কোনো খোঁজ লইলেন না।
ঢাকা শহরের এত মানুষের ভিড়ে ছেলেকে কোথায় খুঁজবে। ঠিকানা ছাড়া কি কোনো কিছুর হদিস পাওয়া যায় এ শহরে। জোবেদার আবেগাপ্লুত অহেতুক নালিশের কোনো জবাব দেয় না হাশেম।

জোবেদা থেমে থেমে কাঁদে।
–বাজান কই গেলি রে। আয় বাজান ফিরা আয়!
আবার চেঁচিয়ে উঠে জোবেদা–
–ডাকাইত কোনখানের, পাষাণ কোনখানের। নিজের পুলার লাইগা মায়া নাই। একটা কসাইয়ের লগে ঘর করি আমি।
জোবেদার কান্না আর চেঁচামেচির আওয়াজে শীতের রাতে অস্থির হয়ে উঠে হাশেম। আওয়াজে আওয়াজে কেটে গেল জীবন। আজ সে আওয়াজ ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করে। চরম বিরক্তি লাগে। কান জ্বালাপালা হয়ে ওঠে। খেপে যায় সে।
–তর প্যান প্যানানি বন্ধ করবি নাকি ঘর থেইকা বাইর অইয়া যামু। রাইত ত পার অইয়া গেল। হারামজাদা বিয়াইছস, আবার কান্দস ক্যান, হ্যাঁ কান্দস ক্যান?
গাড়িতে কি হচ্ছে সেদিকে খেয়াল নেই হাশেমের। গত রাতের জোবেদার বেসুরে আওয়াজে ডুবে আছে সে। হঠাৎ একটা শব্দ মুখ থেকে বেরিয়ে যায়।
–ধুত্তুরি, আওয়াজ টাওয়াজ আর বাল্লাগেনা।
মেশিনটার দিকে হাত বাড়ায়। পুরো গাড়ি নীরব হয়ে যায়। ছাত্ররা দাঁড়িয়ে বলে–
–কী কাকা, স্পিকার বন্ধ করলেন ক্যান?
এতক্ষণে খেয়াল আসে হাশেমের। মনের অজান্তে কখন যেন পায়ের কাছে রাখা স্পিকারের মেশিনের সুইচ বন্ধ করে দিয়েছে সে। নিজের কাজে নিজেই আশ্চর্য হয়। মেশিনের সুইচ মোচড় দেয়। বেজে ওঠে স্পিকার। ছেলে-মেয়েগুলো আবার হই-হুল্লোড় শুরু করে। আওয়াজে আওয়াজে চলতে থাকে গাড়ি।

ফিরে দেখা মৃত্যু

মূল : পবন সিংহ

লায়লা ফেরদৌস ইতু

গতকাল যেখানে আমার মৃতদেহটা আছড়ে পড়েছিল, যে শক্ত সিমেন্টের মেঝেতে আমার রক্ত-মাংসের দেহটা তার সকল ভার হঠাৎ করেই ছেড়ে দিয়েছিল, সেই জায়গাটা কি সুন্দরভাবেই না তার স্বাভাবিক প্রাণচাঞ্চল্য মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মাঝেই ফিরিয়ে এনেছে। কিন্তু মৃত্যুস্থানের কি কোনো ভূমিকা আছে একটা মৃত্যুকে সংঘটিত করার ক্ষেত্রে? যে জীবন আমি যাপন করেছি এবং যে জীবন থেকে

> আমি কোনো গতানুগতিক বর্ণনা ধারা অনুসরণ করব না। কারণ আমার মৃত্যু কিংবা আত্মহত্যা তো আমার জীবনেরই একটা অপ্রতিরোধ্য অংশ। এ জন্যে 'একদা ছিল' টাইপের সূচনা আমার দরকার নেই। আমি আপনাদেরকে কেবল ততটুকুই বলব, যতটুকু না

আমি পালিয়ে এসেছি সেখানে একটা শক্ত মেঝে কিংবা নরম মাদুরের কি কোনোরকম কার্যকারিতা কোনোদিন ছিল? কেউ যদি আমার জীবনের গল্পটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েন, তাহলে এমন কিছু কোথাও খুঁজে পাবেন না, যার জন্যে আমার জীবনটা কাহিনি বলার মতো কোন পর্যায়ে উঠে আসতে পারে। কিন্তু আজ আমি মাত্র একদিনের সময় হাতে নিয়ে আপনাদের মাঝে ফিরে এসেছি আমার সারাটা জীবন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নেব বলে।

আমি কোনো গতানুগতিক বর্ণনা ধারা অনুসরণ করব না। কারণ আমার মৃত্যু কিংবা আত্মহত্যা তো আমার জীবনেরই একটা অপ্রতিরোধ্য অংশ। এ জন্যে 'একদা ছিল' টাইপের সূচনা আমার দরকার নেই। আমি আপনাদেরকে কেবল ততটুকুই বলব, যতটুকু না বললে আমার গল্পটা 'আমার' হয়ে উঠবে না। আমি আসলে মরতে শুরু করেছিলাম অনেক, অনেক দিন আগেই... সেটা অনেক আগের একটি দিন ছিল... আপাতত শুধু এতটুকুই বলছি। সঠিকভাবে দিন-তারিখ-মাস বের করার মতো বোধশক্তি এখন আর আমার নেই। আমার দিন-তারিখের হিসাব তো সেই ওপর থেকে নিচের দিকে ছিটকে পড়ার সময়ই এলোমেলো হয়ে গেছে। সময়টা ছিল আমি আমার মায়ের সেই গোপন বিষয়টি স্বীকার করার আট বছর পরের ঘটনা। তাহলে আমার বয়স তখন নিশ্চয়ই তেরো হয়েছিল। খুব একটা বেশি বয়স নয়, আবার মারা যাবার জন্যে একেবারে কমও নয়। আমার বয়স যখন মাত্র পাঁচ, তখনই আমি আমার জীবনের স্বাভাবিক যাত্রাপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ি। নোংরা চিন্তা আমার মাথায় অংকুর হয়ে গজিয়ে বেরিয়েছিল, এবং এত দ্রুত গতিতে সেটা ডাল-পালা মেলে ছড়িয়ে পড়েছিল যে আমার সম্ভাবনাময় কল্পনাপ্রবণ মনটি তাতে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।

অবশ্য সেটাই বা বলি কি করে? আর দশ জনের চেয়ে ভালো লাগা, মন্দ লাগাটা একটু পৃথক হলেই কি তাকে বিকৃতি বলে, অচ্ছ্যুত বলে ছুড়ে ফেলতে হবে? যেমনভাবে আমিও ছুড়ে ফেলেছিলাম মৃত্যুকালীন সময়ে আমার সকল সম্পর্কের সুতো? আমি তো একটানা যুদ্ধ করেছি আমার নিজের মনের সেই তথাকথিত বিকৃতির বিরুদ্ধে, আমি সবসময় অধোবদন থেকেছি আমার হৃদয়ে বাসা বাঁধা সেই পাপ বোধের কারণে, সব সময় দিগ্‌ভ্রান্তের মতো ঠোকর খেয়েছি দোষ স্বীকারের উপায় খুঁজে খুঁজে। পাঁচ থেকে আট বছর পর্যন্ত আমি আমার মনের ওপর চেপে বসা সেই ভীষণ যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ খুঁজেছি, যদিও আমি জানি না আমার সেই যন্ত্রণার নাম আমি কি দেব বা কি দেওয়া যায়। শৈশব এবং এর অদ্ভুত শৈলী আমাকে টেনে নিয়েছিল এক অপরিপক্ব বিকৃতির দিকে। আমি তখন থেকেই আমার নিজের গোপনীয় অঙ্গগুলোর প্রতি অধিকতর

মনোযোগী হয়ে উঠেছিলাম, যা সহজেই অতি ক্রিয়াশীল কৌতূহলের দিকে যে কাউকে টেনে নিতে সক্ষম। পাঁচ বছর কি যৌন বিকৃতির জন্যে উপযুক্ত সময়, যদি সে বিকৃতি হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য? একটা মানুষ পাঁচ বছর বয়সে কোথায় দাঁড়ায়? নিশ্চয়ই একটা হালকা নৈতিকতার বোধ আর অসহায় নিষ্পাপ অনুভূতির ঠিক মধ্যস্থলে তার অবস্থান থাকে। কিন্তু সেই বছর পাঁচেকের শিশুর কাছে আমরা কতটুকু নৈতিকতার বোধ কামনা করতে পারি, যে এখনও এই সিদ্ধান্তই নিতে পারে নি একটা পিঁপড়া হত্যা করা ঠিক কিনা? কিন্তু আমার ক্ষেত্রে দুটো ব্যাপারই, অর্থাৎ পিঁপড়া হত্যা আর যৌন বিকৃতি এতই সূক্ষ্মভাবে এক সূত্রে গাঁথা যে পাপের বোধটাকে ঠিক একটা সুনির্দিষ্ট ভেদ রেখা টেনে আলাদা করা মোটেও সম্ভব নয়। আমি আগেও বলেছি যে আমার সারা জীবনটা এখন আমার কাছে একটা সিনেমার ফ্ল্যাশব্যাকের মতোই, যা মনে করাটা কঠিন কিন্তু ভুলে যাওয়াটা আরও বেশি কঠিন।

তাই আমি যখন এত উঁচু ভবনটার ওপর থেকে নিচের দিকে আছড়ে পড়ি, তখন আমার সমস্ত স্মৃতির টুকরোগুলো ছড়িয়ে থাকা পাজল বোর্ডের মতো ছড়াতে ছড়াতে শেষ পর্যন্ত আমার চূর্ণ-বিচূর্ণ খুলির টুকরোগুলোকে অবলম্বন করেই একত্র হয়ে একটা সম্পূর্ণ ছবিতে পরিণত হয়েছিল আর গাঢ় রক্তের স্রোতে সেই ছবির এখানে ওখানে রঙের ঘাটতিটুকু পুষিয়ে দিয়েছিল। তারপরও আমার গল্পের অধিকাংশ অংশই কিন্তু সেই পতন, সেই আছড়ে পড়ে নিশ্চিহ্ন হওয়া, যার কিছু কিছু অংশ মিলিয়ে পরিপূর্ণ রূপ দেওয়াটা আমার পক্ষে একবারে অসম্ভব। আমি কি ঝরে পড়া তারা, নাকি অনন্ত অন্ধকারে ঝলসে ওঠা একটা ছোট্ট আলোক বিন্দু? আমি আসলে একটা তুচ্ছ মানুষ মাত্র, যে কেবল একটা পরিচ্ছন্ন মৃত্যু চেয়েছিল, হোক সেটা দুর্ঘটনাবশত কিংবা আত্মহত্যাজনিত, কেবল সেটা যেন পাপে আচ্ছন্ন জীবন থেকে পালানোর একটা উপায় করে দিতে পারে।

যে একটি মুহূর্তের কয়েক শত ভগ্নাংশের এক অংশে আমার আত্মাটি মাটি এবং স্বর্গের মাঝামাঝি অবস্থানে ঝুলছিল, সেসময় হয়তবা এমন এক প্রান্তসীমায় তখন আমি ঝুলন্ত হয়েছিলাম যাকে প্রতিফলিত করানোটা আমার জীবন নিয়ন্ত্রণকারীর মোটেও ইচ্ছে ছিল না। তারপরও কয়েকটি দৃশ্য চকিতে আমার হৃদয়ে ভেসে উঠেছিল। আমি শেষ এবং প্রথমবারের মতো সেসব

“ তাই আমি যখন এত উঁচু ভবনটার ওপর থেকে নিচের দিকে আছড়ে পড়ি, তখন আমার সমস্ত স্মৃতির টুকরোগুলো ছড়িয়ে থাকা পাজল বোর্ডের মতো ছড়াতে ছড়াতে শেষ পর্যন্ত আমার চূর্ণ-বিচূর্ণ খুলির টুকরোগুলোকে অবলম্বন করেই একত্র হয়ে একটা সম্পূর্ণ ছবিতে ”

দৃশ্যের বর্ণনা যদি দিই, তাহলে কি সেটা কি খুবই অন্যায় হবে? প্রথম যে দৃশ্যটি আমার মনে ভেসে এসেছিল, সেটা ছিল একটা গোসলের দৃশ্য। মা আমাকে গোসল করাচ্ছেন। তখন আমার বয়স কত হবে? মাত্র পাঁচ বছর। সেটা ছিল ঠান্ডা পানিতে গোসল, তাই সংগত কারণেই ভীষণ দ্রুতগতির এবং কোথাও কোনো অনাবশ্যক ফাঁক ছিল না। তিনি মগ থেকে আমার মাথায় পানি ঢালছিলেন, মগটা ভরা হচ্ছিল পাশে রাখা বালতি থেকে। বালতিতে পানি পড়ছিল ছেড়ে রাখা ট্যাপ থেকে, যে ট্যাপের পুরোটা জীবনব্যাপী কেবল দুটি শব্দই প্রমাণিত সত্য, কাজ শেষ হবার পর নিরবচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতা এবং খুলে রাখা হলে উদ্দাম জীবনের স্পন্দন।

মা যেহেতু আমার মাথায় পানি ঢালছিলেন, তাই আমাকে বেশ কষ্ট করে নিশ্বাস নিতে হচ্ছিল। আমার নিশ্বাসের সাথে বুদবুদ তৈরি হচ্ছিল, আমার প্রায় বন্ধ হয়ে থাকা নিশ্বাসের সাথে তাল মিলিয়েছিল ঠকঠক করতে থাকা দাঁত এবং লাল হয়ে ওঠা নাক। সেসময় বোধ হয় 'সায়ামিজ টুইন'-এর মতো অপরাধবোধ এবং স্বীকারোক্তি আমার অস্তিত্বের ভেতরে কোথাও একত্রে ফাঁদে পড়া অসহায় জন্তুর মতো হাঁসফাঁস করছিল। তারা উভয়েই আসলে বেশ সুন্দর বাধ্য বাচ্চার মতো একে অন্যকে ধরে রেখেছিল, কারণ তারা একত্রে বেরিয়ে আসবে কিনা সেই বিষয়ে তখনো পর্যন্ত কোনোরকম মনস্থির করতে পারছিল না।

স্বীকারোক্তিটা আমার ভেতরে গুমরাতে শুরু করেছিল, যেটা একেবারে ব্যক্তিগত শব্দের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। এটা যেন একটা হালকা ফিসফিসানির মতো শোনাচ্ছিল। মা আমাকে শব্দটা আবার করতে বললেন। এবার যেন সেটা একটা ক্ষীণ স্বরের মতোই শোনাচ্ছিল। মা পানি ঢালাটা বন্ধ করে যেন গুম হয়ে রইলেন। মগটা তাঁর হাত থেকে বালতির পানিতে ছেড়ে দিলেন। আমার সকল শব্দ সৃষ্টির ক্ষমতা যেন লোপ পেয়ে গিয়েছিল। মা চুপচাপ ট্যাপটা বন্ধ করে দিলেন। তাঁর প্রতিটা নড়াচড়াই যেন আমার জন্যে এক একটা আঘাত মনে হচ্ছিল। কিন্তু আঘাতটা তখনো আসে নি। আমার সারাটা শরীর যেন একটা জীবন্ত বরফখ‌- পরিণত হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল কিছু একটা ভুল করে ফেলেছি আমি। এরপরই মা আমার এক গালে একটা চড় মারলেন। আমার চোখ বেয়ে স্বাভাবিকভাবেই জল গড়িয়ে পড়ল। তার মানে বরফ গলে পড়ল।

কিন্তু এক্ষেত্রে আমার অপরাধটা কোথায় ছিল? নোংরামি তো নোংরামিই। আমাদের বড়োরা এভাবেই ব্যাপারটিকে দেখে থাকেন। একটা পাঁচ বছর বয়সী বরফখ- তো আর তার একুশ বছর বয়সী চাচাতো ভাইকে কোনো যৌন আনন্দ দানে বাধিত করতে পারে না। বিশেষত সেই আনন্দ যদি হয়ে থাকে কেবল মাত্র মৌখিক (?)! আমার গোসল শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমাকে মুছিয়ে শুষ্ক করে তোলা হলো। আসলে আমি শুষ্ক হলাম চোখের জল থেকে ... গোসলের পানি থেকে ...আমার একান্ত ব্যক্তিগত মাতৃত্বধর্মী স্পর্শ থেকে। আমি সেসব সেই পাঁচ বছর বয়সে কিছুই বুঝতে পারি নি, আর আজ আমি এসবের কোনোরকম পরোয়া করি না। কি এসে যায় সকলের ভালো লাগাকে মাথায় রেখে সারাজীবন নিজেকে বঞ্চিত করলে? কিংবা নিজের আনন্দের জন্যে অন্যদের মূল্যবোধের অসারতা প্রমাণ করলে?

এর পরের যে দৃশ্যটি আমার স্মৃতিতে আসছে সেটা আসলে শুধুমাত্র একটা চকিত দৃশ্য। এটা ছিল এমন এক দৃশ্য যা দূরবর্তী কোনো ন্যায়বিচারের বোধকে ডেকে আনতে পারে। এটি একটি মুখোমুখি সংঘর্ষের দৃশ্য, একটি প্রশ্ন করার দৃশ্য, উত্তরের দাবি জানানোর দৃশ্য। দুজন মা, যে দুজনের একটি করে দুশ্চরিত্র ছেলে রয়েছে। এক দুশ্চরিত্র আবার অন্যটিকে জৈবিক শেষ প্রান্তের দিকে ছোটাচ্ছে, যেখানে পার্টনারের জন্যে কোনো আনন্দ ছেড়ে আসা হচ্ছে না। যাই হোক, যৌন বিকৃতি যদি ঘটে থাকে পাঁচ বছর বয়সে, তাহলে সেটা সাময়িক একটি ব্যাপার বলে বিবেচিত হতেই পারে, সময়ের সাথে সাথে সেটা বিষণ্ন অনুভূতি হারিয়ে ফেলতে পারে, অবদমিত পার্টনারের জন্যে এটি কেবল একটি বরফের খণ্ডে পরিণত হবার সুযোগই বাকি রাখতে পারে। এটা দুটো পরিবারের মধ্যকার বিষয়, এমন দুজন মায়ের বিষয় যারা তাদের ছেলেদের জগৎ সম্পর্কে কিছুই জানেন না এবং যাদের কাছে ছেলেদের যৌনতা কেবল এমন একটি বিষয় যা শুধুমাত্র মেয়েদের বিষয়েই মনোযোগী হতে পারে এবং তার অন্যথা ঘটলেই যেটাকে আমরা সরাসরি বিকৃতি বলে চিহ্নিত করে ফেলতে একেবারে নিঃসন্দেহ থাকতে পারি। কিন্তু বিনিময়ের বিষয়ে গেলে দেখা যায় যে পুরো মুখোমুখি হবার প্রক্রিয়াটি আসলে এক বিরাট সাহসিকতার কাজ।
একটি বহুমুখী অবদমন নির্ভর যৌথ পরিবারে ঐতিহ্যবাহী গৃহস্থালি করার জন্যে নিয়তি নির্ভর এক রক্ষণশীল বধূ যদি তার ছেলের ওপরে ঘটে চলা যৌন নিপীড়নের জন্যে কথা বলতে চান তাহলে সেটাকে সাহস ছাড়া আর কি বলা যায়? যেক্ষেত্রে তিনি নিজেই দুর্বলতম লিঙ্গধারী এক দুর্বলতম সদস্য।

সেই সাহসিকতা তারপর কি করেছিল? কেবল এক দাম্ভিক পরিবারের সদস্যদের সুপ্ত বিবেকের ভিতটাকে একটু হালকাভাবে কাঁপিয়ে দিয়ে অনেক অজুহাত সহকারে সেই কাঁপুনিটাকে কেবলমাত্র একটা তাৎক্ষণিক ক্ষমা প্রার্থনায় পরিণত করেছিল। প্রেস্টিজ ইস্যুটাই মানবিকতার চেয়ে সেখানে অনেক বড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমার সেই একুশ বছর বয়সী কাজিনের মা তাই আমার মাকে বার বার শাসিয়ে দেন যেন এ বিষয়টি কোথাও ঘুণাক্ষরেও কখনো উচ্চারিত না হয়। কিন্তু সমস্যাটি ছিল এর চেয়েও বড়ো কিছু। আমার মায়ের আত্মঅহংকার তো আমার নিজের আগ্রহের কোনো পরোয়া কোনোকালেই করে নি।

এখন আর কোনোরকম সমালোচনার কোনো কার্যকারিতা আছে বলে আমি মনে করি না, যেহেতু আমি এখন মৃত। আমার জন্যে মাত্র পাঁচ বছর বয়সে যৌন হয়রানি আসলে এমন এক নিষিদ্ধ বিষয়ের জ্ঞান অর্জন যা একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত আমার জন্যে অধরাই থেকে যাবার কথা ছিল। যেদিন আমি মারা গিয়েছিলাম সেদিন আমার সঠিক বয়স ছিল সতেরো বছর আট মাস আড়াই দিন। আহ্! এতগুলো দিন কি কেবল জীবনের প্রতিটি বিষয়ের সাথে এঁটে ওঠার জন্যে, মানিয়ে নেবার জন্যে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগার জন্যে, পিছু ফিরে তাকাবার জন্যে, চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে, প্রতিটি কোনা খুঁচি দেখার জন্যে এবং অবশেষে বিকৃতি উপভোগের জন্যে? হ্যাঁ, আমার ছিল তখন একদম শুরুর সময়। আমার শরীরের এখানে ওখানে তখন লোমের আধিক্য দেখা দিচ্ছিল আর আমার চেহারার ওপরে একজন পরিপূর্ণ যুবকের স্কেচ যেন তখন সবেমাত্র কেউ এঁকে দিচ্ছিল। মনে

হচ্ছিল আমার তখনকার কণ্ঠস্বর যেন আমার নয়, অন্য কারো। তবে এসবের চেয়ে অনেক বেশি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নিশ্চয়ই আমার মাঝে ধারণ করে নিয়েছিলাম।

তাই তৃতীয় একটি ইমেজ, একটি তুচ্ছ স্মৃতির টুকরো, কোনো পুরনো ম্যাগাজিনে প্রকাশিত প্রিয় কোনো আর্টিকেলের মতোই আমার মনে আবার ঝলসে উঠেছিল, ঠিক যেভাবে আমরা পুরনো পত্রিকা বিক্রি করার সময় একবার পৃষ্ঠা উল্টিয়ে দেখতে গেলে মনে করি। তখন আমার বারো বছর পেরিয়ে গিয়েছিল। তখন পর্যন্ত ছেলে কাজিনদের সাথে অর্ধেক ভেজানো দরজার আড়ালে একসাথে গোসল করাটাকে কেউই খারাপ চোখে দেখত না। তাই সে সময়কার গোসল মানে দুষ্টুমিপূর্ণ, পানি ছোড়াছুড়ির খেলা। কোনো রকম হিংসা-বিদ্বেষ নয়, কেবল নির্দোষ চিৎকার ছিল আমাদের খেলা। সেদিন আমরা দুই কাজিন ছিলাম ঠিক এক বয়সের আর আমাদের মায়েরা কেবল আমাদেরকে চিৎকার করতে নিষেধ করছিলেন। আমরা আমাদের পানি খেলায় এত বেশি মগ্ন হয়েছিলাম যে আমাদের মায়েদের বকাবকিতে গোসল শেষ করার জন্যে দ্রুত করতে বাধ্য হলাম। আমরা তাই টাওয়াল গায়ে জড়িয়ে গোসল করতে মনোযোগী হলাম। আমার চোখে-মুখে তখন সাবান লাগানো। ঠিক তখনই আমার কাজিন আমার কোমরের দিকে যথেষ্ট পানি ছুড়ে দিল। আমার পাঁচটি ইন্দ্রিয়ই তখন একসাথে সতর্ক হয়ে উঠেছিল। আমি একহাতে টাওয়ালটা টেনে ওপরে উঠালাম আর মুখে বকাবকি শুরু করলাম। যদিও এখন এসব মনে হলে আর ততটা প্রতিক্রিয়া আমি অনুভব করি না। আসলে এটা আমার জীবনের একটি অপ্রাসঙ্গিক চিত্রকল্প যা পরবর্তীতে হয়ত আমাকে সেই কাজিনের সাথে অন্যকিছুতে জড়িয়ে পড়ার বিষয়ে তৈরি হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

আমার বিশেষ কিছুই বলার নেই। চূড়ান্ত পর্যায়ের ন্যায়বিচার নিশ্চয়ই সরল স্বীকারোক্তির ভেতরেই থাকে। আরও দুটি দৃশ্যকল্প আমার বর্ণনা করার বাকি আছে। যেগুলো তাড়াহুড়ো ছাড়া বলে নেওয়াই ভালো। কারণ সেসব ঘটনা কেবল ঘটনাচক্র মাত্র, কেবল এক একটা নির্ভেজাল সত্য এবং একই সাথে খুব সাধারণ এবং নির্ভেজাল মৃত্যুর কাহিনি। আমার বয়স তখন সতেরো। এটা এক বছর আগের কোনো ঘটনা নয়। এটা কেবল আমার মৃত্যুর কয়েকদিন আগের ঘটনা। আমি তখন ছিলাম ভীষণরকম জীবন প্রত্যাশী। এর ঠিক কয়েক দিন আগেও আমি ছিলাম আমার সেই অপরাধবোধের ভেতরে বেঁচে থাকা একজন মানুষ। আমি অপরাধবোধের কারণে প্রায় যেন অসুস্থই থাকতাম। আমার মনে হতো যে আমি যা অনুভব করি, যা করতে চাই, যেভাবে আনন্দ লাভ করি তার কিছুই সৎ নয়, কোনোভাবেই এগুলো উচিত কাজ নয়। এই চিন্তাটাই আমাকে সতেরো বছর পর্যন্ত কুরে কুরে খেত। তারপর একদিন আমি দেখলাম যে হঠাৎ করেই আমি আমার সেই বোধ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গেছি। মানে আমি যেন আমার ভেতরে কোথাও সেই আগের অপরাধবোধটাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমার সকল অপরাধ যেন আমার চেনা-জানা অপরাধের তালিকার সাথে তখন গুলিয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, সেই গ্রীষ্মের বিকেলের স্মৃতি আমার স্মৃতিতে এখনও জ্বলজ্বল করছে। লোডশেডিংয়ের কারণে সারা পরিবারের সবাই পত্রিকা কিংবা হাতপাখা ঘোরাচ্ছে আর এটা-ওটা বলে অলস সময় পার করছে। কী

জীবন্ত দৃশ্য!

আমার মা, দাদিমা, কাজের মহিলা উমা বাইরের বারান্দায় বসেছিলেন। কুনাল, আমার এক ক্লাসমেট, আমার সাথে বসে একটা সিনেমা দেখবে বলে সেদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিল। কিন্তু লোডশেডিংয়ের কারণে আমাদের পরিকল্পনা ভেস্তে গেলে আমরা বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে বিদ্যুতের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া তখন আর কিছুই করার ছিল না। আমার কামরাটা ছিল সারা বাসার মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ এবং এয়ারকুলারও তাপমাত্রা কিছুটা নামিয়ে এনেছিল। আমরা অলসভাবে আধ শোয়া ভঙ্গিতে শার্ট খুলে রেখে শুয়েছিলাম। এবং আমাদের অবচেতনে আংশিকভাবে প্রোথিত ছিল আমরা একটু পরে যা করতে চলেছিলাম, তার কিছুটা আভাস। দুটো অল্পবয়সী শরীর নিষ্কর্মা সিলিং ফ্যানের নিচে শোয়া অথচ ভেতরে ভেতরে তখন উষ্ণতার পারদ চড়ছিল। হঠাৎ এক ঝলক বাতি জ্বলেই নিভে গেল, আমরা কারেন্ট এসেছে ভেবে লাফিয়ে উঠেছিলাম। পর মুহূর্তেই আমরা আমাদের দূরত্ব আরেকটু কমিয়ে আবারো শুয়ে পড়তে বাধ্য হলাম। এবার কিন্তু একেবারে নিশ্বাসের নাগালে চলে আসাতে আমাদের বাস্তবজ্ঞান লোপ পেতে শুরু করল।

আমরা তখন ছিলাম অন্য এক জগতে। অসহ্য গরম পরিবেশ, আমাদের শরীর চুইয়ে পড়া ঘাম, আমাদের প্রায় ঝাপসা হয়ে আসা দৃষ্টিশক্তি– সেই বিকেলের প্রচ্ছন্ন পরিকল্পনা– সব কিছু মিলে যেন এক অসহ্য বেদনায় পরিণত হলো। ধীরে ধীরে তাই আমরা একে অন্যের মাঝে বিলীন হতে শুরু করলাম। আমরা যেন তখন দ্রবণশীল কোনো তরল পদার্থ, একে অন্যের ভেতর দিয়ে প্রবহমান। বিশাল মহাশূন্য যেন একটা বিরাট ফাঁক তৈরি করে দিয়েছিল যার মধ্য দিয়ে আমরা নিশ্চিন্তে ডুবে যেতে পারছিলাম। উমা সেখানে ছিল প্রায় দুই মিনিটের জন্যে। সারাটা বিকেল যেন হঠাৎই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কিছুই নড়ছিল না। কেবল ধীরে ধীরে উমা সেখান থেকে পিছু ফিরতে শুরু করেছিল।

এটাই সর্বশেষ ইমেজ যা আমার মস্তিষ্কে এখন পর্যন্ত জ্বলজ্বল করছে। পিছু ফেরার পদক্ষেপ। নোংরা নখ, রুক্ষ পায়ের পাতা আর শক্ত গোড়ালি তখন ফিরে যাচ্ছিল– ফিরে যাচ্ছিল আমার ছুড়ে ফেলা সেই বাস্তবতার দিকে। এভাবে আমার বন্ধ কামরার রহস্য উমার দ্বারা বাইরে প্রবাহিত হবার সাথে সাথে আমি বাইরে বেশ চেঁচামেচি শুনতে পেলাম। কুনাল সাথে সাথেই চলে গিয়েছিল। আমি তাকে যেতে দেখি নি। আমি কেবল দেখেছি তার ভেঙে পড়া ইমেজগুলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। উমা কি দেখেছিল সেটা ব্যাখ্যা করতে তার যথেষ্ট সময় লেগেছে, যেহেতু তাকে বেশ সতর্কতার সাথেই শব্দ চয়ন করতে হয়েছিল। সে সচেতন কাটছাঁট আর আবদ্ধ প্ররোচনা দ্বারা সব কিছু ব্যাখ্যা করেছিল।

এরপর আমি অবধারিতভাবে অচ্ছুত বলে গণ্য হবার ভাগ্য অর্জন করলাম। আমার সারাটা জীবন যেন পেছনে সরে গিয়েছিল এবং দূরবর্তী হয়ে উঠেছিল। আমি শুনতে পেলাম দরজা বন্ধ করা হলো কিন্তু তার আড়ালে অনবরত ফিসফাস চলছিলই। যেনবা চারপাশে তখন বুদবুদ উঠছিল একত্রে মিশ্রিত কোনো এক মিশ্রণের, যেন রাগ, স্ক্যান্ডাল, আতঙ্ক সব একটা মুখবন্ধ বোতলের ভেতরে আটকা

পড়েছিল। এগুলো সবই একত্রে চেষ্টা চালাচ্ছিল আমার ভাগ্যকে আড়াল করার এবং আমার জন্যে এক বিকল্প, অপেক্ষাকৃত ঐতিহ্যবাহী পথ বের করার জন্যে। একটি অ-ঐতিহ্যবাহী, নিয়মিত, স্বাভাবিক, সমান্তরাল, প্রশ্নাতীত, অবিলুপ্ত, ইতররতিপ্রবণ জীবনদানের জন্যে কি চমৎকার প্রচেষ্টা! মনে হচ্ছিল তখন প্রত্যেকেই যেন প্রস্তুত হয়ে আছে আমার প্রকৃতিকে পরিবর্তনের জন্যে আর তাদের সম্মানজনক অবদান সে কাজে রাখার জন্যে। যেন এমন এক শব্দ তারা আমার জন্যে ঠিক করে রেখেছিল আমাকে যার অর্থ স্বীকার করতেই হবে। আমার বাবার সময়োচিত এবং তৎপর পদক্ষেপের জন্যে আমি তাই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

আমি আমার মায়ের কাছেও কৃতজ্ঞ। কারণ তিনি আমার 'পুরুষত্ব'র বিপর্যয়কে প্রতিরোধ করার জন্যে অতীতে যথেষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। যদি তাঁর ঘৃণা না থাকত, তাহলে যৌন বিকৃতি আমার ক্ষেত্রে মাত্র পাঁচ বছরের পরিবর্তিত শৈশবের বেশি কিছু হতে পারত না। আমি কখনই আমার শৈশবকে মিস করি না। আমার পারিবারিক ডাক্তার, মিস্টার বোসের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ, তাঁর মূল্যবান এবং জীবন পরিবর্তনকারী মেডিক্যাল এইড এবং কাউন্সেলিংয়ের জন্যে। তাঁর আলোকিত ডাক্তারি জ্ঞানের সহায়তা ছাড়া আমাকে হয়ত অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের পুরুষত্ব নামক এক ভ্রান্ত ধারণার ভেতরেই বাকি জীবন বসবাস করতে হতো। তিনি আমাকে অনিশ্চয়তাবিহীন বৈবাহিক জীবন এবং উত্তরপুরুষ জন্মদানের সম্ভাবনা দ্বারা এক নির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন।

অবশেষে উমা– যার নিরপেক্ষ সততা এবং রূপান্তরিত ক্রিশ্চিয়ান আত্মা সকল মানুষকে এক রূপে বিবেচনা করেছিল, তার বর্ণনাও পবিত্র নির্দেশনার প্রতি আনুগত্যের একটি বহিঃপ্রকাশ ছিল। আর এসব কিছু মিলিয়ে আমি একজন 'পুরুষ' (যে কিনা একজন 'নারী'র জন্যে নির্দিষ্ট) হবার বদলে কেবল একজন 'মানুষ'রূপে পরিগণিত হবার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমার এই চিন্তাটা হাস্যকর; কিন্তু আসলে এটাই আমার দৃষ্টিতে বাস্তবতা।

সংক্ষিপ্ত এবং পরিবর্তিত জীবন যাপনের মধ্যে এক ধরনের পরিমিতিবোধ রয়েছে। সর্বশেষ যে দৃশ্যপট আমার স্মৃতিতে আছে সেটা কোনো বাস্তব দৃশ্য নয়, বরং এক অধিবাস্তব এবং কল্পিত দৃশ্য। সেটা হচ্ছে আমার মায়ের অরক্ষিত, বাবার পরিমিত, উমার স্বস্তিবাচক অদৃশ্য হাসির দৃশ্য যা কোনো এক অনিয়ন্ত্রিত মুহূর্তে তারা ঘটিয়েছিলেন। কারণ তাদের আশাপূর্ণ হাসি আছে সেসব ছেলের জন্যে যারা বড়ো হয়ে বিয়ে করবে, বিয়ের বিষয়ে যাদের সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে, যাদের দ্বারা নাতি-পুতি পেলে তখন দাদা-দাদিসুলভ তর্কাতর্কিতে তাদের জন্যে নাম বাছাই করা যাবে। কিন্তু সমকামী ছেলের বিষয়ে কখনই তো তাদের বলার কিছু থাকবে না। এরকম অনাকাঙ্ক্ষিত উত্তর প্রজন্মের জন্যে তাদের কোনো লাইফ ইন্স্যুরেন্স নেই। তাদের প্রতিদিন শুরু হয় মহান স্রষ্টার কাছে সৎ উত্তরাধিকারীর জন্যে প্রার্থনার মাধ্যমে। তাঁরা অসৎ সন্তানের হেদায়েতের জন্যে প্রার্থনার চাইতে বেশি তার জন্যে আর কি করতে পারেন? ইতররতিপ্রবণ মাতা-পিতা আর সমকামী সন্তান– যেন কলঙ্কিত চাঁদ আর তার আবছা আলো। তাই সময়ের এক সংকীর্ণ গলিপথ বেয়ে আমি পালিয়ে গেলাম এবং ভারী কোনো বস্তু পতনের শব্দসহ আছড়ে নিচে পড়লাম। মাথার খুলি ফাটার শব্দের সাথে যেন

একটা বন্ধ দরজা খুলে আমাকে
আমার উপযুক্ত পৃথিবীতে ঢোকার পথ
করে দিল ।
আর এদিকে, এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে
গতানুগতিক ইতররতিপ্রবণ এক
কারখানার চিমনি পথে হঠাৎ করেই
এক ঝলক সমকামী ধোঁয়া বেরিয়ে
এসে যেন শূন্যে মিলিয়ে গেল ।

(লেখক পরিচিতি : পবন সিং দিল্লি
ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতিতে
স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর থেকে প্রায়
আধডজন চাকরির অভিজ্ঞতা অর্জন
করেছেন । এরপর তিনি হায়দ্রাবাদ
থেকে গণযোগাযোগের ওপর মাস্টার্স
কোর্স সম্পন্ন করেন । তাঁর পরিকল্পনা
তাঁর ভাষায় 'বিভিন্ন শহরে ঘুরে
বেড়ানো এবং সেসব সম্পর্কে লেখা' ।
'ফিরে দেখা মৃত্যু' তাঁর প্রথম
প্রকাশিত গল্প । এটি প্রকাশিত হয়
অন্তরা দেব সেন সম্পাদিত ভারতের
বিখ্যাত 'The Little Magazine'
পত্রিকাতে । সেখানে গল্পটির
শিরোনাম ছিল 'Death in
Flasback'.

সাম্প্রতিককালে ভারতে সমকামিতা
আইনগত স্বীকৃতি পেয়েছে । কিন্তু
তার আগে এবং আজো 'ভালোবাসা
নারী-পুরুষের বিষয় নয়, বরং কেবল
মানুষে-মানুষে সংঘটিত হবার বিষয়'
এভাবে ভেবে বিষয়টিকে স্বীকৃতি
দেবার মন-মানসিকতা ভীষণ দুর্লভ ।
সমকামীরা কেবল আর দশজনের
মতো নন বলে যে দুর্বিষহ জীবনযাপন
করতে বাধ্য হন এবং আমাদের মতো
তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে প্রায়শই
আত্মহননে বাধ্য হন, এই সত্যটিই
পবন সিংয়ের এই গল্পের মূল
উপজীব্য । আগ্রহী পাঠকরা চাইলে
এই গল্পসহ উক্ত ম্যাগাজিনে প্রকাশিত

অপরাহ্নের গল্প

আলী হাসান

'আর কুলাইবার পারতাছি না, আপনেগো আতে-পায় ধরি, ইট্টু বিষ আইনা দ্যান!'
পটকামাছের মতো ফোলাপেটে চিৎ হয়ে ভ্যানে শুয়ে অতিকষ্টে শব্দ কটি উচ্চারণ করে রাবেয়া। ভ্যানের সাথে দৌড়ে দৌড়ে হাঁটছে রাবেয়ার মা, মামা, মামাতো বোন ফিরোজা, তাহের মাস্টার, বাবুলাল সূত্রধর ও কালুর দাদি। কালুর দাদি আশপাশের পাঁচ-দশ গাঁয়ের মধ্যে নামকরা ধাত্রী। এমনও কথা প্রচলিত আছে– পাসকরা ডাক্তার যে জটিল ডেলিভারি করাতে সাহস না পেয়ে গর্ভবতীকে এ-ক্লিনিক

রাবেয়ার বাবা যখন মারা যায় তখন সে কোলের শিশু, হামাগুড়ি দিতে পারত। মায়ের কাছে শুনেছে– যুদ্ধের বছর মুক্তিবাহিনীর কয়েকজন ছেলেকে নৌকায় করে ধলেশ্বরীর ওপাড়ে কেদারপুর পৌঁছে দেওয়ার অপরাধে পশ্চিমপাড়ার আফছার মুন্সীর নেতৃত্বে চার-পাঁচজনের একটি দল বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে তার বাবার দেহটাকে

থেকে ও-ক্লিনিকে, ও-হাসপাতাল থেকে এ-হাসপাতালে ফুটবলের মতো চালাচালি করেছে কালুর দাদি হাতের কায়দা-কৌশলে সেই গর্ভবতীর পেট থেকে এমনভাবে বাচ্চা বের করে এনেছে যে গর্ভবতী টেরই পায় নি। রাবেয়াকে সে পানিপড়া, মধুপড়া, নুনপড়া... কোনোটি খাওয়ানো বাদ রাখেনি; অথচ সন্তান প্রসবের কোনো লক্ষণই প্রকাশ পায় না।

সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে কারো পেট এত বড়ো হয় তা বোধহয় এর আগে কেউ দেখে নি। দেখবে কী করে, কারো তো আর রাবেয়ার মতো সাড়ে বারো মাসের পেট হয় না– নয় মাস, সাড়ে নয় মাস, কদাচিৎ দশ মাস! গ্রামের মানুষ তো বলেই বেড়াচ্ছে–'জারজপেট এ রকমই হয়! দীর্ঘসময় পেটে থাকতে থাকতে হয়ত দাড়ি-গোঁফ গজিয়ে গেছে পোলার।' প্রথম থেকেই রাবেয়া বলে আসছে তার গর্ভের সন্তান জারজ নয়, এখনও বলছে। শুধু যেদিন সে জানতে পারল তার স্বামী ভাসেকটমি করানো, সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম; সেদিন থেকে বলছে– 'তাইলে এ সন্তান আল্লায় দিছে। কোন নবীরে নাকি বাপ ছাড়াই আল্লায় দুনিয়ায় পাঠাইছিল– তেমনি।' তার এমন কথায় মানুষ দাঁত বের করে হাসে।

রাবেয়ার বাবা যখন মারা যায় তখন সে কোলের শিশু, হামাগুড়ি দিতে পারত। মায়ের কাছে শুনেছে– যুদ্ধের বছর মুক্তিবাহিনীর কয়েকজন ছেলেকে নৌকায় করে ধলেশ্বরীর ওপাড়ে কেদারপুর পৌঁছে দেওয়ার অপরাধে পশ্চিমপাড়ার আফছার মুন্সীর নেতৃত্বে চার-পাঁচজনের একটি দল বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে তার বাবার দেহটাকে মুড়ি-ভাজার ঝাঁজোরের মতো ছিদ্র ছিদ্র করে নিজের নৌকায়ই ফেলে রেখে গিয়েছিল। রাবেয়াকে লাশের কাছে নামিয়ে দিলে সে হামাগুড়ি দিয়ে মৃত-বাবার মুখে খামচাখামচি করেছিল। রাবেয়ার একমাত্র বড়োভাই জলিমের বয়স তখন আট হলে কি হবে, সে-ও হামাগুড়ি দিয়েই বাবার লাশের কাছে গিয়েছিল। কারণ, জন্মের পর থেকে জলিমের দুটি পা-ই বিকলাঙ্গ। স্বামীর মৃত্যুতে রাবেয়ার মা বছিরনের চারিদিক অন্ধকার হয়ে এল। সম্পত্তির মধ্যে পাঁচ শতক জায়গার ওপর একটি ছনের ঘর, আর এক-মালিকা নৌকাটি ছাড়া তেমন কিছুই নেই। রাবেয়ার বাবা বর্ষায় নৌকা চালিয়ে এবং শুকনো মৌসুমে কামলা খেটে সংসার চালাত। বছিরন নিরুপায় হয়ে নৌকাটি বিক্রি করে কোনোভাবে মাস তিনেক চালাল। তারপর একটানা দুইদিন উপোসের পর এক সকালে রাবেয়াকে জলিমের কাছে রেখে 'তরা থাক, আমি চাইল নিয়া আইতাছি'– বলে পুরান একটা সাজিতে কাপড়ের খ- বিছিয়ে কাঁখে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ফিরে এল দুপুরে, এক সেরের মতো পাঁচমিশালি চাল নিয়ে।

'মা, চাইল কনে থিকা আনলা?'– মনের খুশিতে জিজ্ঞেস করে জলিম।

'কামাই কোইর‍্যা আনছি।'

'আমিও যদি কামাই করা হারতাম! তাইলে আর না-খাইয়া থাহুন নাকত না।'

'বড় অ, তারপর কামাই করিস।'

'আমি তো খাড়াইবারই পারি না। কামাই করুম ক্যামবা?'

'বোইহ্যা বোইহ্যাও ম্যালা কামাই করুন যায়'– ভাতের হাঁড়িতে চাল ঢালতে ঢালতে উত্তর দেয় বছিরন। জলিম আর কথা বাড়ায় না। মনে মনে সেই দিনের কথা ভাবে যেদিন সে কামাই করতে পারবে। এখন প্রতিদিন সকালে ছেলেমেয়ে দুটিকে কিছু পান্তাভাত খাইয়ে বাসি মুখেই সাজিটা নিয়ে বেরিয়ে যায় বছিরন, ফেরে দুপুরে। কোনোদিন একসের, কোনোদিন দেড়সের, আর কপাল ভালো হলে কোনোদিন দুইসের চালও মেলে। সাথে দুই-চারটা আলুগোটা, দুইটা বেগুন, নয়তো একফালি লাউও। এভাবে কাটে বছর পাঁচেক। জলিম এখন পরিষ্কার বোঝে, তার মা ভিক্ষা করে চাল আনে। তিনটি জীবন রক্ষা করতে এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না বছিরনের।

আফছার মুন্সী দেশ স্বাধীনের পর কিছুদিন লাপাত্তা থেকে গ্রামে ফিরে মেম্বার পদে নির্বাচন করে এখন সমাজের মাথা। প্রথম দিকে প্রায়-রাতেই সে ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে বছিরনকে ডেকে টাকার লোভ দেখিয়ে দরজা খুলে দিতে বলত। আর ঠিক তখনই স্বামীর লাশের বিকৃত চেহারা বলে উঠত– 'ছিঃ, ছিঃ বছিরন! যে তর স্বামীরে বাঁচপার দিল না, তুই তারই আতে তর ইজ্জত তুইলা দিবি? শকুনডা তর দেহডারে ছিঁড়াখুঁইড়া খাইব। যদি আর কিছু না-ই পারস পুলা-ম্যায়া দুইডারে নিয়া আমার কাছে চইলা আয়।' বছিরন শোনেনি, আফছার মুন্সী কিংবা স্বামী, কারো আহ্বানই সে রক্ষা করেনি। মানসম্মানের মাথা খেয়ে ভিক্ষায় নেমেছে।

দেখতে দেখতে চলে যায় আরও কটি বছর। মাকে অনেক বলেকয়ে জলিম কাঠের একটি চারচাকার ঠেলাগাড়ি বানিয়ে নিয়েছে। প্রথম প্রথম বছিরন-ই তাকে গাড়িতে শুইয়ে ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে নিয়ে ভিক্ষা করত। এখন রাবেয়া যায়। দুই ভাইবোন সকালে ঠান্ডা কিছু খেয়ে বেরিয়ে পড়ে নাগরপুরের উদ্দেশে, ফেরে সন্ধ্যার আগে আগে। সারাদিন ভিক্ষা করে– বেবিস্ট্যান্ডে, সিনেমাহলের সামনে, কলেজের আশপাশে এবং হাসপাতাল-চত্বরে। দিনশেষে যা হয় এনে মায়ের হাতে তুলে দেয়। এখন বছিরনের সংসার ভালোই চলছে। একটা গাভি কিনেছে।

আফছার মুন্সী দেশ স্বাধীনের পর কিছুদিন লাপাত্তা থেকে গ্রামে ফিরে মেম্বার পদে নির্বাচন করে এখন সমাজের মাথা। প্রথম দিকে প্রায়-রাতেই সে ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে বছিরনকে ডেকে টাকার লোভ দেখিয়ে দরজা খুলে দিতে বলত। আর ঠিক তখনই স্বামীর লাশের বিকৃত চেহারা বলে উঠত– 'ছিঃ, ছিঃ বছিরন! যে তর স্বামীরে বাঁচপার দিল না

কয়েকদিন আগে গাভিটি একটি নাদুসনুদুস বাছুর বিইয়েছে। প্রতিদিন দুইসের করে দুধ দেয়। নিজেদের খাওয়ার জন্য আধাসের পরিমাণ রেখে বাকিটা বছিরন নিজেই বাজারে বিক্রি করে আসে। রাতে ছেলেমেয়ে দুটোকে দুমুঠো ভাত, সাথে একটু তরকারির ঝোল এবং শেষে একটু দুধ দিতে পেরে বছিরন মহাখুশি। ভালোই দিন কাটতে থাকে বছিরনের।

ক্রমে রাবেয়া যৌবনবতী হয়। ফরসা মোটাসোটা বাবার আদলের শরীরে উটকোগন্ধের পরিবর্তে এখন মেয়েলি গন্ধ। গ্রামের যুবকছেলেরা নানাভাবে ত্যক্তবিরক্ত করে, কটূক্তি করে। কিন্তু রাবেয়া তাতে পাত্তা দেয় না। পাত্তা দিলে যে তার মাকে আবার ভিক্ষায় বের হতে হবে। একা বাড়িতে থাকাও তো নিরাপদ নয়। বিশেষ করে খইমুদ্দি মাতবরের ছোটো ছেলে ওসমান যেভাবে পেছনে লেগেছে তাতে খুব ভয় হয় রাবেয়ার। একদিন ধলাবিল থেকে গোসল দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় রাবেয়ার পথ আগলে দাঁড়ায় ওসমান–

'এই টসটসা শইল নিয়া ভিক্ষা কোরবার যাস, মাইনষে কী কয়? কয় ট্যাহা পাস হারাদিন ভিক্ষা কোইরা? তুই খালি আমার কতাডা রাখ, শও শও ট্যাহা আমি তরে দিমু। তগো বাড়ির পিছে যে ঝোপটা আছে না, ওইহানে রাইতের বেলা আমি হাজুইনা জিনিসপাতি নিয়া খাড়াইয়া থাহুম। তুই আইহ্যা নিয়া যাবি।

'রাইতে ক্যা? ট্যাহা-গয়না দিবার চাস দিনে আয়। দিনে আইতে ডরাস?'

'আরে না, ডরামু ক্যা? দিনে ট্যাহা-পয়সা দিবার গ্যালে যদি কেউ দেইখা ফালায়? মাদবরের পুলা, অ্যাটা মানসুম্মান আছে না?'

'তাইলে বিয়্যা কর। আমারে বিয়্যা কোইরা ওইগুইলা দে। হেসুম তো আর মানসুম্মান যাইব না।'

'কী কইলি? তর দেহি সকও কম না, ফকিন্নির ম্যায়া ওইয়্যা মাতবর বাড়ির বউ ওইবার চাস!'

'ও-ও, ফকিন্নির ম্যায়ারে বিয়্যা কোরতে ঘিন্না নাগে, আর তারে কুকতা কোইতে মজা নাগে? হর, হর এ্যাহান থিকা!'

'চোপ মাগি, সাহুস কত, আমারে ধমক দেয়! বাজারে বাজারে ঘুইর‍্যা বারো নাঙ্গের নগে ফষ্টিনষ্টি করস, হে কতা মনে করচাস আমি জানি না?'

'জানচাস ভালো করচাস, এ্যাহন থিকা খালি বাজারে না, হারা দ্যাশে ঘুইর‍্যা ঘুইর‍্যা ফষ্টিনষ্টি করুম, তর কী? নুইচ্চা কনেকার। ভিক্ষা কোইরা ভাত খাই। তর মতোন নুইচ্চামি করি না, বুচ্চস?'

'আমি নুইচ্চা আর তুই সাধু? খাড়া তর সাধুপনা আমি ছুটাইতাছি।' চোখমুখ লাল করে চলে যায় ওসমান।

'যা যা, তুই যা পারস করিস।'

ওসমান এরপর থেকে প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে রাবেয়ার বড়োরকমের কোনো ক্ষতি করার। প্রতিটি রাত কি-যে ভয়ে কাটায় রাবেয়া তা একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই জানে। দিন পনের পরের এক দুপুরে আফছার মুন্সীর চ্যালা ইয়াদালী রাবেয়াদের বাড়িতে আসে–

'রাবেয়া, রাবেয়া বাড়িতে আছো?'

'রাবেয়া তো বাইড়তে নাই, কামে গ্যাছে।' বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে উত্তর দেয় বছিরন।

'আঃ হাঃ রে! এই বয়সে স্বামীর ঘর করবে, কোলে সন্তান থাকবে– তার বদলে যেতে হয় ভিক্ষা করতে। তা যা কইতেছিলাম রাবেয়ার মা, আমরা কইলাম তোমার রাবেয়ার একটা বিয়ে-শাদির ব্যবস্থা করতে পারি। অবশ্য তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে। একটা ফিরা্যা-টিরা্যা আছে, একটু বসতাম?' ঘর থেকে ছোটো একটি পিঁড়ি এনে বাড়িয়ে দেয় বছিরন।

'মাশ আল্লাহ'– পিঁড়ি পেতে বসে ইয়াদালী। 'ইটু পান..., না থাক, এক গ্লাস পানি দিলেই চলবে। অ্যালুমিনিয়ামের একটি পুরান বাটিতে করে পানি এনে দেয় বছিরন। ইয়াদালী ঢকঢক তিন–চার চুমুক দিয়েই খালিবাটি ফিরিয়ে দেয়। বামহাতের তালুতে মুখ মুছে মেহেদিকরা দাড়িতে চার আঙুল চিরুনির মতো চালাতে থাকে।

'বুঝলা রাবেয়ার মা, দিনকাল ভালো না। সেয়ানা মেয়ে ঘরে রাখা ঠিক না। কখন কী হয়, বলা তো যায় না!' হাতের ছাতাটা মাটিতে খোঁচাতে থাকে– 'মেয়েটার একটা গতি করে দেই, কি বল?'। ইয়াদালীকে ভালো করেই চেনে বছিরন। যুদ্ধের সময় সে ছিল আফসার মুন্সীর এক নম্বর সহচর। তবুও আদব রক্ষার্থে বলে–

'ফকিন্নির ম্যায়ারে ক্যারা বিয়্যা কোরব?'

'কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু, আল্লার দুনিয়ায় মানুষ তো আর দুই একজন না। যে রাজি হয় আমরা তার কাছেই যাব। আফছার মুন্সী সাহেবের বিস্তর সম্পত্তি-টাকা-পয়সা। কিন্তু আফসোস, আল্লাহ তাআলা তিনাকে একটা ছেলে দেন নাই। পাঁচ পাঁচটি মেয়ের বাপ তিনি। যদি তুমি রাজি থাকো তবে তিনি রাবেয়াকে ঘরে তুলে নিতে রাজি আছেন। থাকবে না, কোনো অভাব থাকবে না! রাবেয়া রাজরানি হয়ে থাকবে। জলিমের চিকিৎসার ব্যবস্থাও হবে। প্রয়োজনে তাকে বিদেশে নিয়ে কলের পা লাগিয়ে আনা হবে।'

'কী কইলেন? একটা বদমাইশ, তার ওপর ঘাটের মরার নগে রাবেয়ারে বিয়্যা দিমু? আপনে যান, দরকার ওইলে বিষ খাওইয়া ম্যায়ারে মাইরা ফালামু, তাও ওই পিশাচের নগে বিয়্যা দিমু না। এহনই ব্যাবাক ভুইলা গেলেন? রাবেয়ার বাপেরে ক্যারা খুন কোরছিল?'

ইয়াদালী একটু গলাখেঁকুর দেয়– 'গ-গোলের বছর কে কি করেছে সেই কথা কি কারো মনে আছে? তিনি এখন মানুষের জন্য কি-না করতেছেন? মক্তব বানিয়েছেন, মসজিদ পাকা করে দিয়েছেন, প্রতি শুক্রবার জুম্বাবাদ কাঙালিভোজের আয়োজন করেন। রাবেয়ার ভবিষ্যৎ ভেবেই প্রস্তাবটা তিনি পাঠিয়েছেন। ভিক্ষা করে আর কতদিন চলবে? আজকালকার ছেলেছোকরাদের বিশ্বাস নেই। একদিন হয়ত দেখবে রাবেয়াকে পাওয়া যাইতেছে না। পরদিন পুব-চকের কুইশাল ক্ষেতে হয়ত তারে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যাবে।'

'চুপ করেন, একদম চুপ করেন। রাবেয়া আপনের মেয়ের বয়সের। আমার ভাবতেও ঘিন্না অয়, এমুন খারাপ কতা আপনে ক্যামবা কন?'

'ও-ও, বাজারের মধ্যে পুরুষ মানুষের শরীলে শরীল ঘষা দিয়ে দিয়ে ভিক্ষা করে তাতে কোনো দোষ নেই, বিয়ের কথা বললেই দোষ। এই জন্যেই কথায় বলে– মানুষের ভালো চাইতে নেই।' দ্রুত ছাতাটা বগলে নিয়ে বাড়ি থেকে নামতে নামতে কথাগুলো বলে চলে ইয়াদালী।

সেদিন রাতেই বিষয়টি নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবল বছিরন। ইয়াদালীর শেষের কথা কয়টি গো-ডাঁশের মতো তার চারপাশে ভন ভন করছে। এক সময় একত্রে ভিক্ষা করত কাকদুপাড়ার উজ্জলের দাদির সাথে। উজ্জলের মা তিনবছর আগে কোলের মেয়েটিকে নিয়ে কোথায় চলে গেছে। সেই থেকে উজ্জলের দাদি ছেলে সোনামিয়াকে আর একটি বিয়ে করানোর জন্য মেয়ে খুঁজছে। সোনামিয়া বাজারে মানুষের ফুটফরমাইশ খাটে। এতে যে যা দেয় তাই তার সারা দিনের উপার্জন। পরদিন কাকডাকা ভোরে বছিরন কাকদুপাড়ার উদ্দেশে বের হয়। ঘণ্টাখানেক হেঁটে উজ্জলের দাদির বাড়িতে এসে ওঠে।

'বু, কেমুন আছাও? কতদিন তোমার নগে দেহা অয় না, তাই ছুইটা আই-লাম। তা তোমার শইলডা কেমুন? মাজার বিষ কি কমছে?'– একটা পিঁড়ি টেনে বসতে বসতে বলে বছিরন।

'নারে বোইন, কব্বরে যাওনের আগে কি আর বিষ কমব? তোমার খবর কী? এ্যাহন ভিক্কা করো না, আর দ্যাহাও অয় না। ম্যায়াডা কত বড়ো ওইছে?'

'ওইছে, ভালোই বড়ো ওইছে– বিয়্যার লায়াক। অর এ্যাটা বিয়্যার ব্যবস্থা করুন দরকার। কী যে করি? বাপে বাঁইচা থাকলে আমার কুনো চিন্তা আছিল না। বু, তুমি এ্যাটা ব্যবস্তা কোইরা দ্যাও না!'

'আমি কী ব্যবস্তা করুমরে বোইন! পোলার বৌডা চইলা যাওনের পর থিকা কত চ্যাষ্টা করতাছি এ্যাটা বিয়া করাইবার, পারতাছি না। তুমার ম্যায়ারে আমি ক্যামনে বিয়্যা দিমু?'

'আইচ্ছা বু, আমার রাবেয়ারে যদি তোমার আতে তুইলা দেই, তুমি নিবা?'

'কী কোইলা, রাবেয়ারে আমার পুলার নগে বিয়্যা দিবা? তুমি কি আমার নগে তামসা কোরতাছ?'

'তামসা না, তুমি যদি রাজি থাহো তয় আমার কুনো আপত্তি নাই।'

পরের রাতেই রাবেয়া সোনামিয়ার ঘর করতে চলে আসে। প্রথম দুই বছর খুব ভালোই কাটে। পুলিশের মতো শক্তি রাবেয়ার গায়। সংসারের সব কাজকর্ম করার পরও বাড়ির উঠানে টুকটাক শাকসবজির আবাদ করে। স্বামীর সেবাযত্নের পাশাপাশি শাশুড়ি ভিক্ষা করে এলেই হাতমুখ ধোয়ার পানি এগিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে বিছানা করে দেওয়াসহ সব কাজই করে দেয়। কিন্তু বিগত দুই বছরে সে যা দিতে পারেনি তা হলো একটি সন্তান। অবশ্য সেজন্য কারো কোনো কষ্ট নেই। রাবেয়া জানে, হয়ত তার সন্তানধারণ সম্ভব হবে না। তার ঋতুস্রাব অনিয়মিত। কখনো ছয়মাস-একবছর বন্ধ থাকে; আবার কোনো মাসে দুই-তিন বারও হয়। সে শুনেছে, এ রকম অনিয়মিত ঋতুস্রাব হলে সহজে সন্তান পেটে আসে না। আবার হঠাৎ এসেও যেতে পারে। বিষয়টি স্বামী-শাশুড়ির কাছে গোপন রেখেছে। ইতিমধ্যে রাবেয়ার পরামর্শে সোনামিয়া টাঙ্গাইল শহরে যেয়ে রিক্সা চালাতে শুরু করেছে। মাস তিনেকের মধ্যেই বাসা ভাড়া করে পরিবারের সকলকে নিয়ে শহরে চলে আসে। রাবেয়া একটি ব্যাচেলর-মেসে রান্নার কাজ নেয়। গত দুই-তিন মাস থেকে একটি বিষয় লক্ষ করছে সে। তার তলপেট ধীরে ধীরে বড়ো হচ্ছে। মাস-দেড়েক পর এক রাতে সোনামিয়ার কাছেও বিষয়টি ধরা পড়ে। ভূত দেখার মতো আঁতকে ওঠে সে।

'তর প্যাট ফুলা ক্যা?'

'বিয়্যার পর ম্যায়্যা মাইনষের প্যাট ফুলে ক্যা, জানো না? তুমি পুলা-ম্যায়ার বাপ ওইবা!'– আনন্দে মুখ লুকিয়ে উত্তর দেয় রাবেয়া। কিন্তু এ উত্তরে সোনামিয়া খুশি হওয়ার বদলে বিগড়ে ওঠে–

'এতদিন কিছু না, ম্যাছে কাম ধরলি আর ওমনি প্যাট ফুলা শুরু ওইলো মাগি? কার নগে কী করচাস হেইডা ক?'

'কী যা-তা কও? আমার মাসিক নিয়ম মতোন ওইতো না, হেই জন্যে এতদিন বাচ্চা ধরে নাই। মনে অয় হঠাৎ কইরাই ধোইর‍্যা গ্যাছে।'

'তুই আমারে মুইতা চোক ধুয়াস!' বলেই এলোপাতাড়ি কিল-ঘুসি মারতে থাকে। থ মেরে যায় রাবেয়া। মনে মনে ভাবে 'বাচ্চার কতা হুইনা খুশি অওয়ার বদলে এমুন খ্যাপা ধোইরা উঠল ক্যা?'

'তুমি এইডা কী কও? আমার মইধ্যে ওই রহম কুনোকিছু কুনোদিন দেখছাও?'– কাঁদতে কাঁদতে বলে রাবেয়া। পরদিন বিষয়টি শাশুড়ির কানেও যায়। খেঁকিয়ে ওঠে শাশুড়ি–

'এই কাম ক্যামনে ওইলো, শিগ্গির ক?'

'আম্মা, আপনেও একই কতা কইতাছেন? ম্যায়া মানুষ, স্বামী কাছে আছে, বাচ্চা ওইবো না?'

'তয় এত দিন ওইলো না ক্যা, ম্যাছে কার নগে পিরিতির খেলা খেলতাছাও?'

'আম্মা, আপনে আমার মুরুব্বি। আপনের কাছে মিছা কতা কমু? ম্যাছের মানুষগুইলা খুব ভালো। খালি একটা ব্যাটার নজর খারাপ আছিল। হে আমারে পরায় পরায়ই বিরক্ত করত। খারাপ কাম করনের নিগা একদিন ট্যাহাও হাদছিল। আমি হেই দিনই ব্যাবাকের কাছে কোইয়া দিলাম, তার পরদিনই ব্যাটারে ম্যাছে থিকা খেদাইয়া দিল। বিশ্বাস করেন আম্মা, আমার প্যাটের বাচ্চা আপনের পুলার।'

'ম্যায়াডা অওয়ার ছয় মাস পর সোনামিয়া হাসপাতালে যাইয়া পুলাপান না অওয়ার অপারোশন ওইয়্যা আইছে। তার পরও তুমি আমারে বিশ্বাস করবার কও যে ওই সন্তান আমার পুলার?'

কথাটা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ে রাবেয়া– 'পুলাপান ওইবো না জাইনাও আমারে বউ কোইরা ঘরে আনছে? এরা এত নিষ্ঠুর!' পরক্ষণেই ভাবে– 'তাইলে গর্ভ ক্যামনে ওইলো?'

'আম্মা, আমার মনে অয় অপারোশনে কোনো ভুলচুক ওইবার পারে।'

'তুই হাসপাতালের বড়ো দাক্তর! অপারোশনে ভুল ওইছে, অ্যা? আমারে হাদারাম পাইচস মাগি? এহনি এই জাইর‍্যা প্যাট নিয়া বাড়ি থিকা বাইর অ'– বলেই সোনামিয়া একটা পিঁড়ি হাতে নিয়ে গরুর মতো পেটাতে শুরু করে। পিটিয়ে রক্তাক্ত করে ফেলে। এক পর্যায়ে রাবেয়া জ্ঞান হারায়। জ্ঞান ফিরলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরের পেছনে এসে বেড়ার সাথে হেলান দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। যে বাবার চেহারা তার মনে নেই, মনে করার প্রয়োজনও বোধ করেনি, আজ সেই বাবাকে উদ্দেশ করে হৃদয় ভেঙে অঝোরে কাঁদতে লাগল।

পরদিনই রাবেয়ার মাকে খবর দিয়ে এনে তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। মা-ও তাকে কম বকাঝকা করল না। এক-কান দুই-কান করতে করতে সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল যে, রাবেয়ার পেটে জারজ সন্তান, স্বামী তাড়িয়ে দিয়েছে। যেন এই

খবরটি শোনার অপেক্ষায়ই ছিল আফছার মুন্সী। সে গ্রামে সালিশ বসায়। মসজিদের ইমাম সোলেমান মিয়া ফতোয়া জারি করে। ফতোয়া অনুসারে রাবেয়াকে একশ দোররা মেরে তার পরিবারকে একঘরে করা হয়। দাঁড়াতে অক্ষম রাবেয়াকে কোনোমতে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বাড়িতে নিয়ে আসে বছিরন। হাতে টাকা-পয়সা যা ছিল ধীরে ধীরে সব শেষ হয়ে আসে। গ্রামের মানুষ ভিক্ষাও দেয় না। ভিক্ষা করতে যেতে হয় তিন-চার মাইল দূরে ভিনগ্রামে। অসুস্থ মেয়েকে বাড়িতে রেখে বছিরন সারাদিনের নামে বের হয়। শুধু পঙ্গু ভাইটা তার কাছে বসে থাকে। এভাবে কাটে আরও মাস ছয়েক। রাবেয়ার পেট বড়ো হতে হতে এখন গাভির পেটের মতো হয়েছে, সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ব্যথা এবং শ্বাসকষ্ট।

এক সপ্তাহ যাবৎ রাবেয়ার চিৎকারে প্রতিবেশীদের ঘরে থাকা দায়, কিন্তু সাহায্যের জন্য একটি কাকপক্ষীও উঁকি দেয় না। উপায়ান্তর না দেখে বছিরন ভ্যান ভাড়া করে এক কাকডাকা ভোরে অসুস্থ রাবেয়া আর জলিমকে নিয়ে পাঁচ মাইল দূরে বারাপুষা গ্রামে এসে ভাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। ভাইটিও খুবই গরিব, নাগরপুর বাজারে কুলিগিরি করে। সন্তান প্রসব করাতে ও-পাড়ার কালুর দাদিকে বাড়িতে এনে রাখা হয়েছে। স্কুল-মাস্টার আবু তাহের রাবেয়ার ডাক-চিৎকারে একদিন এসে আদ্যোপান্ত শোনে। পরদিনই সে কয়েকজন লোক ডেকে তাকে একটা ভ্যানে শুইয়ে হাসপাতালের দিকে রওনা দেয়। পথে রাবেয়ার যতক্ষণ জ্ঞান ছিল কাতরকণ্ঠে শুধু একটু বিষ এনে দিতে সকলকে অনুরোধ করছিল। সেঞ্চিকাটা গ্রাম পার হতেই তার আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়া রাবেয়াকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়ার পর পরই এক তরুণ ডাক্তার এগিয়ে আসে।

'দেখি দেখি, আপনারা একটু পিছিয়ে দাঁড়ান। আমাকে দেখতে দিন।' ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখে মৃদু মৃদু শ্বাস চলছে। নাকে অক্সিজেনের পাইপ লাগিয়ে নার্স ডেকে স্যালাইন পুশ করে দ্রুত কয়েকটি পরীক্ষা করা হলো। হাস-পাতালে আলট্রাসনোগ্রামের ব্যবস্থা না থাকায় রাবেয়াকে পাশের একটি ক্লিনিকে নিয়ে আলট্রাসনোগ্রাম করে আনা হলো। রিপোর্ট হাতে পেয়েই রক্তের প্রয়োজন হতে পারে, তাই রাবেয়ার মাকে কাছাকাছি থাকতে বলে ডাক্তার রাবেয়াকে দ্রুত অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যায়। পর পরই কিছু ওষুধপত্র নিয়ে ঢোকে অজ্ঞান করার ডাক্তার। রোগীর সাথে আসা সব লোকজন বাইরে অপেক্ষা করছে, সন্তানের জন্য নয়– রাবেয়ার জীবনটা রক্ষা হোক সেজন্য। ঘণ্টা তিনেক পর অপারেশন থিয়েটার থেকে প্রথমে ডাক্তার এবং পরপরই একজন নার্স বেরিয়ে আসে।

'কী খবর ডাক্তার সাহেব?'– তাহের মাস্টার এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে।

'জ্ঞান ফিরতে ঘণ্টা ছয়েক লাগতে পারে। আপনারা বাইরেই অপেক্ষা করুন।'– চেম্বারের দিকে এগিয়ে যায় ডাক্তার।

'সিস্টার, বাচ্চা বেঁচে আছে, না মারা গেছে?'

'বাচ্চা দেখতে চান? দাঁড়ান নিয়ে আসতেছি'– বলে বড়ো সাইজের একটি প্লাস্টিকের গামলা কষ্টে দুহাতে ধরে এনে দরজার কাছে নামায়। তাহের মাস্টারের পেছনে পেছনে অন্যরাও এগিয়ে যায়।

'এ কি? এটা তো বাচ্চা না। মনে হইতেছে গরুর ভুঁড়ি।'

'হ্যাঁ, এই সাড়ে ষোল কেজি ওজনের টিউমারটিই তার পেট থেকে বের
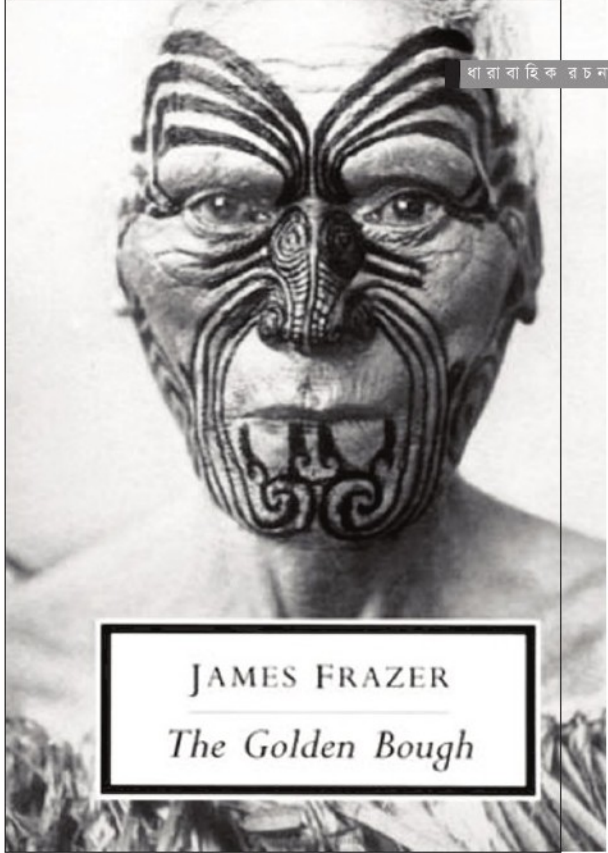
গোল্ডেন বাউ

স্যার জেমস জর্জ ফ্রেজার

খালিকুজ্জামান ইলিয়াস

পরিচ্ছেদ ২৮

তরুণআত্মার নিধনযজ্ঞ

৪. স্বাগতম বসন্ত

পূর্ববর্তী অনুষ্ঠান পালনে বসন্ত, ফাগুন বা জীবনের আগমন বার্তা যা পাওয়া

গেল তা কেবল মৃতুবিতড়ন অনুষ্ঠানেই নিহিত কিংবা বড়োজোর আগমন বার্তার একটা ঘোষণার মধ্যেই সীমিত। এখন যেসব উৎসব অনুষ্ঠানের বিবরণ দেব তাতে এই আগমনকে সরাসরি অভিনয় করেই দেখানো হয়েছে। বোহেমিয়ারই কিছু অংশে মরণমূর্তিকে জলে ডোবানো হয় সূর্যাস্তের সময়; ডুবিয়ে মেয়েরা চলে যায় বনে, গিয়ে কাটে তরুণ এক তরুবরকে যার মাথায় থাকে সবুজ পাতার মুকুট। এরপর একটা পুতুলকে মেয়ের পোশাকে সাজিয়ে ওই গাছে লটকিয়ে দেয়। পুরো গাছটা সবুজ, লাল আর সাদা ফিতেয় সাজিয়ে তাদের *লিটো* (বসন্ত)-কে নিয়ে শোভাযাত্রা করে ওরা গ্রামে গিয়ে ঢোকে; যেতে যেতে উপহার সামগ্রী সংগ্রহ করে এবং এভাবে গায়–

'মৃত্যু বেড়াক সাঁতরে জলের পর
বসন্ত ফের আসুক মোদের ঘর
সঙ্গে আনুক রক্তিম ডিম
হলুদবর্ণ কেক।
মৃত্যুকে দিই বিদায় গাঁয়ের ওপার
ফাগুন আনি বহন করে গ্রামের প্রবেশ দ্বার।'

সাইলেসিয়ার বহুগ্রামেও মৃত্যুর মূর্তিকে বেশ সমাদরে সাজিয়ে শেষে সব সাজগোজ খুলে ফেলে নাঙ্গা করে শাপশাপান্ত সহযোগে পানিতে নিক্ষেপ করা হয়, কিংবা মাঠে নিয়ে ছিঁড়েখুটে খ-বিখ- করা হয়। এরপর তরুণ-তরুণীরা গিয়ে ঢোকে বনে। ছোটো একটা ফারগাছ কেটে কা-টা চেঁচেছিলে মসৃণ করে। এরপর সেটা নানা ধরনের সবুজ কাগজে সাজায়, কাগজের গোলাপ, রঙিন ডিমের খোলস, উৎসবের কাপড় চোপড়ের টুকরাটাকরা দিয়ে ভালো করে সাজায়। এই সজ্জিত গাছের নাম বসন্ত বা ফাগুন। বালকেরা এটা বহন করে উপযুক্ত গান গেয়ে দ্বারে দ্বারে উপহার চেয়ে ফেরে। নিচের গানটি এরকম একটি গান :

'মরণকে দিই পাঠিয়ে পগার পার
বসন্তকে নিয়ে এসেছি আরেকবার
ফুল ফাগুন আর বসন্তকাল আসে
পুষ্পেরা তাই তৃপ্তির হাসি হাসে।'

কখনো আবার তারা বন থেকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে একটা মূর্তি আনে। এর নাম হয় বসন্ত, ফাগুন কিংবা বধূ। পোল্যান্ডের শহরে এর নাম জিওয়ানা বা বসন্তদেবী।

পূর্ব জার্মানির একটি শহর আইসেনাক। লেন্ট উৎসবের চতুর্থ রোববার সেখানে যুবক-যুবতীরা মৃত্যুর প্রতিনিধিত্বকারী এক খড়-মানবকে গাড়ির চাকার সঙ্গে বাঁধে। এরপর ওই চাকা চালিয়ে নিয়ে ওঠে পাহাড়ের চূড়ায়। তারপর মূর্তিটাতে আগুন ধরিয়ে গাড়িসহ তা ঠেলে দেয় পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। পরদিন ওরা একটা লম্বা ফার গাছ কাটে, সেটা সাজায় রঙিন ফিতে দিয়ে এবং তা সমতল ভূমিতে পুঁতে দেয়। লোকে তখন ফিতে পাড়তে ওই গাছে চড়ে। উত্তর লুসাসিয়ায় খড়কুটো আর ছেঁড়া কাপড় দিয়ে তৈরি মরণমূর্তিকে সাজানো হয় সদ্য বিবাহিত বধুর মুখের ঘোমটা আর সদ্য মৃত ব্যক্তির বাসা থেকে সংগ্রহ করা একটা জামা দিয়ে। এভাবে সাজিয়ে মূর্তিটাকে একটা লম্বা লাঠির আগায় আটকিয়ে সবচেয়ে লম্বা এবং শক্তিশালী মেয়েটি পূর্ণগতিতে তা টেনে নেয়। অন্যরা তখন ওই মূর্তি লক্ষ্য করে লাঠিসোঁটা ইট-পাটকেল মারতে থাকে। যে সেটাকে আঘাত করতে পারবে তার সেই বছর

হায়াৎ পাওয়াটা নিশ্চিত। এভাবে মৃত্যুকে গ্রাম থেকে নিষ্ক্রান্ত করে পানিতে ফেলা হয় অথবা সীমানা পার করে প্রতিবেশী গ্রামের মাঠে ফেলে আসা হয়। ফেরার সময় ওরা প্রত্যেকে একটা সবুজ ডাল ভাঙে এবং গ্রামে না পৌঁছা পর্যন্ত বেশ ফুর্তির সঙ্গে তা বহন করে। ঘরে ফিরে সে ডালটা ফেলে দেয়। কখনো আবার যে গ্রামে মূর্তি ফেলে আসা হয়েছে সেই গ্রামের যুবকেরা ওদের তাড়া করে এবং মূর্তিটা ছুড়ে মারে ওদের দিকেই। ওরা চায় না মৃত্যু এসে তাদের গাঁয়ে বাসা বঁ-াধুক। এমনও হয় যে দুই পক্ষে তখন লেগে যায় নারদ নারদ।

এইসব দৃষ্টান্তে কুশপুত্তলিকা আসলে মরণ আর এই মূর্তিটাকেই জলে ফেলে দেওয়া হয়। গাছ কিংবা গাছের শাখা হতো বসন্ত বা জীবন। এবং এই গাছ কিংবা শাখাই ফিরিয়ে আনা হয় গ্রামে। কিন্তু কখনো আবার স্বয়ং মৃত্যুমূর্তিতে আরোপ করা হয় জীবনের নতুন স্পন্দন এবং এক ধরনের পুনর্জাগরণের মাধ্যমে এটা হয়ে ওঠে সাধারণ জাগরণের হাতিয়ার। লুসাসিয়ার কোনো কোনো অঞ্চলে মৃত্যুমূর্তি বহনের দায় কেবল মহিলাদের ওপরই বর্তায়, এবং তারা পুরুষদের এ ব্যাপারে ঘেঁষতেই দেয় না। সারাদিন তারা শোকবস্ত্র পরে থাকে এবং শনের পুতুল তৈরি করে। সেটাকে সাদা শার্ট পরায় এবং তার এক হাতে একটা ঝাঁটা, অন্য হাতে একটা কাস্তে ধরিয়ে দেয়। এরপর গান গেয়ে ওটাকে বয়ে নিয়ে চলে। রাস্তার ছেলে ছোকরারা মূর্তিকে ঢিল মারে, পিছে পিছে যায়। গ্রামের সীমান্তে গিয়ে ওরা মূর্তিটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। এরপর একটা গাছ কেটে সেটাতে শার্টটা ঝুলিয়ে দেয় এবং আবার গান করতে করতে গাছটা নিয়ে বাড়ি ফেরে।
ট্রানসিলভানিয়ার একটি গ্রাম ব্রালার–হার্মানস্টাড থেকে বেশি দূরে নয়–তো সেই গাঁয়ের স্যাক্সনরা খ্রিষ্টের অ্যাসেনশান দিবসের ভোজপর্বে 'মৃত্যু বহন' উৎসবকে পালন করে এভাবে : চার্চে সকালের প্রার্থনা শেষে স্কুল বালিকারা ওদেরই একজনের বাসায় চলে যায়। সেখানে গিয়ে মৃত্যুর বেশ ধরে। মাড়াইয়ের পর একটা ধানের আটাকে নাড়া বানিয়ে মোটামুটি মাথা আর শরীরের আকার দেওয়া হয়। এরপর ওই নাড়ার ভেতর একটা ঝাঁটা ঢুকিয়ে এপাশ-ওপাশ ফুঁড়ে হাতের মতো করা হয়। তারপর ওই মূর্তিতে যুবতী কৃষাণীর ছুটির দিনের পোশাক পরিয়ে মাথায় লাল টুপি, রূপালি পিন এবং হাত ও বুকে ইচ্ছে মতোন রঙিন ফিতে ঝুলিয়ে দেয়। মেয়েগুলো খুব ব্যতিব্যস্ত থাকে কারণ একটু পরই গির্জায় সন্ধ্যা প্রার্থনা শুরু হবে। এর আগেই মৃত্যু-মূর্তিকে সাজিয়ে খোলা জানালায় রাখতে হবে যেন চার্চগামী লোকেরা তা দেখতে পায়। চার্চের প্রার্থনা শেষ হলে সেই বহু প্রতীক্ষিত লগ্ন আসে মৃত্যুকে নিয়ে শোভাযাত্রা করার। এই সুযোগটুকু কেবল স্কুলের মেয়েদেরই দেওয়া হয়ে থাকে। একটু বড়ো দুটো মেয়ে মূর্তিটার হাতে ধরে সামনে সামনে হাঁটে আর অন্য সবাই ওদের জোড়ায় জোড়ায় অনুসরণ করে। ছেলেরা শোভাযাত্রায় অংশ নাও নিতে পারে, কিন্তু পিছে পিছে যায় আর বিস্ময়ে হাঁ করে 'চমৎকার মৃত্যুর' দিকে তাকিয়ে থাকে আর প্রশংসা করে। এভাবে গাঁয়ের পথে পথে মিছিল যায়, মেয়েরাও সেই পুরনো গানই করে যার শুরুটা এরকম–

'Gott mein Vater, deine Liebe
Reicht so weit der Himmel ist,'
('তোমার করুণা হে আমার সদাশয়
আকাশের মতো সুখ সম্পদময়')

আর এই গানও এমন সুরে বাঁধা যা অসাধারণ। শোভাযাত্রা যখন সব পথ পরিভ্রমণ শেষ করেছে তখন মেয়েরা আরেকটা বাসায় যায়। সেখানে গিয়ে ওরা ঘরের ভেতর উঁকিঝুঁকি মারা ছেলেদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়। ছেলেগুলো এতক্ষণ ওদের পিছে পিছে হাঁটছিল। মেয়েরা বন্ধ ঘরে মৃত্যু-মূর্তির সব কাপড়-চোপড় সাজগোজ খুলে নেয় এবং এরপর উলঙ্গ মূর্তিটাকে জানালা গলিয়ে ছেলেদের দিকে ঠেলে দেয়। ছেলেগুলোও সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মূর্তিটা নিয়ে দৌড়ে যায় গাঁয়ের বাইরে। এবার আর তাদের কণ্ঠে গান নেই। ওরা গিয়ে জীর্ণ ছিন্নভিন্ন পুতুলটাকে ছুড়ে ফেলে পাশের গাঁয়ের নদীতে। এটা হয়ে গেলে এই খুদে নাটকটির দ্বিতীয় দৃশ্য শুরু হয়। ছেলেরা মৃত্যুকে গ্রাম থেকে যখন বার করছিল, তখন মেয়েরা ওই বাসাবাড়িতেই ছিল। এদেরই একজন তখন ওই মূর্তির পরনে যা যা ছিল সেই সব পোশাক নিয়ে সাজগোজ করে। এভাবে সাজলে তাকে মিছিলের পুরোভাগে নিয়ে আবার সব রাস্তায় আগের সেই গান গেয়ে ওরা ঘুরে বেড়ায়। মিছিলের পরিভ্রমণ শেষ হলে ওরা নেতৃত্বদানকারী সেই মেয়ের বাসায় যায়। সেখানে ভোজপর্ব অপেক্ষা করে। এই ভোজেও ছেলেদের যোগ দেওয়া মানা। সাধারণ বিশ্বাস এই যে মৃত্যুমূর্তি গ্রাম থেকে বহিষ্কার করার পর এখন ছেলেমেয়েরা নিরাপদে জাম বৈঁচি জামরুল ইত্যাদি ফল খেতে পারে। কারণ এতদিন পর্যন্ত মৃত্যু ঘাপটি মেরে ছিল বিশেষ করে বৈঁচি ফলের মধ্যে। এখন তো তাকে ধ্বংস করা গেছে। উপরন্তু তখন তারা ঘরের বাইরেও কোনোরকম শাস্তি ছাড়াই স্নানাদি করতে পারে। মোরাভিয়ার কিছু কিছু জার্মান পল্লিতে একই ধরনের কৃত্য এই কিছুদিন আগেও পালিত হতো। ইস্টার পর্বের প্রথম রোববার অপরাহ্ন বেলা ছেলেমেয়েরা একত্রিত হতো এবং খড়ের এক পুতুল তৈরি করত– এটাই মৃত্যুর মূর্তি। উজ্জ্বল রঙের ফিতে আর পোশাকে সাজিয়ে লম্বা বংশদণ্ডের মাথায় বেঁধে গান বাজনা আর হুল্লোড় করে এই কুশপুত্তলিকাকে নিয়ে যাওয়া হতো নিকটবর্তী পাহাড়ে। সেখানে এর কাপড়চোপড় সাজগোজ খুলে নিয়ে ধাক্কা দিয়ে বা গড়িয়ে ফেলা হতো নিচে। এরপর একটা মেয়েকে অগ্রভাগে নিয়ে শোভাযাত্রা আবার ফিরত গ্রামে। কোনো কোনো গ্রামে সবচেয়ে কুখ্যাত পতিত অঞ্চলে এই মূর্তি পুঁতে ফেলা হতো; কোথাও আবার এটাকে স্রোতস্বিনীতে ভাসিয়ে দেওয়া হতো।

ওপরের যে অনুষ্ঠানপর্বের কথা বলা হলো তা জার্মানির লুসাসিয়া অঞ্চলের। এখানে মৃত্যুর পুত্তলিকা ধ্বংসের পর যে তরু প্রবরকে আবার সমারোহে ফিরিয়ে আনা হলো গ্রামে এই ব্যাপারটিকে খুব সহজেই তুলনা করা যায় পূর্বেকার যে সমস্ত পর্বে মৃত্যুকে বহিষ্কার বা ধ্বংস করার পর বসন্ত বা ফাগুনের প্রতিনিধি হিসেবে গাছপালা পত্রপল্লবকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল তাদের সঙ্গে। কিন্তু মৃত্যু-মূর্তির পরনের জামা যখন গাছকে পরানো হয় তখন স্পষ্ট বোঝা যায় গাছ হলো ধ্বংসপ্রাপ্ত পুত্তলিকার নবরূপে আগমন। ট্রানসিলভানিয়া এবং মোরাভিয়ার উৎসবেও এই ব্যাপারটি লক্ষ করা যায়। মেয়েকে পরানো হয় মৃত্যুর পোশাক আর তাকে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ওই একই গান গেয়ে যে গান গাওয়া হয়েছিল মৃত্যুকে বহন করার সময়। এতে বোঝা যায় যে উদ্দেশ্য হলো তাকেই পুনর্জাগরণ করা যার পুত্তলিকা এইমাত্র ধ্বংস করা হয়েছে। এইসব দৃষ্টান্ত তাহলে একথাই বলতে চায় যে মৃত্যু পরিচয়ে যাকে শেষ করা হলো সে পুরোপুরি ধ্বংসাত্মক কোনো শক্তি নয় বিশেষ করে আমরা যাকে মরণ বলে ডাকি তেমনটি সে নয় মোটেও। যে বৃক্ষকে বসন্তের

জাগরণী শক্তি হিসেবে গ্রামে ফিরিয়ে আনা হলো তাকে যখন সদ্য ধ্বংস করা মৃত্যুর পরনের কাপড় পরতে দেওয়া হয় তার অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে উদ্ভিদের পুনরুজ্জীবন ঠেকানোই এর উদ্দেশ্য; বরং একমাত্র উদ্দেশ্য এই পুনর্জাগরণকে লালন করা, বিস্তার করা। অতএব যে জিনিসটাকে অর্থাৎ তথাকথিত মৃত্যুকে– সদ্য ধ্বংস করা হলো, ধরে নেওয়া যায় যে তার রয়েছে জাগরুক করার, দ্রুত সম্পাদন করার ক্ষমতা এবং সে এই ক্ষমতা উদ্ভিদ এমন কি জীবজন্তুর বিশ্বেও ব্যবহার করতে পারে। মরণমূর্তিতে এই জীবনদায়িনী গুণ আরোপ আরও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যখন দেখি কোনো কোনো অঞ্চলে ওই মূর্তির কুশের কিছু অংশ জমিতে পোতা হচ্ছে যেন ফসল ভালো হয়; কিংবা গবাদিপশুর চারিতে বিচালির সঙ্গে রাখা হচ্ছে যেন পশুবৃদ্ধি হয়। অস্ট্রিয়ান সাইলেসিয়ার একটি গ্রাম স্পাচেনডর্ফ। তো সেখানে খড়বিচালি, ঝোপঝাড়ের কঞ্চি দিয়ে বানানো মর মূর্তিকে হৈহুল্লোড় করে যখন গাঁয়ের বাইরে উন্মুক্ত স্থানে নিয়ে পোড়ানো হচ্ছে তখনই লোকের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় ওই মূর্তির টুকরো সংগ্রহের। খালি হাতেই লোকে জ্বলন্ত আগুনের ভেতর হাত চালিয়ে মূর্তির অংশ সংগ্রহ করে বাড়ি নিয়ে যায়। সেখানে নিজের বাগানের সবচেয়ে লম্বা গাছটির ডালে তা বেঁধে রাখে কিংবা ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে পুঁতেও রাখে। বিশ্বাস, এতে ভালো ফলন হবে। অস্ট্রিয়ান সাইলেসিয়ারই আরেকটি সদর জেলা মাউ। সেখানে লেন্ট উৎসবের চতুর্থ রোববার ছেলেরা বানায় কুশপুত্তলিকা আর মেয়েরা তাতে চড়ায় মহিলাদের পোশাক, ঝুলিয়ে দেয় বাহারি ফিতে, নেকলেস ও মালা। লম্বা বংশদণ্ডের আগায় সেটাকে বেঁধে গ্রামের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গে যায় দল বেঁধে নারী-পুরুষ উভয়েই। যেতে যেতে ওরা পালাক্রমে নর্তনকুর্দন করে, হা-হুতাশ করে, গান গায়। গ্রামের বাইরে উন্মুক্ত মাঠে পৌছলে মূর্তি থেকে সব পোশাক আর সাজসজ্জা খুলে ফেলা হয়; তখন জনতা ছুটে যায় মূর্তির দিকে এবং সেটা ছিঁড়ে কেটে কুটি কুটি করে এবং টুকরো অংশের জন্য তখন পড়ে যায় হুড়োহুড়ি। প্রত্যেকে মূর্তির খড় গাছি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। কারণ ওই গাছি যদি গরুর চারিতে রাখা যায় তো গরু হবে বাড়ন্ত। কিংবা ওই গাছি মুরগির খোপেও রাখা যেতে পারে। কারণ এতে মুরগি তার ডিম সরিয়ে ফেলবে না এবং আরও বেশি বেশি ডিম দেবে। মরণমূর্তির ওপর উর্বরতার এই গুণ আরোপ আরও লক্ষ করা যায় এই বিশ্বাসে যে যারা মূর্তিটা বহন করে নিয়ে গেছে তাদের হাতের লাঠি দিয়ে যদি গবাদিপশুকে পেটায় তো পশুগুলো মোটাতাজা ও বহুপ্রজ হবে। ওই লাঠি দিয়ে সম্ভবত সেই মরণমূর্তিকেও পেটানো হয়েছিল। ফলে মূর্তির যে উর্বরতাদানের ক্ষমতা তা ওই মাটিতে সংক্রামিত হয়েছে। আমরা তো এর আগে দেখেছি লিপসিকে মৃত্যুর কুশপুত্তলিকা নতুন বৌদের দেখানো হতো যেন তারা সন্তানসম্ভবা হয়।

দেখেশুনে মনে হয় মে-বৃক্ষ থেকে যে গাছ বা ডালপালাকে মৃত্যুর দাফন শেষে গ্রামে ফিরিয়ে আনা হলো তাদের আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়। যারা ওসব নিয়ে আসে তারা বসন্ত আনার কথাই বলে, অতএব কে না বলবে যে ওই গাছগুলো বসন্তেরই; বাস্তবিকই সাইলেসিয়াতে ওদের সাধারণ নাম বসন্ত বা মে, এবং যে পুতুলকে কখনো কখনো বসন্ত-বৃক্ষের সঙ্গে যুক্ত করা হয় তা বসন্তেরই অনুরূপ প্রতিনিধি, যেমন মে মাস কখনো কখনো একই সঙ্গে মে বৃক্ষ এবং মে-কন্যার প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। উপরন্তু বসন্তবৃক্ষকেও মে-তরুর মতো সাজানো হয়

বাহারি ফিতে ইত্যাদি দিয়ে মে বৃক্ষের মতোই বড়োসড়ো হলে বসন্তবৃক্ষকেও মাটিতে পুঁতে তার ওপর চড়া হয়; এবং মে-বৃক্ষের মে-তরুর মতোই ছোটোখাটো হলে তাকে বালকবালিকারা বহন করে দুয়ারে দুয়ারে গান গেয়ে সেলামি সংগ্রহ করে। আবার এই দু ধরনের প্রথার মিল দেখানোর জন্যই মনে হয় বসন্ত-বৃক্ষের বহনকারীরা ঘোষণা করে যে তারা বসন্ত এবং মে উভয়কেই গ্রামে নিয়ে ফিরছে। তাহলে দেখছি বসন্ত আনা আর মে-আনা মূলত একই প্রথা। এবং বসন্ত-তরু মে-বৃক্ষেরই স্রেফ আরেক রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। তবে একটি মাত্র পার্থক্য আছে (নামের পার্থক্য ছাড়াও) আর তা হলো উদযাপনের সময়টা– দুই পর্ব পালিত হয় দুই সময়ে । মে-বৃক্ষ সচরাচর পয়লা মে বা হুইট সানটাইডে এবং বসন্ত-তরু লেন্ট উৎসবের চতুর্থ রোববার আনা হয়। অতএব মে-বৃক্ষ যদি বৃক্ষ আত্মার বা উদ্ভিদোদ্গামের প্রতিভূ হয়, তাহলে বসন্ত-তরু একইভাবে বৃক্ষ-আত্মা বা উদ্ভিদোদ্গামের মূর্ত প্রকাশ। কিন্তু আমরা দেখেছি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বসন্ত-তরু মরণমূর্তিরই পুনর্জাগরণ। তাহলে বলা যায় এসব ক্ষেত্রে মৃত্যুর কুশপুত্তলিকা আসলে বৃক্ষাত্মা বা উদ্ভিদাত্মার মূর্ত প্রকাশ। এই অনুমান সিদ্ধ হয় প্রথমত মৃত্যুর কুশপুত্তলিকার খ-িত অংশগুলো উদ্ভিদ শস্য এবং পশুদের ওপর জীবনদায়ী, উর্বরতাকামী প্রভাব ফেলে এমন বিশ্বাস দ্বারা। এই বইয়ের প্রথমদিকের এক অধ্যায়ে আমরা দেখেছি এই প্রভাব তরু-আত্মার এক বিশেষ গুণ। দ্বিতীয়ত এই অনুমান প্রমাণিত হয়। এই রীতি দ্বারা যে মরণ মূর্তিকে কখনো তাজা পল্লবে সাজানো হয়, কখনো বানানো হয় ডালপালা কঞ্চি শন কিংবা মাড়াই করা ভুট্টার আঁটি দিয়ে; আবার কখনো মূর্তিটাকে ছোটো গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে মেয়েরা বহন করে নিয়ে যায় সেলামির পয়সা জোগাড় করতে করতে। ঠিক এরকমই করা হয়ে থাকে মে বৃক্ষ এবং মে কন্যার বেলায়, এবং বসন্ত তরু এবং এর সঙ্গে যুক্ত পুতুলের বেলায়। সংক্ষেপে তাই বলা যায় যে আমাদের মৃত্যুর বহিষ্কার এবং বসন্তকে আনয়ন অন্তত কিছু কিছু ক্ষেত্রে আসলে উদ্ভিদাত্মার মরণ এবং বসন্তের পুনর্জাগরণেরই বিষয়। বুনো মানুষ যে খুন এবং পুনর্জাগরণের নাটক করত, সেও ওই একই ব্যাপার। উৎসবে দাফন এবং পুনর্জাগরণের ঘটনাটিও সম্ভবত একই বিশ্বাসের আরেক প্রকাশ। গোময় স্তূপের নিচে উৎসবের প্রতিনিধিকে সে সমাহিত করা হতো তা স্বাভাবিক মনে হবে যদি সে মৃত্যু মূর্তির ওপর যে উর্বরতা এবং জীবনদায়িনী গুণ আরোপ করা হয় তার অধিকারী হয়। বাস্তবিকই এস্থোনিয়ানরা যে স্রোভ সানডেতে কুশপুত্তলিকা নিয়ে যায় গ্রামের বাইরে তারা কিন্তু একে উৎসব বলে না, বলে বৃক্ষাত্মা (*মেটসিক*), এবং ওরা ওই খড়ের মূর্তির সঙ্গে বৃক্ষাত্মাকে এক করে দেখে যখন বনের গাছের মগডালে ওই মূর্তি নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখে। সেখানে তা বছরখানেক থাকে এবং ওই এক বছর প্রায় প্রতিদিনই তার নিচে গিয়ে লোকে পূজা অর্ঘ্য দেয়, মানত করে যেন ঘরের পশুগুলো রোগবালাই থেকে মুক্ত থাকে। সত্যিকার বৃক্ষাত্মার মতো *মেটসিক*ও গবাদিপশুর রক্ষাকর্তা। কখনো এই মেটসিককেও বানানো হয় খড়বিচালি ভুট্টার আঁটি দিয়ে।

এভাবে তাহলে আমরা অনেকটা নিশ্চিতই মনে করতে পারি যে কার্নিভাল উৎসব, মৃত্যু এবং বসন্ত এই নামগুলি আমরা এতক্ষণ যা নিয়ে আলোচনা করছি সেইসব কৃত্যপ্রথায় প্রাণ পাওয়া বা প্রতিমূর্ত হওয়া অস্তিত্বেরই তুলনামূলকভাবে পরবর্তীকালের অপর্যাপ্ত প্রকাশ। এই নামের বিমূর্তভাব থেকেই বোঝা যায় ওরা অনেকটা আধুনিক সময়ের; কারণ সময় এবং ঋতুর নাম যখন কার্নিভাল এবং

বসন্ত, অথবা আরেকটি বিমূর্ত ধারণা যেমন মৃত্যু– এগুলো আদিম হতে পারে না। কিন্তু কৃত্যানুষ্ঠানগুলো স্বয়ং একটা আদিকালের ব্যাপার যার সময় নিরূপণ অসম্ভব। এজন্য একথা অনুমান করা ছাড়া উপায় নেই যে আদিতে হয়ত এইসব কৃত্যের ধারণা আরো সহজ এবং বস্তুলগ্ন ছিল। বৃক্ষের ধারণা হয়ত কোনো বিশেষ জাতের বৃক্ষের ধারণা (কোনো কোনো বুনো জাতির কাছে গাছপালার সাধারণ কোনো নামই নেই), কিংবা কোনো একটি গাছের ধারণা যথেষ্ট বাস্তব এবং এ থেকেই ক্রমে সাধারণীকরণ পদ্ধতিতে মানুষ উদ্ভিদের আত্মার ধারণায় পৌছতে পারে। কিন্তু উদ্ভিদ জগতের এই সাধারণ ধারণা যে ঋতুতে এর উদ্ভব সেই ঋতুর সঙ্গে সহসাই এক সাংঘর্ষিক সম্পর্কে নীত হয়। এজন্য বসন্ত, গ্রীষ্ম বা মে বৃক্ষাত্মা বা উদ্ভিদাত্মার জন্য এক সহজ ও স্বাভাবিক বিকল্প। আবার মুমূর্ষু বৃক্ষ বা মুমূর্ষু উদ্ভিদজগৎ সাধারণভাবে মৃত্যুর প্রতিকল্প হিসেবে ধারণা জাগাতে সক্ষম। এজন্য মুমূর্ষু বা মৃত উদ্ভিদকে বসন্তকালে বহন করে দাফন করা এক অর্থে এর পুনর্জাগরণের পূর্বশর্ত। এবং সময়ে এই বিশ্বাসই মৃত্যুকে গ্রাম বা জেলা থেকে খেদানোর কৃত্য হিসেবে বিস্তার লাভ করেছে। এইসব বসন্ত উৎসবে মৃত্যু মানে মূলত শীতের মুমূর্ষু বা মৃত উদ্ভিদ– এমন বক্তব্যের জোরালো সমর্থন মেলে ডব্লিউ ম্যানহার্ডের লেখায়; তিনি পাকা ভুট্টাকে যে মরণ নামে ডাকা হয় তার তুলনা দিয়ে ব্যাপারটা নিশ্চিত করেছেন। সাধারণভাবে পাকা ভুট্টার আত্মাকে মৃত নয় বৃদ্ধ মনে করা হয়; এবং এ থেকেই তাকে বলা হয় বুড়ো মানুষ বা বুড়ো মেয়ে মানুষ। কিন্তু কোথাও কোথাও ফসলের মৌসুমে কর্তিত শেষ শিষটিকে যাকে সাধারণত মনে করা হয় ভূট্টাত্মার আসনখানি, তো সেই কাটা শীষটিকে ডাকা হয় 'মৃতশিষ'। তখন বাচ্চাদের বারণ করা হয় ভুট্টা ক্ষেতে যেতে। কারণ মৃত্যু আসন পেতে বসেছে ভুট্টায়; এবং ট্রানসিলভানিয়ায় জনার কাটার সময় স্যাক্সন বাচ্চারা যে একটা খেলা খেলে তাতে মৃত্যুর ভূমিকায় যে ছেলেটি খেলে তার শরীর জনারপত্রে সম্পূর্ণ ঢাকা থাকে।

৫.শীত-বসন্তের লড়াই

কৃষি সমাজের জনপ্রিয় প্রথায় কখনো কখনো শীতকালে উদ্ভিদের সুপ্ত ক্ষমতা এবং বসন্তে তার উদগত প্রাণশক্তির যে বৈপরীত্য তা নিয়ে নাট্য কুশীলবদের যারা শীত এবং বসন্তের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তাদের মধ্যে জোর দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। সুইডেনের শহরগুলোয় মে-দিবসে দু পক্ষের যুবকেরা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে মুখো-মুখি দাঁড়াত যেন মরণযুদ্ধে অবতীর্ণ। একপক্ষ ফারবস্ত্রে আচ্ছাদিত শীতের একজন প্রতিনিধির পেছনে দাঁড়ানো। এরা বরফের বল আর বরফকুচি ছিটাত যেন শীতকাল দীর্ঘায়িত হয়। অন্যপক্ষ নবপল্লব আর পুষ্পে সজ্জিত এক প্রতিনিধির নেতৃত্বে যুদ্ধে শরিক হতো। যে যুদ্ধযুদ্ধ খেলায় ওরা নিয়োজিত হতো তাতে বসন্তের দল বিজয়ী হতো এবং অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটত একটা ভোজের মাধ্যমে। একইভাবে, মধ্য রাইন নদীর চরাঞ্চলে আইভি লতায় জড়ানো বসন্ত প্রতিনিধি খড়কুটো আর শৈবাল পরা শীতের নারদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামে এবং শেষে জয়ও পায়। পরাজিত শত্রুকে জমিনে পাকড়ে ফেলে তার বিচালির আচ্ছাদন খুলে নেওয়া এবং তা ছিঁড়ে কুটিকুটি করে চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ওদিকে দুজনেরই যুবা সহযোদ্ধারা শীতের পরাজয় এবং বসন্তের বিজয় উৎসব পালন করে। পরে তারা বসন্তের মালা বা পাখাপল্লব নিয়ে দ্বারে দ্বারে গিয়ে ডিম আর শুয়োরের গোস্ত আদায়

করে। কখনো আবার বসন্তের বিজয়ী বীরের ভূমিকায় অবতীর্ণ ব্যক্তি পুষ্প পল্লবে সজ্জিত হয়ে মাথায় ফুলের মুকুট পরে হাজির হয়। রাইন প্রদেশাঞ্চলে এই লড়াইয়ের নাটক শুরু হয় লেন্ট উৎসবের চতুর্থ রোববার। বাভারিয়ার সর্বত্রই ওই একই নাটক অভিনীত হতো একই দিনে, এবং এই সেদিনও ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি কি তারপরও কোথাও কোথাও এই নাটকের চল ছিল। বসন্ত যখন সবুজ সজ্জায় ঝটপট নড়া ফিতের সমারোহে হাতে একটা ফুলের ডাল ভেঙে কিংবা ছোটো একটা গাছে আপেল এবং নাশপাতি ঝুলিয়ে বার হতো তখন শীত বেচারা ফারবস্ত্র আর কস্তকারণী পরে থাকত এবং একটা বরফ সাফ করার কোদাল আর একটা মন্তনী বা মাড়াই যন্ত্র হাতে নিয়ে বার হতো। ওদের নিজের নিজের সাঙ্গপাঙ্গের পরনেও উপযুক্ত বস্ত্র সমাহারে শীত আর বসন্ত গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত, বাড়ি বাড়ি থামত, গাইত পুরোনো জানা গানের স্তবক। প্রতিদানে মিলত রুটি, ডিম আর ফলমূল। শেষে সংক্ষিপ্ত এক লড়াইয়ের পর বসন্ত পেটাত শীতকে অথবা হৈ গ্রামেই দাবিয়ে রাখত অথবা হৈল্লা ঠাট্টা বিদ্রুপ করে বনের মধ্যে তাড়িয়ে দিত।

অস্ট্রিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে একটি অঞ্চল গোপফ্রিৎস। সেখানে স্রোভ টুইসডে-তে দুজন লোক বসন্ত ও শীতের বেশ ধরে দ্বারে দ্বারে যেত। বাচ্চারা মহা আনন্দে ওদের বরণ করত। বসন্তের প্রতিনিধি পরতো সাদা কাপড় এবং তার হাতে একটা কাস্তে; তার প্রতিপক্ষ কমরেড যে নামত শীতের প্রতিনিধি হয়ে, তার মাথায় থাকত কার টুপি, তার বাহুতে এবং পায়ে জড়ানো থাকত বিচালি এবং তার হাতেও থাকত একটি জড়ানো মাড়াই যন্ত্র। বাড়ি বাড়ি তারা কবিতা আবৃত্তি করত একবার এদল একবার সেদল– এভাবে। ব্রান্সউইক প্রদেশের ডমলিং অঞ্চলে আজও শীত গ্রীষ্মের ওই লড়াই প্রতি বছরই পালিত হয়। হুইট সানটাইডে একদল ছেলে আর একদল মেয়ে এই পালাটুকু করে থাকে। শীত তাড়াতে ছেলের দল বাড়ি বাড়ি যায় গান গেয়ে, হল্লা করে, বাজনা বাজিয়ে। ওদের পরে আসে মেয়ের দল। এরা মিহিসুরে গান করে এবং একজন মে-বধূর নেতৃত্বে ওরা জমকালো পোশাকে বসন্তের আগমনী বার্তা জানাতে ফুল ফুল্লরায় সজ্জিত হয়। পূর্ববর্তীকালে শীতের পালাটা করত এক খড়মানব। বালকেরা তাকে বহন করে নিয়ে যেত। কিন্তু বর্তমানে একজন জ্যান্ত মানুষই ছদ্মবেশে এই অভিনয়টুকু করে থাকে।

উত্তর আমেরিকার এস্কিমোদের মধ্যে গ্রীষ্ম শীতের লড়াকুদের অনুষ্ঠান আজও একটি কুহকী বাতাবরণেই পালিত হয়, যদিও ইউরোপে বহু আগেই তা একটি সাধারণ নাট্যানুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছে। তো আমেরিকার এস্কিমোরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে চাইত। শরতে যখন ঝড় ঝঞ্ঝায় মনদমানো আর্কটিক শীতের আগমনী বার্তা রটে যেত তখন এস্কিমোরা নিজেদের দুদলে ভাগ করত। একদলের নাম টার্মিগান বা শীতের পাখি, আর অন্যদলের নাম হাঁস। টার্মিগানদের দলে থাকে তারাই যাদের জন্ম শীতকালে আর হাঁসের দলে তারা যাদের জন্ম গ্রীষ্মে। সিল মাছের চামড়া থেকে তৈরি একটা রশি বেছানো হয়। তখন দুই দলে দুই প্রান্ত ধরে দড়ি টানার প্রতিযোগিতা চলে তাবৎ শক্তিকে দিয়ে কাকে টেনে আনতে পারে। যদি টার্মিগানরা হারে তো গ্রীষ্ম জিতবে এবং সারা শীতকাল বেশ চনমনে আবহাওয়া থাকবে বলে মনে করা হয়।

৬. কস্ট্রুবাঞ্চোর অন্তর্ধান ও পুনরাবির্ভাব

'কার্নিভাল উৎসবের দাফন' এবং 'মৃত্যু বহন' জাতীয় অনুষ্ঠান রাশিয়াতে মৃত্যু বা কার্নিভালের নামে হয় না। সেখানে কিছু কিছু পৌরাণিক চরিত্র যেমন, কস্ট্রোমা, কুপালো, লাদা, এবং ইয়ারিলো ইত্যাদি নামে এই পর্বটি পালিত হয়। রাশিয়ার এইসব পর্ব বসন্তে যেমন তেমনি মধ্য গ্রীষ্মেও আয়োজিত হতো। এভাবে লিটল রাশিয়ায় (ইউক্রেন, পোল্যান্ড, রুমানিয়ার সংলগ্ন অঞ্চল) ইস্টারটাইডের সময় বসন্তরানি কস্ট্রুবাঞ্চোর দাফন সম্পন্ন হতো। একটা মেয়ে মড়ার মতো শুয়ে থাকে মাটিতে। একদল গায়ক তখন তাকে ঘিরে ঘিরে গান করে :

'মরেছে রে কস্ট্রুবাঞ্চো, মরেছে এবার
মরেছে, মরেছে প্রিয় ভগিনি আমার!'
একটু পর মেয়েটা তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। তখন কোরাস আবার সুর পাল্টায় :
'বাহারে দ্যাখ কস্ট্রুবাঞ্চো জাগে পুনর্বার
জাগে রে জাগে রে প্রিয় ভগিনী আমার!'

সেন্ট জনের সন্ধ্যায় (মধ্য গ্রীষ্মের জুন সন্ধ্যা) খড়-বিচালি দিয়ে কুপালোর মূর্তি বানানো হয় এবং 'তাতে মেয়ে মানুষের সাজ পরায়, গলায় নেকলেস থাকে, মাথায় থাকে ফুলের মুকুট। এরপর কাটা হয় এক গাছ। গাছটাকে যাকে রঙিন ফিতেয় সাজিয়ে একটা খোলা জায়গায় স্থাপন করা হয়। এই গাছের নাম মারেনা [শৈত্য বা মরণ]। এর পাশে বসানো হয় বিচালি মূর্তিকে, সঙ্গে দেয় একটা টেবল যার ওপর রাখে চোয়ানি মদ আর কিছু খাবার। এরপর সেখানে একটা বনফায়ার জ্বালানো হয় এবং যুবক-যুবতীরা মূর্তিটা নিয়ে জোড়ায় জোড়ায় ওই আগুনের ওপর দিয়ে লাফায়। পর দিন ওরা ওই গাছ এবং মূর্তি থেকে সব সাজগোজ খুলে দুটোকেই নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়।' রাশিয়ায় সেন্ট পিটার দিবসে অর্থাৎ উনত্রিশে জুনে কিংবা পরের রোববার 'কস্ট্রোমার সৎকার কর্ম' অথবা লাদা বা ইয়ারিলোর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পেঞ্জা এবং সিমবার্সকে প্রশাসনিক অঞ্চলে এই সৎকার সম্পন্ন হতো এভাবে : আটাশে জুনে একটা অগ্নিকু- সাজানো হতো। পরদিন মেয়েরা তাদের একজনকে নির্বাচিত করতো কস্ট্রোমার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে। গভীর ভক্তি শ্রদ্ধায় তার সঙ্গীরা তাকে অভিবাদন করত, একটা তক্তার ওপর তাকে ওঠাত এবং কোনো স্রোতস্বিনীর ধারে বহন করে নিয়ে যেত। সেখানে জলে নেমে তাকে স্নান করানো হতো। তখন বয়োজ্যেষ্ঠা মেয়েটি লেবুগাছের বাকল দিয়ে একটা ঝুড়ি বানিয়ে তাতে তবলার মতো পেটাত। এরপর সবাই গ্রামে ফিরে বাকি দিনটা শোভাযাত্রা, খেলাধুলা করে, নেচে গেয়ে কাটাত। মুরোম জেলায় একটা বিচালি মূর্তিকে মেয়েদের পোশাক পরিয়ে ফুলহারে সাজিয়ে কস্ট্রোমা হিসেবে গড়া হতো। এরপর সেটাকে গরুর জাবনার চারিতে বসিয়ে গানবাজনা সহযোগে নেওয়া হতো কোনো হ্রদ বা নদের ধারে। সেখানে গিয়ে শোভাযাত্রা দুদলে ভাগ হয়ে যেত। একদল মূর্তিটাকে আক্রমণ করত, অন্য দল বাঁচাতে চাইত। শেষ পর্যন্ত আক্রমণকারীদেরই জয় হতো। ওরা মূর্তির পা থেকে সাজসজ্জা খুলে ফেলত, খোদ মূর্তিকেই ভেঙে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করত এবং পায়ের নিচে খড়াবিচালি মাড়িয়ে খচিয়ে জলে দিত ভাসিয়ে। ওদিকে মূর্তিরক্ষাকারী দল তখন হাতে মুখ ঢেকে ভান

করত যেন কস্ট্রোমার অবসানে কতই না কান্নাকাটি আহাজারি করছে। কস্ট্রোমার জেলায় ইয়ারিনোর দাফন সম্পন্ন হতো উনত্রিশে অথবা ত্রিশে জুন। লোকে এক বুড়োকে নির্বাচিত করে তাকে ছোটো একটা কফিন দিত যাতে থাকত ইয়ারিনোর প্রতিনিধিত্বকারী শিশ্নাকার এক মূর্তি। বুড়ো এই কফিন বহন করে নিয়ে যেত শহরের বাইরে। পিছে পিছে যেত মেয়েরা শোকগীতি গেয়ে, হাত পা ছুড়ে হাহুতাশ, আহাজারি করতে করতে। খোলা একটা মাঠে তখন কবর খোড়া হতো তাতে বিপুল কান্নাকাটির মাঝে নামানো হতো মূর্তিটাকে। এরপর শুরু হতো খেলাধুলা আর নাচগান। এসবই 'প্রাচীনকালে পৌত্তলিক স্লাভদের সৎকারকালীন খেলাধুলার কথা মনে করিয়ে দিত'। লিটল রাশিয়ায় ইয়ারিনোর ওই মূর্তি কফিনে শোয়ানো হতো এবং সূর্যাস্তের পর একদল মাতাল মেয়ে সমভিব্যাহারে পথে পথে ঘুরিয়ে নেওয়া হতো। মেয়েগুলো বিলাপের স্বরে ইনিয়ে বিনিয়ে বলতেই থাকত, 'ওরে নাই, নাইরে নাই, সে মরে গেছে, গেছে মরে।' এরপর পুরুষেরা ওই মূর্তিটা উঠিয়ে খুব করে ঝাঁকাত যেন ওটাকে আবার বাঁচাবার চেষ্টা করছে। তখন মেয়েদের উদ্দেশে ওরা বলত, 'মেয়েরা, তোমরা কেঁদো না তো বাবা। আমি জানি মধুর চেয়েও মিষ্টি কিবা।' কিন্তু কে শোনে কার কথা, মেয়েরা সৎকারের সময় যেমন বিলাপ করে তেমনি বিলাপ করেই চলে। 'কি দোষ ছিল তার, আহারে মানুষটা কি ভালোই না ছিল গো। ও, আর তো সে জাগবে না কোনো দিনও। ও, কীভাবে থাকব তোমাকে ছাড়া? তোমাকে ছাড়া বেঁচেই বা হবেটা কি? জাগো, ক্ষণিকের তরে হলেও জাগো। ও, কই সে তো জাগে না, জাগে না রে ।' শেষ পর্যন্ত ইয়ারিনোকে একটা কবরে দাফন করা হয়।

৭. *উদ্ভিদের মরণ ও পুনর্জাগরণ*

রাশিয়ার এইসব পালাপার্বণের ধরন অস্ট্রিয়া আর জার্মানিতে যা 'মৃত্যুর শবযাত্রা' নামে পরিচিত তারই মতো। তাহলে মৃত্যুর দাফনের যে ব্যাখ্যা এতক্ষণ দেওয়া হলো তা যদি সঠিক হয় তো রাশিয়ার কস্ট্রুবাঞ্চো, ইয়ারিলো ইত্যাদি নিশ্চয় শুরুতে উদ্ভিদের আত্মাই ধারণ করত, এবং তাদের মৃত্যুও নিশ্চয় তাদের পুনরাবির্ভাবের পূর্বশর্ত হিসেবে মনে করা হতো। মৃত্যুর পর পুনর্জাগরণের অভিনয়টুকু কস্ট্রুবাঞ্চোর অন্তর্ধান ও পুনরাবির্ভাবের প্রথম উৎসবে করে দেখানো হয়। কোনো কোনো রুশ উৎসবে উদ্ভিদাত্মার মৃত্যু যে মধ্যগ্রীষ্মে

> "উদ্ভিদের মরণ এইসব বসন্ত ও মধ্যগ্রীষ্মের সব অনুষ্ঠানেই দেখানো হয়, তবে এর পুনর্জাগরণও দেখানো হয় কোনো কোনোটাতে। কিন্তু এদের কোনোটাতে এমন কিছু উপাদান চোখে পড়ে যা আমাদের এই বিশ্লেষণে দেখানো সম্ভব নয়"

পালন করা হয় তার কারণ এই যে মধ্যগ্রীষ্ম থেকেই গ্রীষ্মের অবসান শুরু হয়। এরপর থেকে দিন ছোটো হয় এবং সূর্য তার নিম্নাভিমুখী যাত্রায় ক্রমেই সরে যেতে থাকে :

'আঙ্কারি খাত গিরি গুহার পানে
যেথায় শীতের সুপ্ত তুষার টানে।'

বছরের এরকম একটি ক্রান্তিলগ্নে যখন উদ্ভিদ জগতে গ্রীষ্মের মাত্র কিংবা বলা চলে প্রায় অদৃশ্য অবক্ষয় শুরু হয়েছে, তখনই হয়ত বুনো মানুষের মনে হয়েছে যে ওইসব জাদুকৃত্য পালনের মাধ্যমে অবক্ষয়কে ঠেকানো কিংবা নিদেনপক্ষে পু-নরাবির্ভাবকে নিশ্চিত করার এটাই মোক্ষম সময়।

উদ্ভিদের মরণ এইসব বসন্ত ও মধ্যগ্রীষ্মের সব অনুষ্ঠানেই দেখানো হয়, তবে এর পুনর্জাগরণও দেখানো হয় কোনো কোনোটাতে। কিন্তু এদের কোনোটাতে এমন কিছু উপাদান চোখে পড়ে যা আমাদের এই বিশ্লেষণে দেখানো সম্ভব নয়। উপকারী উদ্ভিদাত্মার মৃত্যুতে যে গম্ভীর সৎকার কৃত্য পালন করা হয়, যে বিলাপ আহাজারি করা হয়, যে শোকবস্ত্র পরিধান করা হয়– হ্যাঁ সবই উপযুক্ত। কিন্তু যখন কুশ-পুত্তলিকাকে বহন করা হয় তখন যে আনন্দ স্ফূর্তি করা হয়, তারপর লাঠিসোটা ইটপাথর দিয়ে তাকে মারা হয়, এবং যে বিদ্রুপ ঠাট্টা মস্করা করা হয় তার ব্যাখ্যা কি? আবার পুত্তলিকাকে দাফন করার পর যে ত্রাসের সঙ্গে ত্বরা করে বহনকারীরা চোঁচা দৌড়ে ঘরে ফেরে, এবং সেই বিশ্বাস যে কেউ একজন সেই বাড়িতে মারা যাবে যে বাড়ির দিকে পুত্তলিকা নজর দিয়েছে– এসবেরই বা ব্যাখ্যা কি? ভয়ভীতি ত্রাসকে না হয় ব্যাখ্যা করা যায় এভাবে যে উদ্ভিদের মৃত আত্মায় এক ধরনের সংক্রামণ থাকে যার বিস্তার বিপজ্জনকই বটে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা মৃত্যুকে বহন করার সময় যে ফুর্তি করা হয় তার সঙ্গে যায় কীভাবে? তাহলে এইসব আচার অনুষ্ঠানের দুটো স্পষ্ট এবং আপাত বৈষম্যমূলক বৈশিষ্ট্য আমাদের স্বীকার করতে হবে : একদিকে মৃত্যুজনিত শোক এবং মৃত্যুর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা; অন্যদিকে মৃতের প্রতি ভয় ও ঘৃণা এবং মরণের ফলে আনন্দ উল্লাস। প্রথম বৈশিষ্ট্যকে আমি ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছি : এখন পরের বৈশিষ্ট্য প্রথমটির সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে গেল কেন সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে।

৮. ভারতের তুলনীয় কৃত্যাচার

ভারতের কানাগ্রা জেলায় বসন্তকালে কমবয়সী মেয়েরা একটা কৃত্যানুষ্ঠান পালন করে থাকে যার সঙ্গে আমাদের পূর্বালোচিত কয়েকটি বসন্ত উৎসবের বেশ মিল লক্ষ করা যায়। কানাগ্রার ওই উৎসবের নাম *রালি কা মেলা* বা রালির মেলা। রালি হলো শিব বা পার্বতীর একটা খুদে মাটির মূর্তি। কানাগ্রার সর্বত্রই এই প্রথা প্রচলিত এবং এর উদযাপন পুরোপুরি যুবতী মেয়েদের মধ্যেই সীমিত। এই উৎসব চলে চৈত্রের (মার্চ-এপ্রিল) অধিকাংশ সময় এবং বৈশাখ সংক্রান্তিতে (এপ্রিল)। মার্চের এক ভোরবেলা গাঁয়ের ডপকা মেয়েরা সবাই ছোটো ছোটো ঝুড়িতে করে দূর্বাঘাস এবং ফুল নিয়ে নির্দিষ্ট একটি স্থানে যায়। সেখানে গিয়ে ওরা এক জায়গায় সেগুলো স্তূপাকারে ফেলে। এই স্তূপ ঘিরে ওরা দাঁড়ায় এবং গান করে। দশদিন ধরে প্রতিদিন এই আচার পালিত হয় যতক্ষণ না ঘাস আর ফুলের স্তূপ যথেষ্ট উঁচু

হয়েছে। এরপর ওরা জঙ্গলে গিয়ে দুটো শাখা ভেঙে আনে। প্রত্যেক শাখার মাথায় থাকে তিনটে চেরা। ওরা এখন ডাল দুটোকে চেরা অংশ নিচের দিকে ত্রিভুজ করে ফুলের স্তূপে পুঁতে দেয়। ফলে এখন সেখানে দুটো তেপায়া পিরামিডের সৃষ্টি হয়। এই শাখা দুটোর ওপরের যে একক একটা করে চোখা কোণ আছে সেখানে ওরা কুমোরকে দিয়ে মাটির দুটো মূর্তি বানিয়ে গেঁথে রাখে। একটা মূর্তি শিবের অন্যটা পার্বতীর। মেয়েরা তখন নিজেরাই দুভাগে ভাগ হয়ে একদল শিবকে অন্যদল পার্বতীকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং মূর্তিদ্বয়কে স্বাভাবিকভাবে বিয়ে করে। এই উৎসবের কোনো আচার বাদ যায় না। বিয়ের পর চলে ভোজ। এই ভোজের খরচ ওরা সাধারণত বাবা-মার কাছ থেকে চেয়েচিন্তেই নিয়ে নেয়। এরপর পরবর্তী বৈশাখ সংক্রান্তিতে ওরা সবাই যায় নদীর ধারে, গিয়ে মূর্তি দুটো গভীর জলে ফেলে দেয়, এবং ওই স্থানে বসেই কান্নাকাটি করে; ভাবখানা যেন সৎকারের কৃ ত্যাদি পালন করছে। পাড়ার ছেলেরা ওদের নিয়ে হাসাহাসি করে, মূর্তিগুলো ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ওরা জলে লাফ দিয়ে মূর্তিগুলো উদ্ধার করে। এবং মেয়েদের মুখের ওপর ধরে নাড়তে থাকে। ওদিকে মেয়েরা তখন আগে টানা মরক ওঠে বলে, এই ফেলার উদ্দেশ্য বলা হয় ভালো একটা স্বামীর ব্যাপারটি নিশ্চিত করা।

ভারতের এই উৎসবে শিব এবং পার্বতী যে স্বয়ং উদ্ভিদাত্মা তা প্রমাণিত হয় এভাবে যে ওদের মূর্তি বৃক্ষশাখায় গেঁথে ঘাস আর ফুলের স্তূপের ওপর স্থাপন করা হয়। ইউরোপীয় লোকপ্রথার মতো দেখি এখানেও উদ্ভিদজগতের আত্মারামকে দুভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে, বৃক্ষের মাধ্যমে এবং পুত্তলিকার মাধ্যমে। ভারতের এই দুই দেবদেবীর বসন্তকালীন পরিণয় ইউরোপের মে-রাজা ও মে-রানি, মে-বধূ, মে-বর ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশিত উদ্ভিদ দুনিয়ার বাসন্তী আত্মার বিবাহের সঙ্গে বেশ মেলে।

উপরন্তু দেবদেবীর মূর্তি খরস্রোতায় ভাসিয়ে দেওয়ার এবং সেজন্য আহাজারি করার ব্যাপারটিও ইউরোপীয় রীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেখানে মরণ ইয়ারিলো, কস্ট্রোমা ইত্যাদি নামে উদ্ভিদের মৃত সত্তাকে জলে ভাসিয়ে হাহুতাশ করা হয়। আবার, ইউরোপের মতো ভারতেও এই কৃত্য মূলত মেয়েরাই সম্পন্ন করে। এখন এই উৎসবের মাধ্যমে মেয়েদের জন্য পতিদেব প্রাপ্তির সম্ভাবনা বাড়ে– এমন ধারণা ব্যাখ্যা করা যায় এভাবে যে উদ্ভিদাত্মার তো মানব জীবনে তথা উদ্ভিদ জগতেও চটজলদি উর্বরতাদানের ক্ষমতা রয়েছে।

৯. জাদুর বসন্ত

এইসব এবং এদের মতো আরও বহু উৎসব অনুষ্ঠান সম্পর্কে সা

দারণ যে ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করতে পারি তা হলো এরা বর্তমানে কিংবা অতীতে অবিকৃত অবস্থায় ছিল জাদুর কৃত্য এবং এদের উদ্দেশ্যই ছিল বসন্তে প্রকৃতিকে আবার জাগানো। যে উপায়ে তারা এই কাজটি করতে চাইত তা হলো অনুকরণ করা, সমমর্মিতা জ্ঞাপন করা। প্রকৃতিতে আসলেই কি ঘটে সে সম্পর্কে বুনোমানুষ ছিল অজ্ঞ এবং এর ফলেই সে বিশ্বাস করত তার জীবন নির্ভর করছে যে বিশাল প্রাকৃতিক নিয়মনীতির ওপর তাদের সম্ভব করতে গেলে কিছু না তাদের অনুকরণ করলেই চলবে। এবং তখন সঙ্গে সঙ্গে কোনো এক গোপন সমমর্মিতা বা দুর্জ্ঞেয়

প্রভাবে যে ক্ষুদ্র নাটক বনের কুঞ্জে বা পর্বতের উপত্যকায় বসে, সমতট মরুতে বা বায়ুতাড়িত সৈকতে বসে সে সম্পাদন করছে তা অন্য কোথাও বৃহত্তর এক নাট্য মঞ্চে, আরো জবরদস্ত কুশীলব দ্বারা সম্পাদিত হবে। তার কল্পনায় সে দেখে যে পত্রপল্লব ফুলফুল্লরায় অভিনয় করে সে নগ্ন ধরণীকে আবার পত্রপল্লবে আচ্ছাদিত করতে পারে, এবং মৃত্যু ও শীতকে সমাহিত করার ভূমিকায় অভিনয় করে সে বিমর্ষ ঋতুকে বিতাড়িত করবে এবং বসন্তের আগমনী পদচারণার জন্য পথ করবে নিষ্কণ্টক। আমরা যদি কল্পনায়ও বুনোমানুষের এই ধরনের মানসিক বাতাবরণে নিজেদের খাপখাওয়ানো খুব কষ্টকর মনে করি তো অন্তত একটা সহজ উপায়ে বুনোর উদ্বেগাকুল মনমানসিকতা বুঝতে পারি যখন সে প্রথম জান্তার প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে নিজের চিন্তাভাবনাকে নিয়ে গিয়ে প্রকৃতির নিয়মলীলার কার্যকারণ নিয়ে ভাবতে শুরু করল আমরা এখন যাকে বলি প্রকৃতির নিয়ম নিয়ম সম্পর্কে চিন্তা ভাবনায় নিয়োজিত হলো। আজ আমরা মহাজাগতিক ব্রহ্মা-এর নিয়মকানুনের নিয়মানুবর্তিতা আর সামঞ্জস্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, যেসব কারণে ব্রহ্মা-এর ব্যাপারগুলো ঘটে তারা হঠাৎ করেই অন্তত অদূর ভবিষ্যতে অদৃশ্য হবে এমন আশঙ্কা করার তেমন কারণ এখন নেই। কিন্তু প্রকৃতির এই স্থিরতার ওপর বিশ্বাস জন্মেছে দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণ এবং দীর্ঘ ঐতিহ্যের অভিজ্ঞতা থেকে; কিন্তু বুনোমানুষের জগৎ এবং পর্যবেক্ষণের সুযোগ সংকীর্ণ, তার ঐতিহ্যও ক্ষণকালের। প্রকৃতির ক্রমাগত তোলপাড় আর মুহুর্মুহু ভয়াল মূর্তির মোকাবিলায় যে অভিজ্ঞতা তাকে শান্ত করতে পারত সেই অভিজ্ঞতারই তার অভাব। তাহলে সে যে গ্রহণ লাগলে দিশেহারা হবে এবং যদি সে রাক্ষসের গ্রাস থেকে আকাশের জ্যোতিষ্কদের বাঁচাতে সেদিকে তার নড়বড়ে পুচকে ট্যাটা না ছোড়ে কিংবা হইচই না বাধায় তো চাঁদ সুরুজ অবধারিত ধ্বংস– হবে এমনই সে মনে করবে তাতে আর আশ্চর্য কি! আবার যখন রাতের অন্ধকারে আকাশের একটা চিলতে অংশ যখন ধূমকেতুর আলোয় দপ করে জ্বলে উঠত কিংবা আসমানের পুরো তোরণই যখন উত্তর গোলার্ধের হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত তখন সে যে ত্রাসে কম্পমান হবে তাতেই বা আশ্চর্য কি! এমনকি যেসব বৈশিষ্ট্য একটা নির্দিষ্ট সময় নিয়মিত বিরতি দিয়ে ঘটে তাতেও বুনোর সন্দেহ যায় না যতদিন না সে এদের মধ্যে একটা নিয়মশৃঙ্খলা দেখতে পায়। এখন সে কত দ্রুত বা বিলম্বে এইসব পর্যাবৃত্ত, আবর্তনশীল প্রাকৃতিক ঘটনা বুঝবে তা প্রধানত নির্ভর করে বিশেষ চক্র কত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় তার ওপর। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মেরু অঞ্চল বাদ দিলে দিবস রজনীর চক্র সর্বত্রই চলছে। চক্র এত সংক্ষিপ্ত এবং ঘনঘন যে মানুষ খুব তাড়াতাড়ি এদের আবির্ভাবের ব্যাপারে কোনো ভয়শঙ্কার ধার ধারত না, যদিও অবশ্য আমরা দেখেছি প্রাচীন মিশরের মানুষ প্রতিদিন পূর্বদিগন্তে সেই জ্বলন্ত অগ্নিকু-কে ফিরিয়ে আনার জন্য মন্ত্রতন্ত্র পড়ত যে আগের দিন সন্ধ্যায় রক্তিম পশ্চিম দিগন্তে ডুবে গেছে। কিন্তু ঋতুবর্গের বার্ষিক চক্রের বিষয়টি একেবারে অন্যরকম। যে কারো কাছে পুরো একটি বছর বেশ দীর্ঘ সময় বিশেষ করে যখন মনে করা হয় যে আমাদের জীবনের বছর মাত্র কয়েকটি বৈতো নয়। আদিমকালের বুনো মানুষের কাছে তার দুর্বল স্মৃতিশক্তি এবং সময় মাপার নড়বড়ে উপায় নিয়ে একটি বছর এত বড়ো মনে হতে পারে যে সে হয়ত একে একটা চক্র হিসেবেই করতে অপারগ হতো। এবং স্বর্গমর্ত্যের পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যকে হয়ত অপার বিস্ময় নিয়েই অবলোকন করত– কখনো আমোদিত হয়ে, কখনো ভয়ে, কখনো উৎফুল্ল হয়ে, কখনো বিমর্ষ বিরাগে। এবং তাও নির্ভর করত আলো ও তাপের,

উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের উত্থানপতন তার আরাম আয়েশে কতটুকু সহায়ক নাকি তার অস্তিত্বেরই প্রতি হুমকিস্বরূপ তার ওপর। শরতের অরণ্যে যখন পাতাঝরানো ঝঞ্ঝায় শুকনো পাতা খসখস শব্দে ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করে উড়ে যেত তখন ওপরে রিক্ত শাখার দিকে তাকিয়ে সে কি নিশ্চিত হতো যে ওইসব নাঙ্গা ডালপালা আবার পত্রশোভিত হবে? দিনকে দিন সূর্য যখন আকাশে ক্রমেই হেলতে শুরু করে তখন কি সে নিশ্চিত বলতে পারত যে ওই অগ্নিগোলক আবার কবে তার নিয়মিত পথে যাত্রা শুরু করবে? এমনকি চন্দ্রকলার লীলা প্রতিরাতেই পূর্বদিগন্তে ক্রমে কাস্তের মতো বিষণ্ন চিকন হতে হতে এক সময় অদৃশ্য হয়ে হয়ত তার মনে এমন ভীতির উদ্রেক করত যে এরপর হয়ত আর চাঁদের দেখা মিলবেই না।

এইসব এবং এ ধরনের হাজারো শঙ্কা হয়ত তার মনে উঁকি দিত এবং মানসিক শান্তি করত বিঘ্নিত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-এর রহস্য নিয়ে সে তো তখন সবে ভাবতে শুরু করেছে, আগামীকালের ভাবনা ছাড়িয়েও হয়ত তখন সে আরও দূর ভবিষ্যতের কথা ভাবতে শিখেছে। এইসব ভাবনাচিন্তা, ভয়ভীতি নিয়ে তাহলে তো স্বাভাবিকভাবেই সে চাইবে যে বৃক্ষের নাঙ্গা শাখায় আবার সবুজ ফিরে আসুক, শীতের নিম্নগামী সূর্য আবার একটা দোল খেয়ে গ্রীষ্মের আকাশে তার উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হোক, এবং শীর্ণকায়া শশীর রুপোলি পিদিম আবার পূর্ণ চাকতিতে রোশ-নাই ছাড়ুক। বুনোর এই সাধআহ্লাদ পূরণের প্রয়াসে আমরা চাইলে হাসতে পারি, কিন্তু মানুষ দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। অনেকগুলোই নিশ্চিত হয় ব্যর্থ, কিন্তু এইসব পরীক্ষার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই সে বুঝতে পারে কোনো কোনোটার অসারতা, কোনোটার ব্যর্থতা। হাজার হলেও জাদুর আচার অনুষ্ঠান এমন কিছু পরীক্ষা যার ব্যর্থতা প্রমাণিত সত্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন এসবের পুনরাবৃত্তি করা হয় তার ইঙ্গিত ইতোমধ্যেই এই বলে দেওয়া হয়েছে যে জাদুর কর্তা ব্যর্থতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। জ্ঞানের প্রাগ্রসরতার সঙ্গে এইসব অনুষ্ঠান হয় একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে, নয়তো অভ্যাসের বশে ওদের চালু রাখা হলেও যে উদ্দেশ্যে তাদের সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্পর্কে বেমালুম ভুলে গেছে উৎসব পালনকারীরা। এভাবে গুরুত্বের উচ্চাসন থেকে এদের পতন ঘটেছে। যদিও এক সময় সম্প্রদায়ের মঙ্গল, এমনকি জীবনমরণের প্রশ্ন জড়িত ছিল এসব আচার অনুষ্ঠানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিয়ম মেনে পালনের সঙ্গে, এখন আর তাদের সেই মর্যাদা নেই। ক্রমে তারা সাধারণ উৎসব, মূকাভিনয় এবং বিনোদনে পরিণত হয়েছে। এভাবে কমতে কমতে শেষ পর্যায়ে বয়স্করা তাদের একেবারেই পরিত্যাগ করেছে এবং একসময় যা ছিল সাধুসন্তদের দারুণ গুরুত্বপূর্ণ পেশা তা এখন বাচ্চাদের নির্বোধ খেলার বস্তু। ইউরোপে আমাদের পূর্বপুরুষের জাদুর কৃত্যউৎসব অবক্ষয়ের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে আজ কোনোরকমে টিকে আছে। কিন্তু এই শেষ আশ্রয় থেকেও তারা দ্রুত বিতাড়িত হচ্ছে। নৈতিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক ইত্যাদি বহুমুখী শক্তির জোয়ার মানুষকে নতুন অজানা গন্তব্যে যেভাবে টানছে তাতে ওইসব পুরোনো কৃত্য আচারও কোথায় ভেসে চলে যাচ্ছে। এইসব আকর্ষণীয় খেয়ালি রীতিকেতা, এইসব বর্ণাঢ্য উৎসব আয়োজন শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে আমরা স্বাভাবিকভাবেই দুঃখ বোধ করি। কারণ বর্তমানের একঘেয়ে এই গদ্যময় যুগে কিছুটা হলেও এরা পুরোনো দিনের সুবাস আর সজীবতা নিয়ে আসে, পৃথিবীতে বসন্তকালীন এক পরশ সুবাতাস বয়ে আনে। তবু আমাদের দুঃখ হয়ত একটু কমবে যদি স্মরণ করি যে এইসব আনন্দ মেলা, এইসব নিষ্পাপ ফুর্তি মউজ আসলেই কিন্তু অজ্ঞতা আর

কুসংস্কারে গাঁথা। এরা যদি মানুষের কর্মযজ্ঞের দলিল হয় তো একথাও সত্যি যে পুরোটাই এক বিশাল অর্থহীন কর্ম, শ্রমের মহা অপচয় এবং আশাহতের প্রমাণ; এবং তাদের যত অলঙ্কার উপকরণ– ফুল লতা, রঙিন ফিতে, বাজনা, গান– সবই যত না প্রহসন তার চেয়ে অনেক বেশি বিয়োগান্তক নাটক।

ডব্লু মানহার্টের অনুকরণে এতক্ষণ এইসব উৎসবপর্বাদির যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমি দিয়েছি তা এই বই যখন প্রথম লেখা হয় তারপর থেকে আরও একটি আবিষ্কারের মাধ্যমে বলা যায় বেশ জোরেশোরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই আবিষ্কৃত তথ্য হলো মধ্য-অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা ওদের দেশের বসন্তকাল সমাগত হলে প্রকৃতির সুপ্ত জীবনী শক্তিকে জাগাবার জন্য নিয়মিত জাদু অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। মধ্য-অস্ট্রেলিয়ার মরু অঞ্চলে প্রকৃতির চাক্ষুষ পরিবর্তন যত আকস্মিক এবং এদের বৈপরীত্যও যত স্পষ্ট, তেমনটি অন্য কোথাও নয়। সেখানে দীর্ঘ খরার পর ধূসর বালির নিধুয়া ঊষর প্রান্তর একেবারে পাথরের রূপ ধারণ করে। তখন মনে হয় যেন সেখানে মৃত্যুর নীরবতা এবং শূন্যতা ভর করেছ। এরপর হঠাৎ কয়েকদিনের ধারা বর্ষণে দৃশ্য পালটে যায় এবং সেই একই জমি সবুজের সমারোহে হেসে ওঠে এবং সেখানে লক্ষকোটি পতঙ্গ আর টিকটিকি গিরগিটি, ব্যাঙ আর পাখপাখালি গি-জগিজ করতে থাকে। এই যে প্রকৃতির শরীরে এইরকম সময়ে চমকপ্রদ পরিবর্তন দেখা দেয় তাতে ইউরোপিয়ান দর্শকও একে জাদুর প্রভাবের সঙ্গে তুলনা করেছে। তাহলে বন্যরাও যে একেবারে বাস্তবে তা করে দেখাবে তাতে আর আশ্চর্য কি! এখন মধ্য-অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা এইসব জাদুর উৎসব-পার্বণ করে থাকে তখনই যখন ভালো একটা ঋতুর সম্ভাবনা দেখা দেয়; এবং এইসব পার্বণের উদ্দেশ্য একটাই– যেন খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত উদ্ভিদ গাছপালা আর প্রাণিকুলের বংশ বৃদ্ধি পায়। এভাবে আমাদের ইউরোপের কৃষিসমাজে বসন্তকালে যেসব উৎসবের আয়োজন করা হয় তাদের সঙ্গে এইসব অনুষ্ঠানের খুব নিকট সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। সাদৃশ্য কেবল সময়েই নয়, উদ্দেশ্যেও কারণ আমাদের আদি দাদা পরদাদারা যখন বসন্তে উদ্ভিদজীবন ফিরিয়ে আনতে পালাপার্বণের নিয়মকানুন ঠিক করছিল তখন তারা ঋতুর প্রথম মুকুলের সুবাস নেওয়ার কি প্রথম বাসন্তীকুসুমটি চয়ন করার কি মৃদুমন্দ বাতাসে হলুদ বর্ণ ড্যাফোডিলের নাচন দেখার ভাবালু ইচ্ছাশক্তি দ্বারা তাড়িত হয় নি। তারা বরং তাড়িত হয়েছিল খুবই বস্তুনিষ্ঠ এবং একেবারেই অবিমূর্ত এই বিবেচনাবোধ দ্বারা যে মানুষের জীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা পড়েছে উদ্ভিদের জীবনের সঙ্গে। এবং যদি উদ্ভিদ ধ্বংস হয় তো মানুষও বাঁচতে পারে না। এবং অস্ট্রেলিয়ার বুনোদের মধ্যে যেমন তাদের জাদুর ক্রিয়াশক্তির কার্যক্ষমতা সম্পর্কে বিশ্বাস দৃঢ় হয় যখন দেরিতে হোক, কি চটজলদিই হোক ওরা দেখত যে উদ্ভিদ ও প্রাণের স্ফুরণ ঘটেছে, অর্থাৎ ওরা যা চেয়েছিল তাই ঘটছে, সেরকম ধরে নিতে পারি পুরাকালে ইউরোপীয় বুনোমানুষদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা এরকমই ছিল। ঝোপঝাড় জঙ্গলে কচি সবুজ-পাতার সমারোহের দৃশ্য, শ্যাওলা শ্যামল হ্রদের তীরে দোলায়মান বাসন্তীফুল, দক্ষিণ থেকে সোলানো পাখির ঝাঁক, এবং সূর্যদেব প্রতিদিনই একটু একটু করে ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর আসমানের দেয়াল বেয়ে ওঠে– এসবই উৎফুল্ল চিত্তে ওরা দেখে ভাবত যে বাস্তবিকই ওদের জাদুর ছোঁয়া কাজ করছে। এবং দেখেশুনে ওরা আরও উৎসাহিত বোধ করত, আরও আনন্দিত হতো, ওদের আত্মবিশ্বাস যেত বেড়ে। যাক বিশ্বে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে কারণ ওদের ইচ্ছেমতো প্রকৃতিকে ওরা

তিনটি লিটলম্যাগ
মিঠুন রাকসাম

আগুনমুখা

দীর্ঘ বিরতির পর সময় ও চেতনার মুখাকৃতি নিয়ে বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'আগুনমুখা'। সম্পাদনা করেছেন– নাজমুল শামীম, দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদটি করেছেন চারু পিন্টু আর নামাঙ্কন সাইদ র'মান। আগুনমুখা'র সূচির দিকে তাকালে সমৃদ্ধ একটি সংখ্যা বলতে হয়। কিন্তু সম্পাদনার দিকে একটু নজর দিলে আরো ভালো হতো। কারণ

> বাংলাদেশ এবং ভারতের কবিদের এক সারিতে না করে আলাদা অধ্যায় হলে পাঠকদের কবি এবং কবিতা বুঝে নিতে সুবিধা হতো । এমন কি সুমন প্রবাহ স্মরণ কবিতা এবং রাকিবুল হক ইবন স্মরণ কবিতার জন্যেও আলাদা আলাদা অধ্যায় হতে পারত

সূচিতেই 'এর' ব্যবহার এত বেশি যে সূচি পড়তে গিয়েই ধ্যাৎ! শব্দটি বেরিয়ে আসে । সূচিতেই যদি পাঠকের মনে অনীহা তৈরি হয়ে যায় তখন ভেতরে ঢোকা কষ্টকর হয়ে পড়ে । কবিতা লিখেছেন– সরদার ফারুক, অনুরাধা পাত্র, হেনরী স্বপন, রাজীব সিংহ, সাইদ র'মান, কৌশিক বিশ্বাস, ইমরান মাঝি, মুয়ীজ মাহফুজ, সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ফেরদৌস মাহমুদ, উদয়ন ঘোষচৌধুরি, আখতারুজ্জামান ইরান, সূরজ দাস, অভিজিৎ দাস, অনুপম মুখোপাধ্যায়, সুমন প্রবাহ স্মরণ কবিতা, রমিত দে, নাজমুর শামীম,অয়ন দাশগুপ্ত, ইকতিজা হাসান, ভাস্কর জ্যোতি দাস, আমজাদ সুজন, জুবিন ঘোষ, ঈয়ন, সব্যসাচী হাজরা, মিছিল খন্দরকার, রঙ্গীত মিত্র, আগুন্তুক মাহফুজ, সরোজ দরবার, রাকিবুল হক ইবন স্মরণ কবিতা, ঋপন আর্য, অনিন্দ্য দ্বীপ, উল্কা, শফিক লিটন, সম্বিত বসু, সোহম নন্দী, রুমান শরীফ । জানি না কেন সম্পাদক মহাশয় অগ্রজ আর অনুজ কবিদের কবিতা একই সারিতে দাঁড় করিয়েছেন । কবিতা বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও তাই মনে হয়েছে । বাংলাদেশ এবং ভারতের কবিদের এক সারিতে না করে আলাদা অধ্যায় হলে পাঠকদের কবি এবং কবিতা বুঝে নিতে সুবিধা হতো । এমন কি সুমন প্রবাহ স্মরণ কবিতা এবং রাকিবুল হক ইবন স্মরণ কবিতার জন্যেও আলাদা আলাদা অধ্যায় হতে পারত ।

'নৃসিংহের পদাবলী' পাঠ করার মধ্য দিয়ে আমরা কবি তুহিন দাসকেও পাঠ করতে পারি যেহেতু তার পূর্ণাঙ্গ কাব্য গ্রন্থ । আর পাঠ নিতে পারি অকাল প্রয়াত অনন্ত জাহিদের 'পাখির ছড়া ছড়ার পাখি' নামে অপ্রকাশিত ছাড়ার বইটি । গল্প লিখেছেন– জিয়া হাসান, সৈয়দ ওমর হাসান, ইমরান মাঝি, উল্কা, আসাদুজ্জামান রেজা । ছাপা হয়েছে সৈয়দ সারোয়ার
হোসেন-এর অপ্রকাশিত তিনটি গল্প । রয়েছে মোশতাক আল মেহেদীকে নিয়ে ক্রোড়পত্র । ক্রোড়পত্রে মোশতাক আল মেহেদীর স্মৃতি কথা, তাঁর লেখা হ্রস কবিতা, হাইকু, কবিতা, ছড়া, আরজ আলী মাতুব্বরের সাথে কথোপকথন, নাটক, কাব্যনাট্য, কিশোর গল্প, কবিতা বিষয়ক গদ্য, উপন্যাস এবং মোসতাক আল মেহেদী সংগৃহীত বরিশালের লোকছড়া ছাপা হয়েছে । মোশতাক আল মেহেদীর স্মৃতি কথা, আরজ আলী মাতুব্বরের সাথে আলাপ আর ফুলির 'লাল শাড়ি' উপন্যাসটি পাঠকদের ভালো লাগবে আশা করি । এদিক থেকে আগুনমুখাও সমৃদ্ধ হয়েছে বলা যায় । ২৮৮ পৃষ্ঠার আগুনমুখা দাম রাখা হয়েছে ৭০ টাকা ।

নদী

তরুণ কবি শামীম হোসেন সম্পাদিত 'নদী' রাজশাহী থেকে প্রকাশিত শিল্প সাহিত্যের ছোটোকাগজ। নদী'ও দীর্ঘ বিরতির পর প্রকাশিত হয়েছে এপ্রিল ২০১২-এ। সংখ্যা ১১। মুগ্ধকর প্রচ্ছদ করেছেন রাজিব রায় আর অলঙ্করণ করেছেন আশফাকুল আশেকীন। 'বিচারকের কাঠগড়ায় আমাদের লিটল ম্যাগাজিন' শিরোনামে লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক এবং তাঁদের সম্পাদনা বিষয়ে একটি ঝরঝরে মুক্তগদ্য লিখেছেন কবি মনজু রহমান। মোহাম্মদ নূরুল হক 'মানব মনের অনন্ত জিজ্ঞাসা ও কবিতার মক্র-মিত্র' শিরোনামে লিখেছেন কবিতা বিষয়ক মুক্তগদ্য। যুগল কবিতা লিখেছেন খালিদ আহসান, ওয়ালী কিরণ, আসাদুজ্জামান খোকন, হেনরী স্বপন, বদরে মুনীর, কামাল খাঁ, মিঠুন রাকসাম, আরিফুল হক কুমার, আমিনুল ইসলাম, মালেক মেহমুদ, মোস্তাক রহমান, কামরুল বাহার আরিফ, মনিরুল মনির, রবু শেঠ, মিজানুর রহমান বেলাল, বর্ষা জহীন। তবে কবিতা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আরো সর্তকতা অবলম্বন করা দরকার ছিল সম্পাদক মহাশয়ের তাহলে আরো ভালো কবিতা পাঠকের হাতে চলে আসত। সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে সত্তর দশকের কবি সিরাজুদ্দৌলাহ বাহার-এর আর সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন সম্পাদক স্বয়ং। বলা যায় সাক্ষাৎকারটি ভালো হয়েছে কিন্তু সবাই যে ধাচের প্রশ্ন করে সেই ধাচের প্রশ্ন না করে অন্যভাবেও প্রশ্ন করা যেত তখন আমরা যে বাহার ভাইকে চিনি, জানি যে বাহার ভাই একটি কবিতার জন্যে ঘোরের ভিতর দিন কাটাতেন সেই বাহার ভাইকে আরো কাছ থেকে দেখতে পেতাম, জানতে পারতাম। অবশ্য একজন কবির হৃদয়ের ক্ষরণ তো আর সাক্ষাৎকারে জানা যাবে না যতটুকু পাই কবির কবিতা থেকেই রস্বাদন করে নিতে হয়।

গল্প লিখেছেন-তারিক স্বপন, শিবলী নোমান, মুহসীন মোসাদ্দেক। এম এ কাইউম লিখেছেন– 'পাকুড়িয়ার নিবিড় নিসর্গে' নামে একটি আখ্যান। আখ্যানটি পড়ার মতো। শুরুটাই ভালো লাগা ধরিয়ে দেয়। যেমন– 'নাগর আমার কাঁচা পিরিত পাকতে দিল না' হঠাৎ ভ্যানচালকের কণ্ঠে গানের কলি দুটো 'কেমন ডালনার মতো আমার হৃদয় নগরের ভেতর গুঁটে দেয়।' ৬৪ পৃষ্ঠা 'নদী'র মূল্য রাখা হয়েছে ৫০ টাকা।

“ তবে কবিতা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আরো সর্তকতা অবলম্বন করা দরকার ছিল সম্পাদক মহাশয়ের তাহলে আরো ভালো কবিতা পাঠকের হাতে চলে আসত। সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে সত্তর দশকের কবি সিরাজুদ্দৌলাহ বাহার-এর আর সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন সম্পাদক স্বয়ং ”

চৌকাঠ

প্রকাশিত হয়েছে গল্প ও গল্প বিষয়ক গদ্য সংখ্যা 'চৌকাঠ'। সম্পাদক লতিফ জোর্য়াদার। প্রচ্ছদ সঞ্জয় দে রিপন। কথা সাহিত্যের কাছে 'প্রত্যাশা'-শিরোনামে গল্প বিষয়ক গদ্য লিখেছেন– জাকির তালকুদার, 'গল্পভাবনার গদ্য' শিরোনামে কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর। জাকির তালুকদার এবং কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরের লেখা সুখপাঠ্য। 'শূন্য দশকের গল্প প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি' শিরোনামে সমীর আহমেদ-এর লেখা পড়ে বুঝা যায় তিনি বেশ শূন্য দশকের গল্পকারদের নিয়ে মজে আছেন। তিনি লিখেছে– ছোটো গল্পে সাহিত্যতত্ত্বের প্রয়োগকৌশলের নতুন নতুন নিরীক্ষা যেমন নব্বইয়ের দশকে হয়েছে, তেমনি শূন্য দশকের কথাকারও বসে নেই। শূন্য দশকের অনেকের গল্পেই জাদুবাস্তবতা ও মনোলোগের প্রয়োগ লক্ষ্যযোগ্য হয়ে উঠেছে। এছাড়া চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহ, স্যাটায়ার, অধি বাস্তবতা ইত্যাদি তো রয়েছেই। সমীর আহমেদ যাদের গল্প নিয়ে আলোচনা করেছেন– অরণ্য প্রভা,আহমেদ জসীম, আহমেদ ফিরোজ, আবু তাহের সরফরাজ, ঈশান সামী, এমদাদ রহমান, কবীর রানা, চন্দন চৌধুরী, জাহেদ মোতালেব, তৌহিন হাসান, তুহিন দাস, নুরুননবী শান্ত, প্রান্তিক অরণ্য, প্রবীর পাল, ফজলুল কাবিরী, ফেরদৌস মাহমুদ, বদরুন নাহার, বিজয় আহমেদ, মাজুল হাসান, মাদর হাসান, মুন্ন মানসী, রানা ভিক্ষু, রুবাইয়াৎ আহমেদ, রাহাদ আবীর, লতিফ জোর্য়াদার, শেখ লুৎফর, শুভাশিস সিনহা, শাজান শীলন, সৈকত আরেফিন এবং সাইদুল ইসলাম। কমল কুমার মজুমদারের 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পটি নিয়ে কবীর রানা 'নিম অন্নপূর্না ক্ষুধার শিল্পরূপ' শিরোনাম গদ্য লিখেছেন। আখতারুজ্জমানকে নিয়ে 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্প ব্যক্তি চৈতন্য ও স্বাধীনতা উত্তর বাস্তবতা' শিরোনামে গদ্য লিখেছেন চন্দন আনোয়ার। অনুবাদ পর্বে কর্তার সিং ডুগাল'র গল্প থেকে 'কুলসুম' নামে একটি গল্প অনুবাদ করেছেন আন্দালীব রাশদী। গল্প লিখেছেন– মজীদ মাহমুদ, শামসুল কবীর কচি, শিবলী মুকতাদির, মাহবুব লীলেন, মো আব্দুর রাজ্জাক, লতিফ জোয়ার্দ্দার, আখতার জামান, মাজুল হাসান, ফজলুল কবিরী, প্রবীর পাল, জাহেদ মোতালেব, শঙ্কর পাল, শারমিনুর নাহার, ইদ্রিস আলী মধু, সুমন সিকদার, শাহিনুর রহমান। ১৭৬ পৃষ্ঠার 'চৌকাঠ'-এর মূল্য ৫০ টাকা।
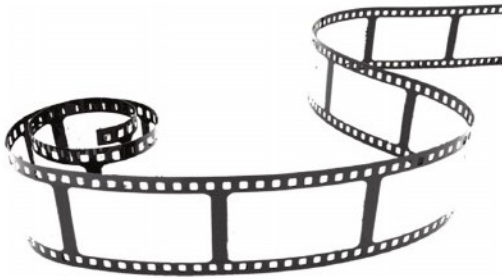
‘চলচ্চিত্র বিশ্বের সারথি’

মনি হায়দার

চলচ্চিত্র মানব বিশ্বের শিল্প প্রকরণের সর্বশেষ বিকশিত এক অবাক রূপ। একটি দেশের বা সমাজের সাংস্কৃতিক মানচিত্র খুঁজে নেওয়া সম্ভব একটি চলচ্চিত্রেই। অবশ্য আমরা চলচ্চিত্রের যে রূপ আর বিস্ময়কর রূপান্তর দেখে চমকে উঠি, তা একদিনে অর্জন করা সম্ভব হয় নি। এর পেছনে অনেক মানুষের দৃশ্যমান, অনেক মানুষের অদৃশ্যমান শ্রম, মেধা ও চিন্তার বিস্তার রয়েছে। সমস্যা হচ্ছে আমরা কেবল সামনের মানুষদেরই চিনি। যারা পর্দার অন্তরালে থেকে চলচ্চিত্রকে আজ বিশ্বজনীন সত্তায় ও নানা মাত্রিকতায় নিয়ে এসেছেন, তাদের মধ্যে থেকে মাত্র দশজনকে নিয়ে বিশিষ্ট চলচ্চিত্রবোদ্ধা ও প্রগতিশীল সংস্কৃতিকর্মী মনিস রফিক ‘চলচ্চিত্র

বিশ্বের সারথি' গ্রন্থটি রচনা করেছেন।
আড়াইশরও বেশি পৃষ্ঠায় আবদ্ধ বইটিতে মনিস রফিক যাদের নিয়ে এসেছেন, চলচ্চিত্রের সেইসব প্রাণপুরুষ : অগাস্ত লুমিয়ের- লুই লুমিয়ের, ডি ডব্লিউ গ্রিফিথ, প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের পরমজন– রবার্ট ফ্ল্যাহার্টি, বেদনার্ত চিরঞ্জীব চার্লি চ্যাপলিন, অনুপ্রেরণায় অন্তহীন জ্যঁ রেনোয়া, চলচ্চিত্রের শেরপা সের্গেই আইজেনস্টাইন, শিশু মনের স্বপ্নবাজ ওয়াল্ট ডিজনি, দেশজ সত্তার সারথি– সত্যজিত রায়, ভাঙা বাংলার দগ্ধ প্রাণ ঋত্বিক ঘটক এবং সর্বশেষ জাগরণের রণযোদ্ধা জহির রায়হান। যাদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন মনিস রফিক, তাদের তালিকা পাঠ করেই পাঠকেরা একটা ধারণা করে নিয়েছেন– বইটি সাধারণ কোনো চলচ্চিত্রবিষয়ক গ্রন্থ নয়। বলা যায়, বইটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। দ্বিতীয়ত, মনিস রফিকের চলচ্চিত্রের ইতিহাস সম্পর্কে প্রখর সচেতনতা। চলচ্চিত্র সম্পর্কে আগ্রহী এমন যে কোনো পাঠক এই বইটি পড়ে বিশ্ব চলচ্চিত্রের ক্রম প্রসারমাণ ইতিহাসকে ধারণ করতে পারবেন।
চমৎকার একটি আবহ তৈরি করে মনিস রফিক মহান চার্লি চ্যাপলিনের প্রস্থানকে আমাদের কাছে, পাঠকদের কাছে, চার্লি চ্যাপলিনের ভক্তদের কাছে উপস্থাপন করলেন। সম্প্রতি বাংলাদেশে তরুণদের মধ্যে চলচ্চিত্র চর্চা অনেক বেড়েছে। এবং তাদের অধিকাংশই মহান চার্লির খুব ভক্ত। মনিস রফিকও তার ব্যতিক্রম নন। তিনি চার্লিকে, তাঁর জন্ম, তাঁর শৈশব, তাঁর বাবা-মায়ের কথা, চার্লির চলচ্চিত্র জীবনের উত্থানকাল, সবই চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। এমনিতে চার্লির আত্মজীবনী অনেক বড়ো। কয়েকশ পৃষ্ঠা। তার সেই দীর্ঘ জীবনের খুব ক্ষুদ্র অংশই এই লেখায় উপস্থাপন করেছেন মনিস। মনিসের আরও সার্থকতা চার্লির দীর্ঘ জীবনকে অথবা বলা যায় সমুদ্রসমান জীবনকে এক পেয়ালায় সুন্দরভাবে, সার্থকভাবে ছেনে এনেছেন। আর মহত্তম চার্লি চ্যাপলিনের সংগ্রামী জীবনের অনেক অজানা তথ্য উদ্ঘাটিত হয় আমাদের মানস প্রেক্ষাগৃহে একের পর এক। চলচ্চিত্র সম্পর্কিত উৎসাহী পাঠকদের জন্য আরও বাড়তি পাওনা চার্লি চ্যাপলিনের অনেকগুলো ছবি, তাঁর ভাই সিডনি এবং বাবা-মায়ের ছবিও। আমরা দেখতে পাই শিশু চার্লির সেই তুষার ঝরা সারাটা রাতের মর্মান্তিক প্রতিচ্ছবি, যেখানে হাসপাতালের অসুস্থ বাবার জন্য তীব্র অপেক্ষা তাঁর। মনিস রফিকের লেখা 'বেদনার্ত চিরঞ্জীব চার্লি চ্যাপলিন' অগণিত পাঠকের সঙ্গে মহান চার্লি চ্যাপলিনের সঙ্গে একটি সম্পর্কের মহাসড়ক তৈরি করে দেয়।

মনিস রফিক তাঁর গ্রন্থ শুরু করেছেন চলচ্চিত্রের প্রথম দরজা খোলার দুই জাদুকরের গল্প দিয়ে– অগাস্ত লুমিয়ের ও লুই লুমিয়ের, এই দুই ভাইকে দিয়ে।

'চলচ্চিত্রের বংশীবাদক– অগাস্ত লুমিয়ের-লুই লুমিয়ের' গ্রন্থের দরজা খোলা লেখার শুরুতেই দুই ভাইয়ের ছবি দিয়ে শুরু করেছেন মনিস। তারপরই শুরু হলো দুই ভাইয়ের অবাক আবিষ্কারের অসাধারণ গল্প। সুখপাঠ্য এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি লেখা মনিস শুরু করেছেন একটা গল্প দিয়ে, চলচ্চিত্র জীবনের গল্পে মনিস যে দশজন চলচ্চিত্রকারকে নিয়ে এই গ্রন্থ সাজিয়েছেন তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে লেখার শুরুতে একটি গল্প দিয়ে শুরু করেছেন। যাতে পাঠকদের মনের কপাট খুব দ্রুত খুলে যায়। অথবা বলা যায় রুপালি পর্দার জট খুলতে খুলতে মনিস গল্প সাজিয়েছেন।

লুই ভ্রাতৃদ্বয়কে নিয়ে লেখা গ্রন্থের প্রথম উপস্থাপনার মধ্যেই একজন চলচ্চিত্রনিষ্ঠ পাঠক চলচ্চিত্রের উষাকালের অনেক খুঁটিনাটি কিন্তু প্রযোজনীয় তথ্য পেয়ে যাবেন। ফরাসি দেশের লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয়ের সৃষ্ট চলচ্চিত্রের রঙিন হাত ধরে এই দেশে, বাংলা ভাষার মাটিতে একদিন আসবেন সেই ফরাসি দেশের আর এক অনন্য চলচ্চিত্র দূত, মনিসের লেখার শিরোনাম : 'অনুপ্রেরণায় অন্তহীন– জ্যঁ রেনোয়া', তিনি আমাদের চলচ্চিত্রের ভূমিতে রোপণ করে যাবেন অযুত সম্ভাবনার দ্রাক্ষারস, কে জানত? কিন্তু প্রসঙ্গ যে শিল্প! শিল্প হলেই সবকিছু হওয়া সম্ভব।

কিন্তু ব্যক্তি মানস কেমন ছিল রেনোয়ার? আমেরিকাতে তিনি শান্তি পান নি। তাঁর অন্তর্ভূমিতে ছিল প্রিয় মাতৃভূমির গান। তাই শেষ অভিলাষ ছিল মৃত্যুর পর তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যেন হয় ফ্রান্সে, পিতার সমাধির পাশেই। তাই হয়েছিল ১৯৭৮ সালে মহান চলচ্চিত্রকার জ্যঁ রেনোয়ার মৃত্যুর পর।

সের্গেই আইজেনস্টাইন। তিনিও বিশ্ব চলচ্চিত্রের এক মহত্তম পুরুষ। বাংলাদেশে কিংবা অন্য দেশে যারা সামান্য হলেও চলচ্চিত্র নিয়ে ভাবেন, তারা অবশ্যই 'ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন' ছবিটির নাম জানেন। হয়ত দেখেও থাকবেন। এই বিশ্বখ্যাত ছবিটি শোনা এবং দেখার মাঝখানে যে মানুষটি দাঁড়িয়ে তিনিই সের্গেই আইজেনস্টাইন। তাঁর জীবন ও কর্ম ব্যাপক, বর্ণাঢ্য। জার শাসিত রাশিয়ার সাধারণ মানুষের মুক্তিই প্রাধান্য পেয়েছে ছবিটিতে, যা আইজেনস্টাইনের পরিচালনায় মহাকাব্যিক রূপে দর্শকদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। এবং তিনি নিজেও ছিলেন শোষিত মানুষের পক্ষে। ফলে 'ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন' ছবিটি সবকালের মানুষের, বিশেষ করে সিনেমা প্রেমিক মানুষের ভেতর আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। সেই সের্গেই আইজেনস্টাইন

“ফরাসি দেশের লুমিয়ের ভ্রাতৃ দ্বয়ের সৃষ্ট চলচ্চিত্রের রঙিন হাত ধরে এই দেশে, বাংলা ভাষার মাটিতে একদিন আসবেন সেই ফরাসি দেশের আর এক অনন্য চলচ্চিত্র দূত, মনিসের লেখার শিরোনাম : 'অনুপ্রেরণায় অন্তহীন– জ্যঁ রেনোয়া', তিনি আমাদের চলচ্চিত্রের ভূমিতে রোপণ করে যাবেন অযুত সম্ভাবনার দ্রাক্ষারস, কে জানত”

মনিস রফিকের 'চলচ্চিত্র বিশ্বের সারথি' গ্রন্থে স্বাভাবিকভাবে বিশেষ জায়গা পাবেন। কিন্তু আইজেনস্টাইনের জীবনের বিস্তৃতি বিপুল। সেই বিপুল জীবনের সামান্য অংশই এখানে উপস্থাপন করেছেন মনিস।
অন্যদের ক্ষেত্রেও যেমন, সের্গেই আইজেনস্টাইনকেও তেমন গল্পে গল্পে অনুপম গদ্যে সাজিয়েছেন। মনিস লিখেছেন– '১৯৪৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি রাতে প্রচুর বরফ পড়েছে মস্কোর রাস্তায়। আইজেনস্টাইন জানালার শার্সি দিয়ে অনেকক্ষণ মস্কোর রাস্তার বরফ পড়া দেখতে লাগলেন। তাঁর মনে পড়ে গেল– সেই কবে গুরু কুলেশভের কাছে যেতেন সিনেমাবিদ্যার ওপর শিক্ষা গ্রহণ করতে। তখন তিনি পুরোপুরি মঞ্চ নাটকের নির্দেশক হিসেবে কাজ করতেন কিন্তু যে তিন মাস তিনি কুলেশভের গৃহে গিয়েছিলেন, সেই তিন মাস তিনি অপার বিস্ময়ে চলচ্চিত্রকে চিনেছেন এবং গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন চলচ্চিত্র শিল্পের সম্ভাবনা। সেই সন্ধ্যাগুলোতে তাকে আরও বেশি টানত কুলেশভের বাড়ির সামনের ফুটে থাকা অজস্র লাল লাইলাক ফুল। মনে হতো, সেই লনে ঢুকলেই দুলতে থাকা লাইলাক ফুলগুলো গভীর ভালোবাসায় অভিবাদন জানাত বিশ্ব চলচ্চিত্রের শেরপা আইজেনস্টাইনকে। অভিবাদনরত লাইলাক ফুলগুলোর দিকে যখন তিনি তাকাতেন তখনই তাঁর কানে ভেসে আসত পিয়ানোর সুর। অশ্রুতপূর্ব সেই সময় আর স্মৃতিগুলো আইজেনস্টাইন কখনো ভুলতে পারেন নি। স্মৃতিচারণ করতে গেলেই তিনি লাইলাক ফুল আর পিয়ানোর সুরের কথা প্রায়ই আনন্দের সঙ্গে বলতেন।
পেঁজা পেঁজা বরফ পড়া মস্কোর রাস্তা থেকে চোখ ফিরিয়ে তিনি লিখতে বসলেন। রঙের তত্ত্ব সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লেখায় মগ্ন হয়ে পড়লেন তিনি। কিন্তু পারলেন না। হঠাৎ কাগজের ওপর মুখ থুবড়ে পড়লেন। হৃৎরোগের আক্রমণে লেখা থেমে গেছে। সাদা পাতার ওপরে লাল ক্রেয়নে আইজেনস্টাইন জীবনের শেষ শব্দটি লিখলেন– 'আক্রমণ'। হয়ত তাঁর হার্ট অ্যাটার্কের কথা জানিয়ে দিলেন। লালকালি দিয়ে টেনে টেনে বহুকষ্টে 'আক্রমণ' শব্দটি লেখার সময় নিশ্চয় তাঁর চোখের সামনে দুলে উঠেছিল অজস্র লাল লাইলাক ফুল। দুলে দুলে অভিবাদন জানাচ্ছিল তাকে। হয়ত-বা সেই সময়ে তার কানে ভেসে আসছিল পিয়ানোর সেই আন্দোলিত সুর, যা অনেকক্ষণ ধরে বেজে চলা কোনো করুণ সুর, যে সুরের স্রোত বয়ে যায় সুদূর দিগন্তের ওপারে।'
সের্গেই আইজেনস্টাইনের জীবনের শেষ মুহূর্তটাও ছিল সিনেমার কোনো মহত্তম কিন্তু বিয়োগান্ত দৃশ্যর মতো, যা আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে। সের্গেইয়ের জীবনের প্রতি মাথা নত হয়ে আসে। বিশেষ করে ব্রিটিশ অভিনেতা পল রোবসনের সঙ্গে আইজেনস্টাইনের সাক্ষাৎ, তাদের দুজনের মধ্যে সম্পর্কের উষ্ণতা– এই লেখার একটি বিশেষ দিক।
এই গ্রন্থে মনিস রফিক বাঙালি চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানের যে আখ্যান রচনা করেছেন, তারই সামান্য ভাষ্য উপস্থাপন করব। বাংলা চলচ্চিত্রে যদি পালাবদলের একটি চলচ্চিত্রের নাম বলি অনিবার্যভাবে সেই চলচ্চিত্রটি 'জীবন থেকে নেয়া'। আর সেই ছবির পরিচালক জহির রায়হান। তাঁর জীবনের প্রথম ছবি 'কখনও আসে নি'।
সবশেষে বলব শিল্পসম্মত সিনেমা বিষয়ে একটি ভালো কাজ সম্পন্ন হয়েছে মনিস রফিকের হাতে। তাকে অভিনন্দন।

ভ্রমণসমগ্র

শফিক হাসান

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্যভাবে ভ্রমণ সাহিত্যের বিকাশ এবং বিস্তারের বয়স এক দশকও নয়। যদিও চর্চা চলছে অনেক আগ থেকেই। অনেকটা নীরবে-নিভৃতেই সাহিত্যের এ শাখা ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। হালে প্রতি বছর বইমেলায় প্রায় শ' খানেক ভ্রমণবই প্রকাশিত হয়। ভ্রমণবই প্রকাশের শুরুর দিনগুলোর কথা চিন্তা করলে এ সংখ্যা বিস্ময়কর। সংখ্যা বৃদ্ধিই প্রমাণ করে দেশে ভ্রমণসাহিত্যপ্রেমী পাঠকের সংখ্যা বাড়ছে। এবং সেটা ক্রমশ উর্ধ্বমুখী। পাঠকদের চাহিদার কথা চিন্তা করে এগিয়ে এসেছেন প্রকাশকরাও। তবে ভ্রমণের বইয়ের সংখ্যা বাড়লেও সিরিয়াস ধারার ভ্রমণ লেখক তেমন একটা বাড়ে নি বললেই চলে। কেউ কেউ শখের ভ্রমণ শেষে লব্ধ অভিজ্ঞতাকে বাণীবদ্ধ করে

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ভ্রমণসাহিত্যধারা বেগবান করতে ভূমিকা রেখে চলেছেন হাসনাত আবদুল হাই, বরেন চক্রবর্তী, মৃত্যুঞ্জয় রায়, মঈনুস সুলতান, নির্মলেন্দু গুণ, রাবেয়া খাতুন, মিতালী হোসেন, আসাদ চৌধুরী, আহসান হাবীব, হুমায়ূন আহমেদ, লিয়াকত হোসেন খোকন, আশরাফুজ্জামান উজ্জ্বল প্রমুখ

বইয়ে রূপ দেন। সত্যিকার অর্থে লেখক না হওয়ায় এসব বইয়ে সবসময় সাহিত্যমান রক্ষিত হয় না। কিছু থাকে কাঁচা হাতের লেখা, অপরিণত চোখে দেখা। এর বাইরে যারা নিয়মিত লেখেন এবং লেখক হিসেবে খ্যাতি আছে, বাংলাদেশের পর্যটন নিয়েও চিন্তাভাবনা করেন এরকমও একটা শ্রেণি আছে। সৈয়দ মুজতবা আলীর কথা তো বলাই বাহুল্য। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ভ্রমণসাহিত্যধারা বেগবান করতে ভূমিকা রেখে চলেছেন হাসনাত আবদুল হাই, বরেন চক্রবর্তী, মৃত্যুঞ্জয় রায়, মঈনুস সুলতান, নির্মলেন্দু গুণ, রাবেয়া খাতুন, মিতালী হোসেন, আসাদ চৌধুরী, আহসান হাবীব, হুমায়ূন আহমেদ, লিয়াকত হোসেন খোকন, আশরাফুজ্জামান উজ্জ্বল প্রমুখ। এ ধারার লেখকদের মধ্যে অন্যতম শাকুর মজিদ। হাতেগোনা ভ্রমণলেখকদের মধ্যে বিগত কয়েক বছর ধরে আলো ছড়াচ্ছেন তিনি। কোনো দেশ ভ্রমণ করে, ভ্রমণলব্ধ অভিজ্ঞতা বই আকারে পাঠকের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার ধারাবাহিকতা শুরু হয় ২০০৩ সালে। এ বছর থেকেই শুরু হয় তাঁর বই আকারে ভ্রমণযজ্ঞ; প্রথম ভ্রমণবই *আমিরাতে তেরোরাত*। তারপর আর থামেন নি। প্রায় বছরই তাঁর এক বা একাধিক বই প্রকাশিত হতে থাকে। ২০০৯ সালে এক বইমেলাতেই ৪টা ভ্রমণবই লিখে চমকিত করে দিয়েছিলেন পাঠক এবং বোদ্ধামহলকে। ২০১১ সাল পর্যন্ত তাঁর ভ্রমণবইয়ের সংখ্যা দাঁড়াল ৮-এ। ৮টি বই নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে ভ্রমণসমগ্র *অষ্টভ্রমণ*। অবশ্য এ বইগুলোর মধ্যে *মালয় থেকে সিংহপুরী* নামক বইটি আগে প্রকাশিত হয় নি, সরাসরি সমগ্রে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। *অবশেষে দ্বীপের দেশে* নামে এ বই ২০১০ সালে প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল পার্ল পাবলিকেশন্স থেকে কিন্তু প্রকাশকের নানা জটিলতায় তা আর হয় নি। সমগ্রে স্থান পাওয়া বইগুলো যথাক্রমে *আমিরাতে তেরোরাত* (২০০৪), *আমেরিকা : কাছের মানুষ দূরের মানুষ* (২০০৮) *কালাপানি* (২০০৯), *সক্রেটিসের বাড়ি* (২০০৯), *হো চি মিনের দেশে* (২০০৯), *পাবলো নেরুদার দেশে* (২০০৯), *নদীর নাম টে* (২০১০) ও সরাসরি সমগ্রে প্রকাশিত *মালয় থেকে সিংহপুরী*। বইগুলোর প্রকাশক উৎস প্রকাশন, অন্যপ্রকাশ, অবসর। *অষ্টভ্রমণ*-এর পৃষ্ঠাবিন্যাস করা হয়েছে শেষ থেকে শুরু হিসেবে। প্রকাশনার ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ প্রকাশিত বই পর্যায়ক্রমে আগে বিন্যস্ত হয়েছে।

মালয় থেকে সিংহপুরী সপরিবারে বেড়ানোর গল্প। পারিবারিক এ ভ্রমণযাত্রায় লেখকের সঙ্গী স্ত্রী ও দুই পুত্র। ভ্রমণের মধ্যেই চলে আসে ঈদ। মালয়েশিয়ার একটা হোটেলে অবস্থানকারী এ পরিবারকে ঈদে পরিজনদের সাথে কাটাতে না পারার দুঃখ ততটা কাতর করে না, যতটা করে আমেরিকার মহাপ্রতাপশালী শাসক কর্তৃক এই ঈদের দিনেই ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসি দেওয়ার দৃশ্যে। টেলিভিশনে লাইভ দেখানো হচ্ছে সাদ্দাম হোসেনের ফাঁসির দৃশ্য। ঈদুল

আজহায় সংঘটিত এ ঘটনাকে 'নির্মম'ভাবে বাক্যবন্দি করেছেন লেখক–

> সকালবেলা টেলিভিশন অন করে মন খারাপ হয়ে যায়। এ কী দেখছি! সাদ্দাম হোসেনকে কোরবানি দিয়েছে আমেরিকান ইরাকি সরকার? সিএনএনে রিপোর্ট দেখাচ্ছে। যেখানে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল সেখানে উপস্থিত থাকা এক লোক তার মোবাইল ফোনের ক্যামেরায় ফাঁসি কার্যকর করার বীভৎস দৃশ্যগুলোর ছবি ধারণ করে সিএনএনে দিয়েছেন। ...পৃথিবীর সবচে সভ্য মানুষের দাবিদার অসভ্য মানুষগুলোর বর্বরতার চূড়ান্ত রূপ প্রত্যক্ষ করে মর্মাহত হয়ে পড়লাম।

এভাবেই একজন যথার্থ লেখক নিজের বেদনা সঞ্চারিত করে দেন পাঠকের মাঝে। কোরবানি ঈদের দিনের অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে 'কোরবানি' শব্দের ভিন্ন ব্যবহারও হৃদয়ে দাগ কাটে, মোচড় খায়। ২ সপ্তাহের এ ভ্রমণে লেখক দেখিয়েছেন রূপকথার গল্পের মতো মালয়েশিয়ার সমৃদ্ধির সাফল্যগাথা। সে দেশের অনুপম পর্যটন স্থান এবং নান্দনিক স্থাপনাগুলোর মনোগ্রাহী বর্ণনা তো ছিলই। মালয়েশিয়ার ঐতিহ্য, সংস্কৃতির নিপাট চিত্র ধরা পড়ে কলমে। অবশ্য শুধু মালয়েশিয়া নয়, এটা আসলে 'যৌথ' ভ্রমণ, যা বইটির নাম থেকে অনুমেয়। প্রথমে মালয়েশিয়া, তারপর সিঙ্গাপুরে পা রাখেন তারা। সিঙ্গাপুরের আদ্যোপান্তও মূর্ত হয়ে ওঠে কুশলী বর্ণনাচ্ছটায়।

স্কটল্যান্ড ভ্রমণে গল্প বিধৃত হয়েছে *নদীর নাম টে*-তে। স্কটল্যান্ডের ছোট্ট শহর ডান্ডি। পৃথিবীজোড়া ডান্ডির খ্যাতি তিন J-র জন্য। এই তিন J হচ্ছে Jute, Journalism, Jam। ডান্ডিকে ঘিরে রয়েছে যে নদী, তার নাম টে। বিশ্বায়নের থাবায় একে একে বন্ধ হয়ে গেছে টে নদীপারে গড়ে ওঠা পাটকলগুলো, যেভাবে একে একে বন্ধ হয়ে গেছে বাংলাদেশের পাটকলগুলো। বাংলাদেশের পাটকলগুলোর জন্য শোকগাথা বা কোনো কিছু না হলেও টে নদীপারে গড়ে উঠেছে জাদুঘর। এখানটায় একসময় রপ্তানি হতো সোনালি আঁশ খ্যাত বাংলাদেশের পাট। রপ্তানির স্বর্ণসময়ে নারায়ণগঞ্জকে প্রাচ্যের ডান্ডি হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। ডান্ডি নিয়ে স্মৃতিকাতরতার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শহর সেন্ট অ্যান্ড্রুজ, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রভৃতিকে ঘিরে প্রাঞ্জল বর্ণনায় নিবিষ্ট না হয়ে পারা যায় না।

ধারণা করা হয়, যত লোক রাষ্ট্র হিসেবে চিলিকে চেনে তার চেয়ে আরও অনেক বেশি জানে পাবলো নেরুদার

> জার্মানে শুধু সক্রেটিসের বাড়িই নয়, সমরকুশলী হিসেবে ইতিহাসে ধিকৃত এডলফ হিটলারেরও বাড়ি। তবু লেখক পজিটিভভাবে দেখেছেন জার্মানকে। তাই তো এ বইয়ের নাম হয়েছে *সক্রেটিসের বাড়ি*। মহান দার্শনিক সক্রেটিসের বাড়ি যে মাটিতে সে দেশের নামকরণ সক্রেটিসের বাড়ি হতেই পারে

নাম। দক্ষিণ আমেরিকার শেষ মাথার দেশ চিলি। এই চিলি মূর্ত হয়ে উঠেছে *পাবলো নেরুদার দেশে* ভ্রমণকাহিনীতে। পাবলো নেরুদা বিশ্বখ্যাত কবি। তবে অনেকেরই অজানা তিনি একজন সফল বিপ্লবী, রাষ্ট্রনায়কও। চিলির স্বাধীনতা সংগ্রাম, ইতিহাস-ঐতিহ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন তিনি। প্রেম ও বিপ্লবের কবি নেরুদার দেশকে শাকুর মজিদ পরিচিত করান তাঁর সহজাত সরস বর্ণনায়। তিনি বলেন–

> এখানে এসে ক্যামেরা নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়ে যাই। ছবি তোলা যাবে এই স্যুভেনির শপের আর বাইরের বাগানের। ঘরের ভেতর ছবি তুলতে হলে আলাদা পারমিশন লাগবে। আলাদা পারমিশনের জন্য যখন কাউন্টারে গেলাম। তখন চক্ষু চড়কগাছ। (চড়কগাছ কী আমি জানি না, কোনো কোনো লেখক এই গাছের নাম ব্যবহার করেছেন বিস্ময় প্রকাশের জন্য, তাই আমিও করলাম)।

লেখকের রসবোধ যে প্রখর আর পরিমিত তার আরেকটা প্রমাণ দেখানো যাক–

> এনায়েত ভাই গান ধরেন–'আমায় এতো রাতে কেন ডাক দিলি প্রাণ কোকিলারে'– আর তার সাথে কোরাস ধরি আমরা সবাই। ...এর মধ্যে আমাদের অপর দুই চিলিয়ান সহযাত্রী, নৌকার মাঝি আর গাইড এঞ্জেলিকা নিজেদের মধ্যে কী নিয়ে যেন কথা বলে। এঞ্জেলিকা বলে– নৌকার মাঝি জানতে চেয়েছে– এই গানের মানে কী? এঞ্জেলিকাকে বোঝানো হয় এর ইংরেজি অর্থ। কিন্তু সে কোনোভাবেই বুঝতে পারে না– রাতের বেলা কোকিলের ডাক শুনে মেয়েটি কেনই বা এত উতলা হবে।

এভাবেই শাকুর মজিদ সূক্ষ্ম রম্যরস ছিটিয়ে যান পাতায় পাতায়। রঙ্গরসের ভেতর দিয়েই যেন দুই দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, বিভাজন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন চিলির এক চিত্রশিল্পী টেগোরের 'জিতানজলি' নামক বইটি পড়েছেন; শাকুর মজিদও সাবলীলভাবে 'জিতানজলি' পাঠকের সাথে আলাপচারিতা চালিয়ে যান। লেখক খোলা চোখে যা দেখে যান–বলে যান; নিজের অজান্তেই পাঠক লেখকের পিছু ধরা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

ভিয়েতনামের প্রতিশব্দই যেন হো চি মিন। কেননা হো চি মিন মানেই তো ভিয়েতনাম। দীর্ঘদিন আমেরিকান ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের সাথে যুদ্ধ করে ভিয়েতনামের অবিসংবাদিত নেতা ছিনিয়ে এনেছেন সে দেশের বিজয়, স্বাধীনতা। নিজেকে নিয়ে গেছেন এমন উচ্চতায়, যা এখনও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে দূর বিশ্বের মানুষও। মহাপরাক্রমশালী আমেরিকাকেও টেক্কা দেয়া সহজ কথা নয় মোটেও– কী পরিমাণ প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা এবং সমরনায়কোচিত সিদ্ধান্ত নিতে পারলে একজন মানুষ সহজেই হয়ে উঠতে পারেন 'হো চি মিন'। যুদ্ধজয়ের বীরত্বগাথাই শুধু নয়, নয় কোনো এক সমরনায়কের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি *হো চি মিনের দেশে* বইটির প্রতিটি পাতা স্মরণ করিয়ে দেয় অবিস্মরণীয় ইতিহাসের গৌরবময়তাকে। রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রাম এবং তৎপরবর্তী স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার লড়াইকে। ফরাসি ও মার্কিনিদের সাথে দগদগে যুদ্ধস্মৃতি, তাদের নাম ঘৃণাভরে স্মরণ করলেও বর্তমানে পালটে যেতে শুরু করেছে ভিয়েতনাম। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে আমেরিকার নাম বাদ দেওয়াতে সেটাই প্রমাণিত হয়। শুরুতে এ জাদুঘরের নামে আমেরিকা ও যুদ্ধাপরাধ শব্দ দুটি থাকলেও বর্তমান নামকরণ একেবারেই 'নির্বিষ'।

জার্মানে শুধু সক্রেটিসের বাড়িই নয়, সমরকুশলী হিসেবে ইতিহাসে ধিকৃত এডলফ

হিটলারেরও বাড়ি। তবু লেখক পজিটিভভাবে দেখেছেন জার্মানকে। তাই তো এ বইয়ের নাম হয়েছে *সক্রেটিসের বাড়ি*। মহান দার্শনিক সক্রেটিসের বাড়ি যে মাটিতে সে দেশের নামকরণ সক্রেটিসের বাড়ি হতেই পারে। এ মাটির আরেকজন কৃতীসন্তানের নাম নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। নেপোলিয়ন শুধু সমরকুশলী মহানায়ক হিসেবেই নয়, খ্যাত দার্শনিক হিসেবেও। তাঁর অনেক উদ্ধৃতি এখনো মানুষের মুখস্থ। এমন একটি উদ্ধৃতি হচ্ছে–'তোমার শেষ ভালো কাজটি তোমার অতীতের খারাপ কাজকে ভুলিয়ে দিতে পারে।' তাঁর অসংখ্য দর্শনঋদ্ধ উদ্ধৃতির মধ্যে মহিলাদের নিয়ে দেওয়া উদ্ধৃতিগুলো এখনও স্মরণীয়। বিশেষ করে জ্যোতিষী যখন নেপোলিয়নের হাতে আঁতিপাঁতি করেও কোনো ভাগ্যরেখা খুঁজে পান নি তখন তিনি তলোয়ার দিয়ে নিজের হাতে রক্তরেখা অঙ্কন করে বলেছিলেন, বিধাতা আমার হাতে ভাগ্যরেখা দেন নি, আমিই আমার হাতে উন্নতির রেখা দিয়ে দিলাম। এই যে মানসিক শক্তি, আত্মবিশ্বাস এখনও মানুষকে উজ্জীবিত করে, সাহস দেয়। ইতিহাস-ঐতিহ্যের সোনালি আকর হিসেবে খ্যাত ল্যুভ'র মিউজিয়াম, আইফেল টাওয়ার, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির মোনালিসা বিতর্ক, সক্রেটিসের হেমলক পান, সনাতন ধর্মের নতুন তত্ত্ব ইত্যাদি অনুপুঙ্খভাবে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাগুণে যেন বার্লিন, এথেন্স, প্যারিসের রাস্তা চোখের সামনে চলে আসে।

কালাপানি পা-ুলিপিতে পাওয়া যায় ইংরেজ শাসনের বিশেষ একটি দিক। ইংরেজদের দ-ক দ্বীপ কালাপানি। পাহাড় এবং সাগরবেষ্টিত এ জায়গায় রয়েছে ৫২৭টি দ্বীপ, অবস্থান ভারত মহাসাগরের পূর্বদিকে। ১৯৭৪ সালে প্যারিস অব ফার ইস্ট নামে প্রসিদ্ধ আন্দামানকে ভেঙে ফেলা হয়। নিকোবর নামে গঠন করা হয় আলাদা জেলা। আন্দামানের নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত এ স্থানে নির্বাসন দেওয়া হতো। ভয়ঙ্কর অপরাধীদের ফাঁসি বা অন্য কোনো সাজা না দিয়ে সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া হতো এখানটায়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার সাক্ষীও এই কালাপানি। কালাপানির গুরুত্বপূর্ণ দিক ছাড়াও এ বইয়ে আরও আলোচিত হয়েছে রস আইল্যান্ড, আন্দামানের বিধ্বংসী সুনামির কথা প্রভৃতি।

আমেরিকা ভ্রমণের অনুপম বিবরণ প্রকাশ পেয়েছে *আমেরিকা : কাছের মানুষ দূরের মানুষ*-এ। সারাবিশ্বের অনেকেরই স্বপ্নের নাম আমেরিকা। বিশেষ করে বাংলাদেশিদের আমেরিকা প্রীতি এবং ভীতি নিয়ে একটা কথা প্রচলিত আছে– আমরা আমেরিকাকে ঘৃণা করি আবার সবাই আমেরিকা যেতে চাই! এ উক্তি নির্মম সত্য। জ্ঞান-গৌরবে অনেক অগ্রসর, সভ্য মানুষের দেশ হিসেবে পরিগণিত হলেও আমেরিকার অকারণ মোড়লিপনা, সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা এবং ছোটো-দুর্বল রাষ্ট্রের প্রতি অযাচিত খবরদারি, নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে গ্যাঞ্জাম জিইয়ে রাখাসহ আরও কত কাজ-অকাজ যে আমেরিকা করে তার ইয়ত্তা নেই। সব বাস্তবতার পরও আমেরিকা বিশ্বের কোটি তরুণের আরাধ্য– স্বপ্নময় ভূমি। কী আছে আমেরিকায়, কেন সে এত টানে? আমেরিকার জীবন রূঢ় আবার এই আমেরিকাতেই আছে নিশ্চিত জীবনের হাতছানি! আমেরিকাই হচ্ছে পৃথিবীর সেই দেশ যেখানে খুব সহজেই স্বর্গ বা নরকের স্বাদ পাওয়া যায়। ডলারের গুণে হাতের কাছে ধরা দেয় অনেক কিছু, আবার ডলার উপার্জনের জন্যেই ঘণ্টার হিসাবে মানুষ রাতদিন প্রাণপাত পরিশ্রম করে চলে। মোদ্দাকথা, এ 'স্বপ্নের দেশ'কে নির্দিষ্ট কোনো ফ্রেমে বাঁধা একটু কঠিনই! আমেরিকায় আছে আর্থিক, সামাজিক আর সচ্ছল জীবনযাপনের মোহ, যা সুখান্বেষী মানুষকে খুব

সহজেই টানে। এই আমেরিকাতেই মানবেতর জীবনযাপন করে এমন মানুষের সংখ্যাও কম নয়। ভিক্ষুকও আছে এই দেশে! তবু সব বুঝে-শুনেই মানুষের এই দেশই আরাধ্য। এহেন আমেরিকার ভালো দিক খুঁজলে যেমন বিস্তর পাওয়া যাবে তেমনি বাজে দিকের ইতিহাসও ছোটো নয়। আমেরিকা এখনও বর্ণবাদ প্রথা টিকিয়ে রেখেছে। কৃষ্ণাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গ বৈষম্য, বাজে প্রথা ভীষণ নগ্নভাবেই পরিস্ফুটিত হয়। আমেরিকা চরম সভ্য এটা যেমন সত্য, আবার চরম অসভ্য এটাও সত্য। অনেক বাংলাদেশিই দেশের 'ভালো' চাকরি ছেড়ে আরও ভালো জীবনযাপনের মোহে পাড়ি জমায় আমেরিকায়। দেশে যারা খ্যাতিমান, আমেরিকায় সেই খ্যাতিমানদেরই কেউ 'পুছে' না। এ ধারার একজন মানুষ মিনার মাহমুদ। অবশ্য তাঁর কাহিনি অন্যদের চেয়ে ভিন্ন। স্বৈরশাসক এরশাদের রোষানলে পড়ে তাকে দেশ ছাড়তে হয়। তাঁর সম্পাদিত সাপ্তাহিক বিচিন্তায় প্রকাশিত বিভিন্ন রাজনৈতিক লেখা গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল এ সামরিক রাষ্ট্রপতির। আমেরিকায় পৌঁছে মিনার মাহমুদ বেছে নেন কষ্টকর জীবন। ট্যাক্সিক্যাব ড্রাইভার হিসেবে শুরু হয় নতুন পথচলা। এক রাতে তাঁর ট্যাক্সিক্যাবে চড়েছেন জনৈক ফরাসি। মিনার মাহমুদের বাড়ি বাংলাদেশে শুনে তিনি প্রশ্ন করলেন, তসলিমা নাসরিনকে চেনেন কিনা।
তসলিমা নাসরিন তখন 'জ্বালাময়ী' কলাম লিখে চারপাশ আলোড়িত করে ফেলেছেন। বিশেষ করে মৌলবাদীদের রোষানলে পড়ে খুব সহজেই তিনি প্রচুর আলোচিত-সমালোচিত। সে সমালোচনার জের ছড়িয়ে পড়েছে দেশ ছাড়িয়ে বাইরেও। তো মিনার মাহমুদ ফরাসি ভদ্রলোকের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'ও আমার বউ ছিল। আমি ওর স্বামী।' ভদ্রলোক তাঁকে পাগল ঠাউরে সাথে সাথেই ভাড়া মিটিয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে যান। এ ঘটনাই আমেরিকার নির্মম জীবন বোঝার জন্যে যথেষ্ট। আমেরিকায় বাংলাদেশীদের জীবনযাপন লেখক খুব নিবি-ড়ভাবে অবলোকন করেছেন। আরও অবলোকন করেছেন গোটা আমেরিকার সমাজব্যবস্থা। স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, বাণিজ্য ও বাণিজ্যিকতার নগরী আমেরিকার বর্ণনা দিতে গিয়ে ক্ষেত্রবিশেষে লেখকের কলম হয়ে ওঠে কাব্যগন্ধী, চমৎকৃত করে ভাষার কারুকাজ–

> শুয়ে পড়ার আগে রাতের লাসভেগাসকে আরেকবার দেখার জন্য ২৩ তলার ওপর থেকে পর্দা ফাঁক করি।
> না, ঠিক রাত নয়। এটাকে ভোর বলে।
> ঘণ্টা খানেক আগে যেখানে কালো পটভূমিতে ঝিকিমিকি আলোর নাচন দেখা গিয়েছিল, এখন তা ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে লাল আলোর দিগন্তরেখা। তার ওপর দিয়ে উঁচু-নিচু ভবনের অবয়ব। ওটিও কি আরেকটি পেইন্টিং? রাতের সব শো শেষ হয়ে যাবার পর এখন যে প্রদর্শনীর আয়োজন হচ্ছে পুবের আকাশে, তার কাছে এই পাপের নগরীর সব আয়োজন বড়ো তুচ্ছ।

কলম্বাসের পর বাংলাদেশীদের আমেরিকা-আবিষ্কারই শুধু নয়, সেখানকার বাঙালি সমাজের কৃষ্টি-সংস্কৃতি-বৈশিষ্ট্য নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। আমেরিকা জীবনসংগ্রামী মানুষের কতটুকু কাছের হতে পারে দূরেরই বা কতটুকু– অনেকটাই বোঝা হয়ে যায়।
আগেই বলা হয়েছে *আমিরাতে তেরোরাত* বইটি দিয়ে শাকুর মজিদের ভ্রমণসাহিত্য পরিক্রমার সূত্রপাত। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালে। প্রকাশক ছিল উৎস প্রকাশন। আমিরাত ভ্রমণের এ গল্পেও উঠে এসেছে প্রবাসী বাংলাদেশীদের

কষ্টগাথা। সব পরবাসেরই প্রায় অভিন্ন চরিত্র–লাঞ্ছনা-বঞ্চনা-অপ্রাপ্তি-বৈষম্য আর দুঃসহ অভিজ্ঞতা। তেমনি আমিরাতে বসবাসকারী বাংলাদেশীরাও ব্যতিক্রম নয়। শত কষ্টেও তারা পরগাছার মতোই পড়ে থাকে বিদেশে। কেন? উত্তর জানাই, তবু লেখকের বর্ণনা থেকে আরেকবার জানা যাক–

> ছানু বলে, জানো শাকুর– এই তেল আর সোনার খনির দেশে বিদেশিদের তারা মানুষ মনে করে না– কিন্তু তারপরও কেউ সহজে এদেশ ছাড়তে চায় না। তার প্রধান কারণ, এখানে তোমার নিরাপত্তা আছে। তুমি সারারাত দরোজা খুলে ঘুমাতে চাও ঘুমাও, কেউ তোমার ক্ষতি করবে না। লাখ টাকার বান্ডিল হাতে নিয়ে মাঝরাতে বাজার থেকে আসো, কেউ তোমার দিকে তাকাবেও না।

সব বাস্তবতার সাথেই আপস করেই বাংলাদেশীরা পড়ে আছে নিষ্ঠুর পরবাসে। শুধু বাংলাদেশীদেরই নয়, সারা বিশ্ব থেকে জীবিকার সন্ধানে আসা মানুষের আখ্যানও বিধৃত হয়েছে এ গ্রন্থে। প্রবাসের আইনশৃঙ্খলা, শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপনের সাথে দেশীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে খুব সহজেই হতাশ হয় বাংলাদেশের মানুষ। দেশের প্রতি একই সাথে হৃদয়ে জাগরুক থাকে ভালোবাসা এবং উগরাতে না পারা বিবমিষা।

আপাতদৃষ্টিতে অনুল্লেখ্য স্থান থেকেও বের করে আনতে পারেন ভিন্নামাত্রিক রূপ-রং-রস। তাঁর হাতে খেলা করে একই সাথে অনেক কিছু। যখন যে দেশে যান, সে দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-সমস্যা-সম্ভাবনা-পর্যটন মুখস্থ করে ফেলেন যেন। তাঁর লেখার অনিবার্য উপাদান– ইতিহাস। ইতিহাসের কাছে বিশ্বস্ত থেকে, সত্যের অপলাপ না ঘটিয়ে শাকুর উলটে যান খেরোখাতা। এতে চকিতে দৃষ্টিগোচর হয় অনেক কিছু। লেখায় তথ্য পাওয়া যায় প্রচুর কিন্তু কখনোই তথ্য ভারাক্রান্ত নয়; ইতিহাসকেও 'সুগার কোটেড' করে পরিবেশন করার অনায়াস দক্ষতা রয়েছে এ লেখকের। নিজে স্থপতি হওয়ায় সারাবিশ্বের নাম করা স্থাপনা, স্থাপত্যশৈলীর প্রতি মনোযোগ দৃষ্টি কাড়ে। এসবও বিশ্লেষণ করেন। যেমন আইফেল টাওয়ার তাঁর কাছে 'ইস্পাতের সাদামাটা খাম্বার সমাহার' মাত্র। 'হুড়মুড় করে এসে এটা দেখার কী আছে?' এমন প্রশ্নও ছুড়ে দেন দর্শনার্থীদের প্রতি। শাকুর মজিদের সাথে ভ্রমণ মানে শুধু আনন্দযাত্রাই নয়, ইতিহাসযাত্রাও। বইটি ৮টি দেশ নিয়ে লেখা হলেও প্রসঙ্গক্রমে দেশ এসেছে ২০টির বেশি। লেখক শব্দ নিয়ে ততটা খেলা করেন না, যতটা খেলা করেন আবেগ নিয়ে। বইটির সবচেয়ে বড়ো যে বৈশিষ্ট্য, প্রচুর প্রাসঙ্গিক ছবি স্থান দেয়া। ছবিগুলোয় ক্যাপশনের সাহায্যে একজন পাঠক খুব সহজেই কাহিনির গভীরে ঢুকে যেতে পারেন। কিছু ছবি নয়নাভিরাম আবার কিছু কিছু ছবি নৃশংসতার সাক্ষী, যাতে অজান্তেই মুচড়ে ওঠে পাঠকের বুক।

'কঞ্জুস'-৬০০তম প্রদর্শনী

মাহফুজা হিলালী

বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনের ইতিহাসে ইতিহাস 'কঞ্জুস'। ২১ এপ্রিল ২০১২ নাটকটির ৬০০তম প্রদর্শনী হলো। 'কঞ্জুস'-এর প্রথম মঞ্চায়ন হয় ১৯৮৮ সালে। কাহিনির সঙ্গে যুক্তিপূর্ণ সংগীত সংযোজন, গতিময় টিমওয়ার্ক এবং মলিয়েরের নাটকের অভিনয় ধারা এ নাটককে ২৪ বছর ধরে প্রাণবন্ত এবং গতিশীল করেছে। এতগুলো বছর ধরে ৫০ জন মানুষ অভিনয় করেছেন 'কঞ্জুস' নাটকে। 'লোক নাট্যদল' সবগুলো মানুষকে পদক দিয়ে সম্মানিত করল এই দিন। এছাড়া যারা টেকনিক্যাল এবং মেকআপে কাজ করেছেন তাদেরকে দেওয়া হয়েছে দলীয় স্মারক। দলীয় স্মারক দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে ২১ এপ্রিলের সম্মানিত অতিথিবৃন্দকেও।

ব্যক্তিগত জীবনে যে কৃপণ, সুদখোর ও লম্পট । এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে তার সংসার । সে এতই কৃপণ যে ছেলে-মেয়ে ও চাকরকে ভালো খেতে পরতে দেয় না– পাছে তার টাকা শেষ হয়ে যায় । সুদের ব্যবসায় লাভ করা অর্থ সে বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে রাখে

১৯৯৪ সালে নাটকের নির্দেশক একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, কমপক্ষে ৩০০ প্রদর্শনী করবেন । তা ছাড়িয়ে গেল 'কঞ্জুস' । ফরাসি নাট্যকার মলিয়ের কমেডিতে হাস্যকৌতুকের মাধ্যমে সমাজের অসঙ্গতিকে তুলে ধরেন । তিনি মানুষের কপটতা ও ভ-ামি, লোভ ও অর্থগৃধ্নুতা, মিথ্যা মর্যাদাবোধ প্রভৃতি নানা বিকার ও বিচ্যুতিকে ঈর্ষণীয় শিল্প নৈপুণ্যের সাথে প্রচ- কৌতুকরসাশ্রিত করে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন । ব্যবহার করেছেন জীবনের সাধারণ ভাষা । স্ল্যাংয়ের ব্যবহারও করেছেন অনেক । সে সময়ে তাঁর নাটক সাহিত্যমূল্যবিহীনতায় দুষ্ট বলে তীব্রভাবে সমালোচিতও হয়েছে । নাটকে অতিরঞ্জন ও অতিশয়োক্তি, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ- বিদ্রুপ, ভঁ-াড়ামি, শেষ দিকে নাটকীয় যোগাযোগ ও মিষ্টি মধুর সমাপ্তি ইত্যাদি উপকরণকে স্থূল প্রহসন বলে নিন্দা করা হয়েছে । কিন্তু কালের পথ বেয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন সর্বজনীন ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক নাট্যকার ।

মলিয়েরের নাটকে একটি বিশেষ গতি রক্ষা করতে হয় । সেই গতি ও সময়ের যথার্থ ব্যবহার ব্যাহত হলে নাট্য প্রযোজনা দুর্বল হয়ে পড়ে । নাটকের গতির সাথে সংলাপ, শারীরিক অভিনয়, জেস্‌চার-পোস্‌চার ও সঠিক সময় জ্ঞান একজন অভিনেতার জন্য প্রাক-শর্ত । এই শর্তপূরণে ব্যর্থ হলে মলিয়েরি নাট্যসুর নষ্ট হবে । তাই অভিনেতা-অভিনেত্রীদের একটা বিশেষ প্রস্তুতি নিতে হয় । নাটকটি দেখে বোঝা যায়, নির্দেশক লিয়াকত আলী লাকী তাঁর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দিয়ে সেই কাজটি করিয়ে নিয়েছেন সার্থকভাবেই ।

নাটকের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে হায়দার নামে এক ব্যক্তিকে ঘিরে । ব্যক্তিগত জীবনে যে কৃপণ, সুদখোর ও লম্পট । এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে তার সংসার । সে এতই কৃপণ যে ছেলে-মেয়ে ও চাকরকে ভালো খেতে পরতে দেয় না– পাছে তার টাকা শেষ হয়ে যায় । সুদের ব্যবসায় লাভ করা অর্থ সে বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে রাখে, যদি চোর-ডাকাত কিংবা ছেলে-মেয়েরা নিয়ে যায় । পৃথিবীর কাউকে সে বিশ্বাস করে না । হায়দারের মেয়ে লাইলী যাকে ভালোবাসে সে এক অভিজাত বংশের হারিয়ে যাওয়া ছেলে বদিউজ্জামান । লাইলীকে পাবার আশায় বদিউজ্জামান চাকরের কাজ নেয় হায়দারের বাড়িতে । বদিউজ্জামান বিশ্বাসযোগ্যতাও অর্জন করে হায়দারের । এদিকে, হায়দারের ছেলে কাযিম ভালোবাসে মর্জিনা নামে এক মেয়েকে । অন্যদিন মর্জিনাকে দেখে হায়দারের ভিমরতি ধরে । সে পয়গাম পাঠায় মর্জিনাকে বিয়ে করার জন্যে । একই সাথে, যৌতুকের ভয়ে হায়দার এক বুড়োর সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে ঠিক করে । এবং যৌতুক পাবার লোভে এক বিধবার সাথে কাযিমের বিয়ে ঠিক করে । মেয়ে এর তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ে । কিন্তু হায়দার তার সিদ্ধান্তে অটল ।

এক সময় হায়দারের ছেলে জানতে পারে যে, মর্জিনাকে তার পিতা বিয়ে করতে যাচ্ছে । শুরু হয় পিতা-পুত্রের দ্বন্দ্ব । এ দ্বন্দ্ব এবং পারস্পরিক ঘটনায় নাটকের কাহিনি জমে ওঠে । এক পর্যায়ে, কাযিম এবং চাকর লাল মিয়া দুজনে বাগানে

লুকানো টাকার কলস নিয়ে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় কঞ্জুস হায়দার দিশেহারা হয়ে পড়ে। পুলিশ ডাকে। পুলিশি তদন্তের এক পর্যায়ে ছেলে এবং চাকর টাকার কলস নিয়ে আসে। ছেলে শর্ত দেয় মর্জিনাকে ফিরিয়ে দিলে সে টাকার কলস ফিরিয়ে দেবে। হায়দার ছেলের শর্তে রাজি হয়ে যায়। সর্বশেষে মর্জিনা এবং বদিউজ্জামানের মা-বাবার পরিচয় এবং হায়দারের ছেলে-মেয়ের সাথে মর্জিনা-বদিউজ্জামানের বিয়ের মধ্য দিয়ে নাটকের সমাপ্তি ঘটে।

নাটকটি পুরান ঢাকার বাসিন্দাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবন ও সংস্কৃতির ওপর রূপান্তরিত করেছেন তারিক আনাম। যারা উর্দু ও বাংলা ভাষার মিশ্রণে এক বিশেষ ধারায় কথা বলে, তাদের জীবনধারার আবহ তৈরি করার জন্যে পুরনো হিন্দি গান ব্যবহৃত হয়েছে নাটকে। সমাজের ধনকুবেরদের মানসিক বিকারও স্পষ্ট হয়েছে নাটকে। আমরা জানি যে, মলিয়ের সাধারণত সংলাপনির্ভর নাটক লেখেন। এই নাটকটিও সাহিত্যনির্ভর নয়, সংলাপনির্ভর। পুরান ঢাকার ভাষায় অনূদিত সংলাপগুলো দর্শককে আকৃষ্ট করে রাখে, সেইসঙ্গে কেন্দ্রীভূতও করে। তারা শুধু হাসিতেই মেতে ওঠেন না, অন্তর্নিহিত ভাবও অনুভব করেন। পোশাক এবং আলো 'কঞ্জুসে'র সৌন্দর্যকে ঝলমলে করে তুলেছে। বাংলাদেশের গণ্ডি-ছাড়িয়ে বিশ্বের বিভিন্ন মঞ্চদর্শকের মনকে উদ্বেলিত করেছে 'কঞ্জুস'। ইংল্যান্ডসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মঞ্চস্থ হয়েছে নাটকটি।

এ নাটক নিয়ে একটি স্মৃতির কথা বলি। ২০০২ সালের নভেম্বর মাস। তার মাত্র দু মাস আগে আমি আমার আব্বাকে হারিয়েছিলাম। পৃথিবী তখন আমার কাছে অন্ধকার। সমস্ত মন সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে কান্নাটাই আছে, হাসতে পারি না। তখন আমি পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশনের সমন্বয়কারী এবং শিশুনাট্য পত্রিকার সম্পাদকম-লীর সদস্য হিসেবে কাজ করছি। এ মাসেরই কোনো একদিন মহিলা সমিতিতে মঞ্চস্থ হলো লিয়াকত আলী লাকী নির্দেশিত 'কঞ্জুস'। নাটকটি দেখতে দেখতে এক সময় আবিষ্কার করলাম, আমি হাসছি। আমার তখন অপরাধবোধ কাজ করছিল; মনে হচ্ছিল, 'আমার বাবা মারা গেছেন, আমি হাসছি কীভাবে!' কিন্তু আজ এত বছর পর মনে হয় 'কঞ্জুস' আমাকে নতুন করে জীবনমুখী হতে প্রথম ধাক্কাটি দিয়েছিল।

বাংলাদেশের নাটকের ইতিহাসে কোনো নাটকের ৬০০তম প্রদর্শনী এই প্রথম। আমরা এবার আশা করতেই পারি 'হাজার রজনী' অতিক্রম করবে 'কঞ্জুস'।

২০০২ সালের নভেম্বর মাস। তার মাত্র দু মাস আগে আমি আমার আব্বাকে হারিয়েছিলাম। পৃথিবী তখন আমার কাছে অন্ধকার। সমস্ত মন সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে কান্নাটাই আছে, হাসতে পারি না। তখন আমি পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশনের সমন্বয়কারী এবং শিশুনাট্য পত্রিকার সম্পাদকম-লীর সদস্য হিসেবে কাজ করছি

ঢাকা আর্ট সামিট
প্রদর্শনকলার নবতর মাত্রা
গোঁসাই পাহ্‌লভী

সৃজনশীল যে কোনো কাজ প্রদর্শনধর্মী হতে হয়। প্রদর্শনের জন্যে ক্ষেত্র প্রয়োজন। কাজের ধরন এবং প্রদর্শন ক্ষেত্রের আকার-প্রকার মাখামাখিভাবে জড়িত। আধুনিকতা এইসব শর্তের প্রতি আনুগত্য রাখতে বাধ্য করেছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটে নি। গত এক দশকে অনেকগুলো গ্যালারি, দর্শক এবং শিল্পবোদ্ধার পাশাপাশি শিল্পসংগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক শ্রেণি গড়ে উঠেছে। ব্যাপ্তি ঘটেছে বাংলাদেশের চারুকলার অঙ্গন।

ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী নবীন, জাতীয় এবং এশিয়ান দ্বিবার্ষিক শিল্পকলা প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকে। এই

রশিদ চৌধুরীর কাজের বিষয়বস্তু নবান্ন হলেও প্রকাশভঙ্গির কারণে গুহাচিত্র বলে ভাবাটা অন্যায় হবে না। গাভিন ও বাছুরের লম্ফন ও গ্রাম্য বালিকার রাখালির ভূমিকা অত্যন্ত ভগ্নতারই দৃশ্যায়ন

তিনটির দুটি জাতীয় এবং এশিয়ান দ্বিবার্ষিক আন্তর্জাতিক এবং বৃহৎ মানের। সামদানি আর্ট ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে নবতর উদ্দীপনা নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ঢাকা আর্ট সামিট। এই সামিট বাংলাদেশের শিল্পকলার ইতিহাসে নবতর মাত্রা যোগ করতে পারল কি না এটা এখনও আলাপ-আলোচনা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ এবং গভীর উদ্বেগের পরিবেশে নাগরিকদের জীবন যাপন। শিল্পীরাও এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই শিল্পকর্মে এসবের প্রভাব পড়বে স্বাভাবিকভাবেই।

ঢাকা আর্ট সামিটে নবীন শিল্পী থেকে ঊর্ধ্বতন প্রায় সকল বয়সী শিল্পীর কাজই প্রদর্শিত হয়েছে। জয়নুল আবেদিন থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া দ্বিতীয় বর্ষের শিল্প শিক্ষার্থীর শিল্পকর্মও এই প্রদর্শনীতে আশ্রয়লাভ করেছে। এটা যে কোনো নাগরিকের জন্যে তো বটেই একজন শিল্পবোদ্ধার জন্যেও আনন্দিত হবার বিষয়। এই সুযোগে শিল্পীদের প্রকাশভঙ্গি, শিল্পবৈচিত্র্য এবং সমাজ রাষ্ট্র ভূগোল সম্পর্কে শিল্পীদের চিন্তাভাবনা জেনে নেওয়া যাচ্ছে। অতএব আয়োজক পক্ষকে প্রথমেই সাধুবাদ জানিয়ে রাখি।

ঢাকা আর্ট সামিটে মোট ২৫৮ জন শিল্পীর শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়েছে। এর মধ্যে ২৭ জন প্রবীণ ও প্রয়াত শিল্পীর কাজ রয়েছে। জয়নুল আবেদিনের মনপুরা ছাড়া বাকি অন্য শিল্পীদের প্রায় সব কাজই বাংলাদেশের মানুষ, এখানকার লোকসমাজ, নগর, মিথ এবং ব্যক্তিক পর্যায়ের অভিব্যক্তি প্রকাশিত। নবান্ন কেন্দ্র করে ছবি এঁকেছেন শিল্পী আব্দুর রাজ্জাক, শিল্পী আনোয়ারুল হক, হাশেম খান, রশীদ চৌধুরী, সমরজিৎ রায় চৌধুরী এবং সৈয়দ সফিকুল হোসেইন। সফিকুল হোসেইনের কাজ জ্যামিতিক। দুটি ফিগারের সমন্বয়ে। মাতৃকা অবয়ব উপবেশিত। অপরটি নৃত্যরত। হলুদ বাদামি ও লাল রঙের যৌথ আঁচড়ে নবান্নের আবহ পুরোমাত্রায় স্থিত। অবশ্য বিষয় বস্তুর উলম্বিক বিন্যাসের সাথে দর্শকদের মানিয়ে নিতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। কারণ বাংলাদেশ উলম্বিক কাঠামোতে (ভার্টিকাল স্ট্রাকচার) দেখে ও বসবাস করতে অভ্যস্ত নয়। সমরজিতের ছবির পটভূমি অনেকটা ভূমিসংশ্লিষ্ট। জ্যামিতিক আঙ্গিকে প্রকাশিত হলেও এ ছবি রেখার প্রাধান্যে আঁকা নয়। ফর্মের আধিক্য আছে। গাছ গাছালি বেষ্টিত মেঠোপথ দিয়ে ফসল মাথায় করে বাড়ি ফিরছেন কৃষক কৃষানি। ফিগার দুটি গতিশীল অবস্থায় তুলে ধরার কারণে ছবিটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। রশিদ চৌধুরীর কাজের বিষয়বস্তু নবান্ন হলেও প্রকাশভঙ্গির কারণে গুহাচিত্র বলে ভাবাটা অন্যায় হবে না। গাভিন ও বাছুরের লম্ফন ও গ্রাম্য বালিকার রাখালির ভূমিকা অত্যন্ত ভগ্নতারই দৃশ্যায়ন। আনোয়ারুল হকের ছবিটিও তাই। কৃষিভিত্তিক আদ্যকাহিনি চিত্রায়িত হলেও গুহাচিত্রের বৈশিষ্ট্য নিয়েই ছবিটি দেখতে পেয়েছি আমরা। আব্দুর রাজ্জাকের নবান্নে ধানকাটা পরবর্তী ক্ষেতের দৃশ্য। পোস্ট ইমপ্রেশনিস্টদের

বিশেষভাবে ভ্যান গঁগের ছোপ ছোপ রঙে তুলির আঁচড় প্রভাবশিষ্ট। বিজন চৌধুরীর (ফোক সং) কাজে পালাগানের আসর. কিবরিয়ার (ফলমুন) ছবিতে জ্যামিতিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে রোমান্টিক অভিব্যক্তি, মুস্তাফা মনোয়ার, রফিকুন নবীর বড়ো কাটরা ও সফিকুল আমিনের টি স্টল শহরের আদি নকশার সাক্ষ্য। এই পর্বের কাজগুলো মূলত স্বাধীনতার পূর্ববর্তীকালীন আঁকা। একই সাথে বাস্তববাদের। রিয়েলিজমের চর্চা থেকে কিছুটা সরে এসে পাশ্চাত্য ঢঙে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর প্রথম পর্ব এটি। অবশ্য এই সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরও দর্শক তাদের কাজের সাথে নিজেদের পরিচিত করতে পারেন সহজেই। কারণ, তখনো তাদের কাজে ভূগোল অত্যন্ত জোরাল ভাবেই উপস্থিত। কামরুল হাসানের বেঙ্গলি গার্ল মাতিস কিংবা পিকাসোর রমণীদের মুখাবয়বের একটা চূড়ান্ত পর্যায়। পটুয়ার আরোপিত পদমর্যাদায় যা এখনও ঢাকা পড়ে আছে। কাইয়ুম চৌধুরীর 'গার্ডেন', মোহাম্মদ মহসিনের 'ডেথ অটাম' বা কাজী আব্দুল বাসেতের 'অটাম' ছবিগুলোর প্রকাশভঙ্গি, রঙের ব্যবহার এবং বিন্যাসের কাঠামো দেখে পাঠককে হাতড়াতে হবে এইসব শরৎকাল কোন আবহাওয়া বা জলবায়ুর!

আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়কালেই চারুকলা চর্চায় অনেকটাই প্রাধান্য পেয়েছে দেশীয় ঐতিহ্য, ভূগোল এবং আবহাওয়া জলবায়ুর বাস্তবিক অভিজ্ঞতা। বাস্তববাদ ও বাস্তবতাবাদের আদলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সূচনা। জয়নুল ও সুলতানের পরই পটভূমি পালটাতে শুরু করে। প্রথমে তাদের কাজে সরাসরি হাজির হলো পাশ্চাত্যের ইজমভিত্তিক ধারা। পরবর্তী অধ্যায়ে কেবলই পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এবং গত দুই যুগ ধরে পাশ্চাত্যের নিত্যনতুন শিল্পতত্ত্বের প্রভাবে মুখ্য হয়ে দাঁড়াল কনসেপ্ট সর্বস্বতা। শিল্পকর্ম যথারীতি গৌণ বিষয়। বিশ্বায়নের দোহাই দিয়ে ক্রমশ দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে সরে যাওয়া।

এবার আমরা ক্রমশ আলো ফেলব ২০২ জন নবীন এবং প্রবীণ শিল্পীর কাজের দিকে।

এ পর্বের কাজের ধরন বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদ, বিনির্মাণ, শিকারি জীবন, আদিম অধ্যবসায়, বাস্তবতা, অধিবাস্তবতা, অন্তর্গত সত্য, বোধ এবং তথাকথিত য়ুরোপীয় আধুনিকতা এবং উত্তরাধুনিকতাবাদের আধিপত্য চোখে পড়ার মতো। কেবলই ইমেজ তৈরি করার প্রবণতা। নারীর ভেতর অবিরাম চামড়াসর্বস্ব সৌন্দর্য খুঁজে চলার ব্যাধি, শৈশব স্মৃতি, অন্তর্গত

‘ আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়কালেই চারুকলা চর্চায় অনেকটাই প্রাধান্য পেয়েছে দেশীয় ঐতিহ্য, ভূগোল এবং আবহাওয়া জলবায়ুর বাস্তবিক অভিজ্ঞতা। বাস্তববাদ ও বাস্তবতাবাদের আদলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সূচনা। জয়নুল ও সুলতানের পরই পটভূমি পালটাতে শুরু করে

রোমান্টিকতার প্রভাব হাজির আছে কাজগুলোতে। সমসাময়িকতার দোহাই দিয়ে বিষয়বস্তুর ক্লিশে উপস্থাপন অনভিপ্রেত। আবুল বারক আলভি, আহমেদ নাজির 'দ্য ওয়ার ফাইল-৯৮), বীরেন সোম (ইমোশন রেড), গোলাম ফারুক (মুন অ্যান্ড ব্রোকেন হাউস), ইফতেখার উদ্দিন আহমেদ, কাজী গিয়াস উদ্দিন, কাজী সালাউ-দ্দিন আহমেদ (সের কাওস), কাজী সাইয়িদ আহমেদ (রিকনস্ট্রাকশন), কুহু প্লামন্দন (আনটাইটেল), এম. আর দিদার (ল্যান্ডস্কেপ), মাকসুদা ইকবাল নিপা (স্প্রিং), এমডি. মাহমুদ শরিফ খান (কলাপস), এমডি মুসলিম মিয়া (ইমেজ ইন প্রিন্ট), এমডি. সাফিন ওমর (আমাদের প্রতিবিম্ব), এমডি. টোকন (মিডনাইট), মেহেরিন ইউসুফ, মিন্টু দে (চাইল্ডহুড), মোহাম্মদ ইউনুস (দগ্ধ), মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম (ইমেজ ৩০০২), মোহাম্মদ মহসিন (নেচার), মনিরুল ইসলাম (দ্য ওমান অ্যান্ড হার ওয়ার্ল্ড), মোস্তাফিজুল হক (নেচার অ্যান্ড ফিগার), নগরবাসী বার্মণ (নেচার অ্যান্ড লাইফ-২), নাজমা আকতার (হিউমিড স্কেপ), নাসিমা খানম কুইনি (দেয়ার হেবিটেন্ট ১), রশিদ আমিন (ইন সার্চ অব ইনফিনিটি), রেজাউন নবী (ল্যান্ড অব বার্ডস-২), সমরজিৎ রায় চৌধুরী (পেইন্টিং ইন ব্লু), সমীরন চৌধুরী (নেচার), সৈয়দ হাসান মাহমুদ (পৌষ), সর্বরী রায় চৌধুরী (ফ্লাইং বার্ড), সুমনা আক্তার (পাতা), সৈয়দ জাহিদ ইকবাল(ডার্কনেস) এই সব। অধিকাংশ শিল্পীর কাজে বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদী শিল্পী মার্ক টোবে, একশন পেইন্টিং, মার্ক রথকো, মাতিস, পিকাসো, কান্দিনেস্কি, গিরহাড রিক্টার ও জন মিরোর প্রভাব স্পষ্ট। যথারীতি তাদের কাজের কোনো ভূগোল খুঁজে পাওয়াটাও কষ্টসাধ্য। একই সাথে নিজস্ব স্টাইল হিসেবে কাজের ধরন দাঁড় করাতে গিয়ে পুনরাবৃত্তি হয়েছে। আমরা বলছি না যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থাকবে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থাকবে। প্রকাশভঙ্গি অপরিবর্তিত হলেও বিষয়ের কারণে শিল্পকর্মে বৈচিত্র্য আসবে– এটাই দর্শক আশা করেন।

আফরোজা জামাল কঙ্কার 'বীরাঙ্গনা ৭১' ক্যানভাসে, অ্যাক্রেলিকে আঁকা। নারী কাক ও জানালার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে থাকা রমণীর মুখ। হামিদুর রহমানের নারী চোখের সাথে যার অনেক মিল আছে। গাঢ় লাল যুদ্ধকালীন সময়কে

প্রতিবিম্বিত করে। আহমেদ শামসুদ্দোহার 'রেইন' সদ্য সমাপ্ত বৃষ্টিতে ভেজা জবা ফুল ও পাতার সতেজতা একই সাথে কোমলতার ভাব এনে দেয়। আনিসুজ্জামান সোহেলের 'গোটস মাস্ট বি ক্রেজি' মিশ্র মাধ্যম। ছবিটির ফোকাল পয়েন্টে একটি চেয়ার যার ওপরে একটি ছাগল। অদূরে ডানে চাপাতির ওপরেও; সম্মুখস্থ দাঁড়ানো ছাগলের একটির শরীরে রয়েল বেঙ্গলের ডিজাইন। বাম পাশের ছাগশরীরে বিচরণ করছে আরও কতগুলো ছাগ। ছবিটি রাজনৈতিক। একই সাথে সাংকেতিক। আরিফুল ইসলামের 'লাইফ অন দ্য হুইল' মানুষের সাথে চাকার ব্যবহার এবং গতির জন্যে ঘোড়ার ব্যবহার দেখান হয়েছে।
অসিত কুমার মিত্রের 'হে আনন্দ হে পরমেশ্বর' একটি উৎকৃষ্ট উডব্লক প্রিন্ট। লায়লা শারমিনের পেপারে মিশ্র মাধ্যমে আঁকা ছবিটির নাম 'দাত্তা দয়াদধাম-দাময়াত্মা শান্তি-শান্তি -শান্তি-৪' ধর্মীয় বিষয়বস্তু হলেও প্রকাশভঙ্গি আধুনিক। দেওয়ান মিজানের 'মেটামরফসিস' ধ্যানস্থ অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে মানুষের রূপান্তরের সাক্ষ্য বহন করছে। ভেতরে ডামি টরসো। ওপরে মানুষের মাথা। সম্মুখস্থ ফিগার এবং মস্তিষ্ক বরাবর ওপরিস্থ আলোক রশ্মি কু-লিনী ইয়োগার সঙ্কেতে বর্তমান। আতিয়া ইসলাম এ্যানির 'গুড মর্নিং' অ্যাক্রেলিক মাধ্যমে আঁকা । হাতের বিভিন্ন মুদ্রাসমেত মাথা হাত এবং পা বাঁধা অবস্থা নির্মমতার বিপরীতে
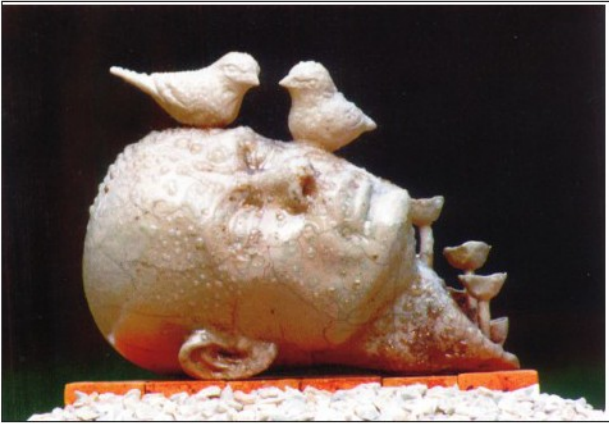
ফ্যান্টাসি বহন করছে। বিভোল সাহা মূলত জলরং মাধ্যমে সিদ্ধহস্ত বলেই আমরা জানি। প্রদর্শিত শিল্পকর্মটি স্থাপনাধর্মী। কাজের নাম 'হিউম্যানিজম ইন প্রেসেন্ট ডে'। দেয়ালে সাঁটানো টয়লেট পেপার বক্সের সারি। পেপার বের হয়ে আছে সামান্য। সামনের ফ্লোর দিয়ে কাগজে কাটা পায়ের মাপের সংস্থাপিত আকার। সম্মুখস্থ ফ্লোরে ও ওপরস্থ কাগজে লেখা হিউম্যানিজম। এ চিত্র ভয়াবহ। একই সাথে জানান দিচ্ছে মানবতাবাদের বর্তমান অবস্থা। ঢালি আল মামুনের 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' তেল রং মাধ্যমে আঁকা। বোধ করি এটা তাঁর পূর্বেকার আঁকা একটি ছবি। রয়েল বেঙ্গলের গর্ভে বেড়াল ছানা এবং যার মুখে মাছ। অস্পষ্টভাবে

মানুষের অবয়ব। ফিল্মের নেগেটিভের মতো অনেকটা। দুলাল চন্দ্র গায়েনের 'হানটার-৬' আদিম মানুষের শিকারি জীবন প্রতিবিম্বিত। ফিরোজ মাহমুদের থিম ইতিহাসভিত্তিক। বিশেষত পলাশীর ইতিহাস আশ্রয় করে তরুণ প্রজন্মের নিজেদের রাজনৈতিক ইতিহাস পুনঃপাঠ করার প্রবণতারই সাক্ষ্য বহন করছে। দীর্ঘ দিন পর দর্শক হাসি চক্রবর্তীর একটি কাজ দেখতে পেল। তৈলরঙে আঁকা ছবিটির নাম 'স্যালভেশন'। মানুষ ও ছাগমুখাবয়বে একাকার হয়ে যাওয়া একটি বিন্যাস। ছবিটি দেখা মাত্র মনে পড়ে যাচ্ছে মার্ক শাগালের কথা। তার ছবির বিষয় বস্তুতে প্রাধান্য পেত ছাগ। কারণ এই পশুটির জবেহ তিনি সহ্য করতে পারেন নি। বিনিময়ে বলেছেন, কথা দিয়েছেন আমি তোমাকে রক্ষা করতে না পারলেও তোমার মাংস খাব না আমি। জাফরিন গুলশানের কাজের ধরন তার ছবির নামকরণের মতোই স্পষ্ট। উডকাঠের প্রিন্ট চিত্রটির নাম 'সোশ্যাল রিয়ালিজম অ্যান্ড ফ্যান্টাসি'। বিশ্রামরত অন্তর্বাস পরিহিতা রমণীর রয়েছে পাখা। পাশে রাখা বই। টেবিলে দাঁড়ান মোরগ ফিরে দেখছে। লাল ঝুঁটি। ওপরে ছেঁড়া প্যাডকাগজে আঁকা ছবি একপ্রকার অধিবাস্তবতা তৈরি করছে। জয়া শাহরিন হকের কাজে মিথলজি আছে। পাশাপাশি মিথের অভ্যন্তরে আত্মপ্রবাহনও আছে। বর্তমান সময়ে মানুষের জীবন যাপনে অসহ্য বাস্তবতার চিত্র ফুটে উঠেছে এমডি. জয়নাল আবেদিন আজাদের কাজে। এমডি. মুনিরুজ্জামানের কাজে গৃহহীন মানুষের গল্প থাকলেও রঙের ব্যবহারে সমসাময়িক বাস্তবতার চিত্র ফুটে না উঠে রোমান্টিক আবহ সৃষ্টি হয়েছে। সিনেমার পোস্টার এবং আলোকসজ্জার ঢঙে মোহাম্মাদ ওয়াহিদুজ্জামানের 'কান্ট্রি অব রাইজিং স্যাডনেস' একটি স্থাপনাধর্মী কাজ।

মোখলেসুর রহমানের উডকাট প্রিন্ট সাথে প্যালেট, প্রদর্শন কলায় এক চমক সৃষ্টি করেছিল। এ কারণে তিনি এশিয়ান দ্বিবার্ষিকীতে সেরা পদকও পেয়েছেন। 'সেকরেশন' শিরোনামে তিনি মাটি এবং তার রং নিয়ে বহু পরীক্ষানিরীক্ষার ফলাফল তুলে ধরেছেন। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে আধুনিক বিমূর্ত চিত্রকলার মতো তাঁর কাজ কেবলই ইমেজ সর্বস্বতা নয়। মাটির অভ্যন্তরীণ গল্পগাঁথাও রয়েছে তাঁর চিত্রে। মুস্তফা জামানের 'এপিক স্টোরিস অ্যাবাউট হ্যান্ডস অ্যান্ড ইঁস পলিটিক্যাল ইম্পলিকেশন' ছবিটিতে হাত এবং হাতের রাজনৈতিক ব্যবহারের কথা বলা হচ্ছে। যেন 'ভবিষ্যৎ আপনার হাতে/দয়া করে হাত মারবেন না'। যদিও আমরা রক্তাক্ত হাত দেখছি। দেখছি না দেখে হাত চালানোর করুণ পরিণতি। নাসিম আহমেদ নাদভির ছবিতে কাঁটা বেষ্টিত ফুল। যদিও স্বতন্ত্র ভাবে আমরা ফুলটির সৌন্দর্য অনুভব করতে পারছি। যুক্ত থেকেও সৌন্দর্য সকল কিছু থেকে নিজেকে বিযুক্ত করেই প্রকাশিত হতে পারে এমন একটি উদাহরণ এটি। টিকিটের আদলে সারফেসের ওপর অপেক্ষমাণ মানুষের সারি যাত্রা প্রস্তুতির ইঙ্গিত। বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজিতে লেখা হ্যাপি জার্নি। এচিং মাধ্যমের এই ছাপচিত্রটির ড্রইং, অভিব্যক্তি এবং বিন্যাস অত্যন্ত সরল। ডার্ক টোনের ব্যবহার কাব্যময়তা সৃষ্টি করেছে। নিত্যানন্দ গায়েন অবশ্য ছবিটিতে লেটারিং ব্যবহার আরেকটু কমালে পারতেন। নুরুন নাহার পাপার ছবিতে মিস্টিসিজম আছে। আলোর ব্যবহারে কোথাও ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। আকাশে বাদামি নীলের ব্যবহার চমৎকার। অনুষঙ্গ হিসেবে ঘোড়া এবং ঘোড়সওয়ার স্বাভাবিকভাবেই এ দেশীয় আধ্যাত্মিকতার ইমেজে স্বাভাবিক নয়। ছবিটি ম্যাজিক রিয়ালিস্টিক সন্দেহ নেই। রফিক আজাদের কবিতার মতো : চৈত্রের জ্যোৎস্নায়/শস্যহীন শূন্য মাঠে/ দাঁড়িয়ে

রয়েছে এক ঘোড়া ইত্যাদি। কবিতা এবং চিত্রকলা পাশাপাশি বেড়ে ওঠা, নিজেদের মধ্যে ভাবনার প্রতিবিম্ব ফেলা অত্যন্ত পজিটিভ। বিভিন্ন দেশের শিল্পান্দোলন স্টাডি করলে আমরা দেখতে পাই, শিল্পকলার কোনো ক্ষেত্রই নিজেদের অন্য ক্ষেত্রগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করে নি।
আর এ কাজলের ছবিতে রয়েছে যৌন অভিব্যক্তির নানাদিক সাথে সাইকোলজিক্যাল প্যানাটেশন। মুখাবয়বের অবস্থান এবং দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্কেত বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। যেমনটা আমরা লুসিয়ান ফ্রয়েডের কাজে দেখতে পাই। সনজিব বড়ুয়ার 'টাইম অ্যান্ড জার্নি' বিপরীতমুখী বাস্তবতার নজির। মানুষের জীবনযাত্রা ফুল বিছানো বা সবুজ পথে নয়। অমসৃণ এবং কণ্টকাকীর্ণ। জবাফুলের অলঙ্করণে চটি স্যানডেল আলোকিত। কিন্তু সেই স্যানডেলের তলে দেখি চাপা পড়ে পিষ্ট হচ্ছে জবা ফুল। প্রতীকী অর্থে এইসব এসেছে মানব
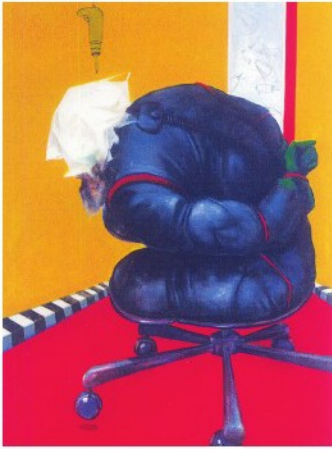
জীবনের পরস্পরবিরোধী আচরণের দৃষ্টান্ত থেকে। শাহাদাত হোসেন বিমূর্ত ধারায় লাস্যক গুহার ইমেজটি ধরতে চেয়েছে। ফ্যান্টাসির মাধ্যমে বাংলা সিনেমার বর্তমান অবস্থাকে তুলে ধরেছেন শিশির ভট্টাচার্য। হাতের বিভিন্ন মুদ্রা, দেহভঙ্গি, নায়ক-নায়িকার মুখ, হেলিকপ্টার সব মিলিয়ে একটি যজ্ঞ। নিঃশেষিত সজীবতা, মৃতবৎ প্রকৃতির প্রাণহীন অবস্থার মধ্যে মানুষটির হাতে ধরা গোলাপটি জীবন্ত। অথচ টেবিলের ওপরে জারে সাজানো গোলাপটি মৃত। বিন্যাসে কিংবা টোনের ব্যবহারে উডকাট মাধ্যমের এই ছাপচিত্র রূপান্তরিত হয়েছে একটি উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মে। সুমন কুমার বৈদ্যের 'আই ওয়ান্ট টু পিস' একই রিকশায় অবস্থানরত তিনজন মানুষের স্বতন্ত্র বাসনার প্রকাশ ঘটেছে ভিন্ন ভিন্ন দেহভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে। জলরঙে রিকশার এরকম ডিটেলিং কাজ সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে না। ইমপ্রেশনিজমের ধারায় আবদুল্লাহ খালিদের সোনালু ফুল বাস্তবধর্মিতায় থেকেও

এক অনিন্দ্য বিমূর্ত আনন্দে আমাদের উজ্জীবিত করে। সৈয়দ জাহাঙ্গীরের কাজও তাই। 'নদীর একূল ভাঙে ওকূল গড়ে এই তো নদীর খেলা' রিয়েলিস্টিক ভঙ্গিমার হলেও রং এবং ছবির আবহে এক প্রকার মিস্টিকতা গড়ে উঠেছে। জোর করে ভালো থাকার বাসনা, জোর করে আনন্দিত হবার নাগরিক প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করেছেন টিটু দেব নাথ। মধ্যবিত্ত নাগরিকের চোখ এবং তাদের স্বপ্ন, সীমাবদ্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে দূরে যা কিছু দেখতে চাওয়ার ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে যুবরাজের ছবিতে। 'ড্রিমস কাম ট্রু' সম্মুখস্থ বৃক্ষ, বলাকা এবং তারই সামনে দিয়ে প্রবাহিত নদী, তীরবর্তী সুরম্য প্রসাদ সব মিলিয়ে এক আদর্শ জীবন যাপনের সূচক।

ফটোগ্রাফি এবং কোলাজ নির্ভর কাজ করেছেন অনেকেই। যাদের মধ্যে আরিফুর রাহমান মুনির, মুনেম ওয়াসিফ, সাইফুল হক অমি এবং সুমন আহমেদ অন্যতম। সুমনের কাজে যুদ্ধবন্দি অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে। গুয়েতেমালার কারাগার থেকে বের হওয়া এরকম অনেক দৃশ্যই আমরা দেখি। অমির কাজে জাহাজভাঙা শ্রমিকদের ভাঙা অসহায় পুষ্টিহীন মুখ ফুটে উঠেছে। বারবি ডল সংস্কৃতি আমাদের দেশে অতটা সাধারণ নয়। বারবি যৌনতা এবং রাজনীতি তো নয়ই।

বারবিভিত্তিক ফটোগ্রাফি চিত্রবিন্যাস করেছেন ওয়াকিলুর রাহমান। অতিসাম্প্রতিক সময়ে নাগরিক জীবন যাপনের অভ্যাস নিয়ে সিলভিয়া নাজনীনের কোলাজ চিত্র 'বিয়ন্ড দ্য হরাইজন'।

ভিডিও ইনস্টলেশন এবং স্থাপনাধর্মী কাজ করেছেন যাদের মধ্যে আইভি জামান, মাহবুবুর রহমান, মনজুর আহমেদ, নাজিয়া আন্দালিব প্রিমা অন্যতম। প্রকৃতি, আলোছায়ার খেলা এবং সমকালীন পুঁজিবাদের বিবিধ নির্মাণ প্রাধান্য পেয়েছে। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে বৃহৎ পরিসরের এই প্রদর্শনীতে ভাস্কর্যের উপস্থিতি হাতে গোনা। তেজস হালদার জসের ফাইবার গ্লাসে বৃহৎ আকারে করা আত্মপ্রতিকৃতিটির নাম 'দ্য ড্রিমার'। চোখ বন্ধ অবস্থায় যেন ধ্যানমগ্ন এক পুরুষ প্রকৃতি। তানিয়া সুলতানার মুখোশগুলো অত্যন্ত গলিত। মুখোশ শিল্পের ধারণাই পাল্টে দেয়। সুমন্ত কুমারের 'বিষ্ণু' আর্কিওটাইপ। শ্যামল চন্দ্র সরকারের 'হিরোইক ওম্যান' বিকৃত বীরচিত্র। রাশার কাঠের ভাস্কর্যে প্রাধান্য পেয়েছে কখনো চোখ বাঁধা কখনো মুক্ত মানুষের প্রতিকৃতি। নুরুল আমিনের 'লস্ট কালচার' টেরাকোটা মাধ্যমে একটি টরসো। সর্বোপরি তরুণদের ভাস্কর্য কলার প্রতি অনাগ্রহ একটি খারাপ সঙ্কেত বলেই মনে হয়।

গামদানি আর্ট অ্যাওয়ার্ডের জন্যে উনত্রিশ জন শিল্পী মনোনীত হয়েছিলেন। যাদের মধ্যে খালেদ হাসানকে প্রদান করা হয় টাইটেল পুরস্কার। এবং ইয়ং ট্যালেন্ট অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় মুসরাত রিয়াজীকে। তৈলরঙে আঁকা মুসরাতের কাজটিতে উঠে এসেছে পার্বত্য অঞ্চলের প্রাকৃতিক বাস্তবতা। খালেদ হাসানের 'টেরর বিট অব এসিড-১, ২' মাধ্যম ফটোগ্রাফি। এসিড সন্ত্রাসে পর্যুদস্ত হওয়া মানুষের গল্পকথা উঠে এসেছে তার ক্যামেরায়।

সরকারি উদ্যোগে আয়োজিত এশিয়ান দ্বিবার্ষিকীর পরই সবচেয়ে বড়ো ব্যক্তিগত আয়োজন এটি। জুরি প্যানেলে অনেক বিদেশি বোদ্ধারা থাকলেও অনেক দুর্বল কাজ প্রদর্শিত হয়েছে। সময়ও ছিল সংক্ষিপ্ত। মাত্র তিন দিন। তবু এই প্রদর্শনীতে তরুণ শিল্পীদের জন্যে বেশি জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল যা অত্যন্ত জরুরি একটি কর্তব্য। কারণ, আগামী নির্মিত হবে এই তরুণ শিল্পীদেরই হাতে।

জলে গিয়েছিলাম সই

সুমনকুমার দাশ

দিনমান ছোটাছুটিতে শরীরে একরাশ ক্লান্তি ভর করছে। প্রচ- ঘুম পাচ্ছিল। বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিলাম। ঘুমজড়ানো চোখে টিভির সুইচ অফ করে ঘুমোতে যাব। ঠিক তখনই গানটির কথাগুলো ভেসে কানে আসে 'জলে গিয়েছিলাম সই'। নিমিষেই ঘুম উধাও।
কলকাতার *স্টার জলসা* টিভি চ্যানেলে 'ইষ্টিকুটুম' ধারাবাহিক নাটকের নায়কের বিয়ের অনুষ্ঠানে গানটি গীত হচ্ছিল।
এই গানটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে একজন অশীতিপর বৃদ্ধার মুখম-ল ভেসে উঠল। তাঁর বয়স বিরাশির কোঠায়, অথচ এখনও কী ভরাট কণ্ঠ। তাঁর কণ্ঠে এই গানটি আমি একাধিকবার শুনেছি। আহা, কী টান! কী আবেগ! তিনি হচ্ছেন চন্দ্রাবতী রায়বর্মণ। সিলেটের প্রবীণ এই লোকসংগীত শিল্পী রাধারমণের অসংখ্য গান এই বয়সেও

এই গানটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে একজন অশীতিপর বৃদ্ধার মুখম-ল ভেসে উঠল। তাঁর বয়স বিরাশির কোঠায়, অথচ এখনও কী ভরাট কণ্ঠ। তাঁর কণ্ঠে এই গানটি আমি একাধিকবার শুনেছি। আহা, কী টান! কী আবেগ! তিনি হচ্ছেন চন্দ্রাবতী রায়বর্মণ

গেয়ে চলেছেন। চন্দ্রাবতী রায়বর্মণ সম্পর্কে 'আমি শুনেছি সেদিন তুমি, সাগরের ঢেউয়ে ভেসে' ও 'যশোর রোড' খ্যাত ভারতের প্রখ্যাত শিল্পী মৌসুমী ভৌমিকের মন্তব্য : 'তাঁর কণ্ঠে রাধারমণের গানগুলো শুনলেই মনে এক ধরনের শীতল পরশ বয়ে যায়। জল-মাটি সংলগ্ন গানগুলো তাঁর গলায় নিপুণভাবে মানিয়ে গেছে। আমি যতবার সিলেটে এসেছি ততবারই মাসিমার কণ্ঠের গান রেকর্ড করেছি।' এই চন্দ্রাবতী রায়বর্মণ দীর্ঘদিন ধরে রাধারমণের গান গেয়ে আসছেন। রাধারমণের ধামাইল, কীর্তন, দেহতত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলি থেকে শুরু করে বাউলাঙ্গিকের অধিকাংশ গানই তাঁর ঠোঁটস্থ। এই বছরখানেক আগে, *প্রথম আলো* বন্ধুসভা সিলেট জেলার উদ্যোগে আয়োজিত একটি ঘরোয়া গানের আসরে তিনি এন ডি মিথুনের আমন্ত্রণে গান গাইতে হাজির হয়েছিলেন। সেদিন তিনি রাধারমণের ধামাইল পর্যায়ভুক্ত বেশ কয়েকটি গান গেয়েছিলেন। খালি গলায় গান গাইছিলেন এবং ডান হাত ও পা দিয়ে মেঝেতে ঠুকিয়ে তাল তৈরি করছিলেন। তিনি একটার পর একটা গান গেয়েই চলছেন :

সুরধনীর কিনারায় কি হেরিলাম নাগরী গো, সুন্দর গৌরাঙ্গ রায়।
সুন্দর কপালে সুন্দর তিলক সুন্দর নামাবলী গায় ॥
সুন্দর নয়নে চাহে যার পানে
দেহ হইতে প্রাণটি লইয়া যায় ॥

যখন গৌরায় গান করে নৈদাবাসীর ঘরে ঘরে
গৌরা প্রেমবশে রাধার গুণ গায় ॥

না জানি কোন রসে ভাসে, একবার কান্দে একবার হাসে
পূর্ণশশী উদয় নদীয়ায় ॥

ভাইবে রাধারমণ বলে একবার আইনে দেখাও তারে
আমি জন্মের মতো বিকাই রাঙা পায় ॥

যতদূর মনে পড়ে সেদিন চন্দ্রাবতী রায়বর্মণ ছয় থেকে সাতটি গান গেয়েছিলেন। তবে সেই গানটির কথা বেশ মনে আছে : 'রস ছাড়া রসিক মিলে না, জল ছাড়া মীনের জীবের মরণ।' পুরো গানটা ঠিক স্পষ্ট মনে পড়ছে না। একটি সংকলন খুলে গানটি বের করলাম :

রস ছাড়া রসিক মিলে না, জল ছাড়া মীনের জীবের মরণ
রসিক চাইয়া ডুবল রাধার মন।
সখি গো যে ঘাটে জল ভরতে গেলাম সে ঘাটে ইংরেজের কল

এগো কলসির মুখে ঢাকনি দিয়ে সন্ধানে ভরিব জল ॥
সখি গো, দলে দলে অষ্টদলে শত দলে বৃন্দাবন
এগো কোন ফুলেতে ব্রহ্মাবিষ্ণু প্রেমের গুরু মহাজন
এগো দস্তা পিতল একই রকম মিশে না গো কি কারণ
এগো সোনায় সোহাগা মিশে মন মিশে না কি কারণ
রসিক চাইয়া ডুবল রাধারমণ ॥

কিন্তু চন্দ্রাবতী রায়বর্মণ গানটি ঠিক এভাবে গেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না। ঠিক কোথায় হেরফের রয়েছে সেটা মনে পড়ছে না, তবে উদ্ধৃত গানটির মতো তিনি যে গান নি সেটা বেশ মনে আছে। কথা প্রসঙ্গে মনে পড়ছে সুন-ামগঞ্জের আরেক প্রখ্যাত বাউল গীতিকার শাহ আবদুল করিমের উক্তি। তিনি টি এম আহমেদ কায়সারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে চৌধুরী গোলাম আকবর সম্পাদিত রাধারমণের গানের একটি সংকলন প্রসঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন :

> বেশ কিছুদিন পূর্বে রাধারমণের একটা গানের বই বেরিয়েছিল মদনমোহন কলেজ থেকে গোলাম আকবর সাহেবের সম্পাদনায়। রাধা-রমণকে একেবারে জীবন্ত কাষ্ঠ করা হয়েছে বইটার পাতায় পাতায়। গানের কলির ঠিক নেই; শব্দ-বিভ্রান্তি, পদ-ভ্রান্তি, একেবারে যাচ্ছেতাই কা-! মনটা দমে গেল এটা দেখে। রাধারমণের গান তো এই ক্ষীণ স্মৃতিশক্তি নিয়েও আজো ভুলতে পারিনি। এই ভাগ্য যদি রাধারমণের ক্ষেত্রে ঘটে, আমি তো কোন ছার!

আসলে এই যে পদ-ভ্রান্তি কিংবা গানের কলির হেরফের–সেটা নানা কারণে হচ্ছে। যেহেতু রাধারমণের গানের কোনো লিখিত পা-ুলিপি ছিল না। তাই এসব গান অনেক সময় লোকমুখে প্রচলিত হয়েছে। প্রায় ক্ষেত্রে গ্রামের সামান্য অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন মহিলারা ধামাইল কিংবা বৈঠকি গান গাওয়ার জন্য খাতায় টুকে রাখছেন। আবার এসব গান অনুলিখিত হয়ে এক খাতা থেকে অন্য খাতায় যাচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রায়সময় পদচ্যুতিও ঘটছে। ফলে ওইসব মহিলাদের কাছ থেকে সংগৃহীত গানগুলোর আসল পদ নিয়ে বিতর্ক রয়েই যাচ্ছে। তাই আমার মতে, এ ধরনের গান সংকলনভুক্ত করার সময় অবশ্যই যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন রয়েছে।

> ‘রাধারমণ গবেষক নন্দলাল শর্মা কয়েক বছর আগে আমাকে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, ‘র-াধারমণের অনেক গান এখনও সিলেট ও কাছাড় অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। এগুলো সংগ্রহ করা দরকার। অনেক প্রবীণ মানুষ এখনও জীবিত রয়েছেন, তাঁদের কাছ থেকে গানগুলো শ্রুতিলিখন করে রাখা উচিত। নইলে ওদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গানগুলোও’

একদিন এ বিষয়টির দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ধামাইল গানের আরেক কিংবদন্তি-তুল্য গীতিকার প্রয়াত প্রতাপরঞ্জন তালুকদার আমাকে বলেছিলেন, 'আমার অনেক গান রাধারমণের নামে, আবার রাধারমণের অনেক গান আমার নামপদ ব্যবহার করে গ্রামাঞ্চলে এখনও মহিলারা গেয়ে থাকেন।' প্রতাপরঞ্জনের কথা শুনে চমকে উঠি, এটি তো আরও বিপজ্জনক।

এমনটি কেন হচ্ছে– এ প্রশ্নের জবাবে প্রতাপরঞ্জন বলেছিলেন, 'অনেক সময় বিভিন্ন গ্রামে গেলে পরিচিত মহিলারা গান লিখে দেওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ জানান। তাৎক্ষণিকভাবে অনেকের খাতায় গানও লিখে দিয়েছি। সেক্ষেত্রে ধামাইল গানের আসরে ওই গান গাওয়ার সুবাদে মুখে মুখে এইসব গান বিভিন্ন মহিলাদের কাছে ছড়িয়ে পড়ছে। তখন এক মহাজনের নাম ভুল করে অন্য মহাজনের নামে মহিলারা গেয়ে ফেলছেন। যেহেতু রাধারমণ এবং আমার গানই আসরে বেশি গাওয়া হয়, তাই আমাদের মধ্যেই নামপদ নিয়ে ওই ভুলটুকু বেশি হয়।'

একই প্রসঙ্গে *বাউলকবি রাধারমণ গীতিসংগ্রহ*-এর সংকলক বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী তাঁর সংগৃহীত গান সম্পর্কে বলেছিলেন, 'সংগৃহীত গীতিসমূহের সবগুলোর ভাষা ও ছন্দ সবসময় অবিকৃত থাকেনি, বিশেষত আমাদের মৌলিক সংগ্রহ যখন অনু-লিখিত বা তস্য অনুলিখিত খাতা কিংবা পরম্পরাধৃত লোককণ্ঠ থেকে আহৃত। তবু লেখকের ছন্দের প্রতি মনোযোগ যথারীতি নিবিষ্ট ছিল তা খুব সহজেই উপলব্ধ হয়, কেননা আমরা যেসব গীতি পরম্পরাগত সূত্র থেকে পেয়েছি তাতেও ছন্দ পরিকল্পনার আঁচ স্পষ্ট।'

এ প্রসঙ্গ আপাতত থাক। সেদিন গানের আসরে সিলেটের সাম্প্রতিক সময়ের জনপ্রিয় বাউল গায়ক আবদুর রহমানও উপস্থিত ছিলেন। তিনিও রাধারমণের বাউলাঙ্গিকের বেশ কয়েকটি গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন। আমরা আসরের শ্রোতারা বিমুগ্ধ হয়ে গান শুনছিলাম। কবি শুভেন্দু ইমাম, জফির সেতু, মোস্তাক আহমাদ দীন, উজ্জ্বল মেহেদী, কাজী সাইফুল আচফিয়াসহ আসরে উপস্থিত সবাই তন্ময় হয়ে একের পর এক রাধারমণের গান শুনছিলেন আর তাঁর গানের তাৎপর্যগত দিকগুলো তুলে ধরছিলেন। সন্ধ্যার দিকে আসর শেষ হয়।

রাতে বাড়ি ফেরার পরও আসরের রেশ থেকে যায়। গত কয়েক বছর ধরে সিলেটের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল ঘুরে পল্লি মহিলাদের কাছ থেকে তাঁদের গানের অনেকগুলো খাতা সংগ্রহ করেছিলাম। সেসব খাতা বের করে রাধারমণের গানগুলো আলাদা করতে থাকি। একসময় দেখি এসব খাতায় প্রায় দুইশ রাধারমণের গান রয়েছে। সে গানগুলো যাচাই-বাছাই করে মাস তিনেকের প্রচেষ্টায় গোটা চল্লিশেক গান অগ্রন্থিত অবস্থায় আবিষ্কার করি। সেসব গানের মধ্য থেকে ৩০টি গান নিয়ে গল্পকার রাখাল রাহার আগ্রহে *অগ্রন্থিত রাধারমণ* নামে একটি গানের সংকলনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করি। সেটা সম্প্রতি প্রকাশিতও হয়েছে।

বইটির পাণ্ডুলিপি তৈরিকালীন রাধারমণকে নিয়ে বেশ কয়েকটি সংকলন ও বিক্ষিপ্ত কিছু লেখা পড়ে রাধারমণের প্রতি এক ধরনের দুর্বলতা তৈরি হয়। কিন্তু আফসোসও হয়–আজ পর্যন্ত রাধারমণকে নিয়ে উল্লেখ করার মতো কোনো কাজও হয়নি। প্রসঙ্গক্রমে মোস্তাক আহমাদ দীনের ভাষ্য প্রণিধানযোগ্য :

> ভাবুক ও রসরাজ হিসেবে রাধারমণের স্থান যে-শিখরে, তাতে, এ-পর্যন্ত তিনি যতটা মূল্যায়িত তা একদমই সামান্য, তবে আশার কথা, তাঁর গানের নানাবিধ সংকলন প্রকাশের পর থেকে গানের ভাবব্যঞ্জনার দিকে

এখনকার রসিক-গবেষকের আগ্রহ লক্ষ করা যাচ্ছে। এই আগ্রহীদের বেশির ভাগই রাধারমণের পদ-অন্তরিত বৈষ্ণব-রসের দিকটাকে ফুটিয়ে তুলতে ব্যগ্র। এমন নয় যে তার পদে সেই রস নেই, বরং আমাদের অজানা নয়, তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন বৈষ্ণব রঘুনাথের কাছে, নলুয়ার হাওরসংলগ্ন আশ্রম স্থাপনের ব্যাপারটিও তো তারই প্রমাণবহ। আমাদের অনুযোগ/আপত্তি সেই জায়গায় যেখানে আলোচকেরা তাঁদের লক্ষ্য মূর্ত করতে গিয়ে পদকারকে তাঁর সত্তার মানব-অনুভূতিগত দিক থেকে খারিজ করে দিতে চান, এবং তা কখনও এমন পর্যায়ে পৌছয় যে–আলোচক, পদকারকে তত্ত্বলীন করে দিয়ে তাঁকে অতিমানবের স্তরে নিয়ে যেতেও এতটুকু কুণ্ঠিত নন। তাঁরা ভাবেন, প্রেমপ্রকাশের এই যা কিছু–সে রাধাই হোক বা কৃষ্ণ–সবসময়ই রূপক। আর গোলটাও বাঁধে সেখানে। অথচ তাঁদের অজানা থাকবার কথা নয়–সৌন্দর্য্য বা সত্য যাই হোক–তার মর্মে পৌছাতে হলে, বাস্তব-রূপক-উপমান-উপমেয়সহ একযোগে না গেলে সে-যাত্রা পূর্ণ হয় না, পূর্ণ হওয়ারও নয়, কারণ, রূপকে তো ছড়িয়ে থাকে পদকারের জীবনাভিজ্ঞতারই চিহ্ন–ফলে, তাকে ছাড়া মূল্যাঙ্কনটা যে একমুখী হয়ে পড়বে এ আর আশ্চর্য কী।

এ বক্তব্যের আলোকেই আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যক–ইদানীং কিছু কিছু আলোচকের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, রাধারমণ বাউল নাকি বৈষ্ণব কবি– এ নিয়ে একটা তুচ্ছ বিতর্ক চলে আসছে। প্রত্যেকেই নিজেদের যুক্তিকে অকাট্য করে তুলতে নানা ধরনের যুক্তি-তর্কে মেতে উঠছে। *রাধারমণের গান* নামে একটি সংকলন সম্পাদনা করার সূত্রে তপন বাগচী অভিমত দিয়েছিলেন, রাধারমণ নিজেই যখন তাঁর বিভিন্ন গানে 'বাউল' পরিচয় দিয়েছেন, তখন আমাদের মেনে নিতে আপত্তি থাকে না। তবে একথা ঠিক যে, তাঁর গানে ও সুরে বৈষ্ণব ভাবধারা বেশি প্রকটিত।

এ বিষয়ে সবিনয়ে শুধু এটুকু বলতে চাই, রাধারমণের ধামাইল গানের পাশাপাশি বাউলাঙ্গিকের অসংখ্য গান যেমন রয়েছে, তেমনি বৈষ্ণব ভাবধারার গানও রয়েছে। ফলে তাঁকে একজন বাউল গীতিকার হিসেবে মেনে নিতে তো কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী লিখেছিলেন, '[...] ভাব ও কথাংশের প্রাকৃত আকর্ষণের জোরেই বিগত শতাব্দীকাল থেকে এই গীতিমালা গোষ্ঠীধর্মানুগত থেকেও উত্তর-পূর্ব বাংলা তথা ভারতের পল্লির হিন্দু মুসলমান সাধারণ মানুষকে মুগ্ধ করে এসেছে।'

রাধারমণের গানের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মোস্তাক আহমাদ দীন বলেছিলেন, 'র-াধারমণ প্রান্ত পাড়ার অধিবাসী। যেখানে বিদ্যাসাগরের সমাজ ও শিক্ষা-সংস্কারের প্রভাব গিয়ে পৌছয় না সেখানে একজন লোকায়ত রাধারমণের গান ঠিকই পৌছে যায়, কারণ রাধারমণ দেহ-মনে সেই প্রান্তের বাসিন্দা, তাঁর ভাষাও সেখানকার নানারকম বিভঙ্গ ধারণ করতে সক্ষম। তত্ত্বের আবরণ থাকলেও তার গান এমনভাবে সেখানকার বিষয় ধারণ করে, যে-কারও মনে হতে পারে তিনি অন্যের, বিশেষ করে রাধা/নারীভাব–বাস্তব অর্থে তিনি নিজেও বুঝি যাপন করে চলেন। তাই তাঁর গানে রাধাকে দেখা যায় কখনও বিদ্রোহী, কখনও বিরহী, আবার কখনও অতিশয় সমর্পিতপ্রাণা।'

মোস্তাক আহমাদ দীন তাঁর লেখায় সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরসহ সিলেট অঞ্চলে

বহুল প্রচলিত রাধারমণের একটি গান উদ্ধৃত করেছেন, যেটি এ পর্যন্ত কোনো সংকলনভুক্ত হয়নি। গানটি এ রকম :

আমায় নারীকুলে জন্ম কেন দিলায় রে দারুণ বিধি
নারীকুলে জন্ম দিয়া ঘটাইলায় দুর্গতি রে ॥

শিশুকালে পিতার অধীন, যৌবনেতে স্বামীর অধীন রে
ওরে বৃদ্ধাকালে পুত্রের অধীন আমারে বানাইলায় রে ॥

যদি আমি পুরুষ হইতাম মোহন বাঁশি বাজাইতাম রে
কত নারীর মন ভুলাইতাম বাজাইয়া মুরলী রে ॥

ভাইবে রাধারমণ বলে নারীজনম যায় বিফলে রে
না লাগিল সাধের জনম বন্ধুয়ার সেবায় রে ॥

লেখক স্বপন নাথ 'যমুনা উজান বহে শ্যামের বাঁশির সনে' শিরোনামে এক লেখায় লিখেছিলেন, 'কেবল রাধারমণ দত্ত নয়, সকল লোককবি বা বাউলের একটি সাধারণ বিষয় হল আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা। উল্লেখযোগ্য যে, এই আত্মজিজ্ঞাসা বা আত্মমুক্তির সাধনা প্রাচীনকাল থেকেই শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যেই লক্ষণীয়। [...] রাধারমণ ভক্ত সাধক হলেও আত্মজিজ্ঞাসায় জারিত হয়ে মুক্তির সন্ধান করেছেন মুক্তপ্রাণে। তিনি গুরু বাদী ধারায় বিশ্বাসী হলেও সংস্কারাচ্ছন্ন বা অন্ধ ছিলেন না।'

রাধারমণ গবেষক নন্দলাল শর্মা কয়েক বছর আগে আমাকে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'রাধারমণের অনেক গান এখনও সিলেট ও কাছাড় অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। এগুলো সংগ্রহ করা দরকার। অনেক প্রবীণ মানুষ এখনও জীবিত রয়েছেন, তাঁদের কাছ থেকে গানগুলো শ্রুতিলিখন করে রাখা উচিত। নইলে ওদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গানগুলোও চিরতরে হারিয়ে যাবে।'

নন্দলাল শর্মার আক্ষেপ যে আমার নিজের সঙ্গে এমনভাবে মিলে যাবে সেটা তো কখনো ভাবিনি। আমি চোখ বুজি। ফিরে যাই শৈশবের সেই প্রাতঃভ্রমণের দিনগুলোতে। দাদুর কণিষ্ঠা আঙুলে ধরে সবুজ ঘাস মাড়িয়ে সরু কাঁচা রাস্তা ধরে আমরা দাড়াইন নদীর পাড় ঘেঁষে হাঁটতাম। ঘণ্টাখানেক এভাবেই হাঁটতে হাঁটতে মাইল দেড়েক দূরের যাত্রাপুর গ্রামের পাশে চলে যেতাম। আবার একই ভাবে ফিরে আসতাম। এ সময়টাতে দাদু অনেক গল্প আর কীর্তন ঢঙয়ের গান শোনাতেন।

আমার দাদু ব্রজেন্দ্র চৌধুরী রাধারমণের অনেক বৈঠকি ও কীর্তন গান জানতেন। প্রাতঃভ্রমণের সময় দাদু একটা গান খুব বেশি গাইতেন : 'মুখে আমার কৃষ্ণ নাম গো, অন্তরে নাই মধু।' দাদু আজ বেঁচে নেই, প্রায় আঠারো বছর আগে মারা গেছেন। তিনি মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই গানটিও যেন চিরতরে হারিয়ে গেছে। কীর্তন-ঢঙের এই বৈঠকি গানটির কোনো হদিস পরবর্তীকালে আমি আর পাইনি। আবছা আবছা যতটুকু মনে পড়ে, দাদু বলেছিলেন—এটি রাধারমণের লেখা বৈঠকি গান। এখন, এই মুহূর্তে রাধারমণের একটি গান হারিয়ে যাওয়ার বেদনা আমাকে খুব তাড়া করছে।

পাঠ প্রতিক্রিয়া

মাসিক উত্তরাধিকারে প্রকাশিত জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের গল্প 'কালকূট'

অমিতাভ রক্ষিত

'গল্প' মানুষের আদিমতম মানসিকতার এক অন্যতম অভিব্যক্তি। সেই কবে কোন সন্ধ্যায়, আধো অন্ধকারে, হরিণ কিম্বা শুকরের মাংস ঝলসানো এক নিভন্ত চুল্লির পাশে বসে, কে যে প্রথম গল্প বলতে শুরু করেছিল হঠাৎ, সে কথা আর, আজ কে মনে রাখে? সে গল্পটা কি ছিল আজকেরই মতোন-যে হরিণটা তার বল্লমের খোচা খেয়েও পালিয়ে গেল, সেটাই কি সব থেকে তাজা ছিল?

হয়ত জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের মতন প্রতিষ্ঠিত লেখকের রচনা বলেই এই প্রশ্ন উঠতে পারে, অন্যথায় উঠত না, যে 'কালকূট' গল্পের প্রকৃত সাহিত্যিক মূল্য কি? মূল্যায়ন জিনিসটা অবশ্য এতই ব্যক্তিগত যে যদি কোনো সর্বসম্মত মাপকাঠি থাকতও, তাহলেও প্রতি পাঠকের কাছে, প্রতিটি ছোটোগল্পই, বিভিন্ন ভাবে গৃহীত হতো

সেদিনের পর থেকে মানুষ, আজ পর্যন্ত অন্তত, আরও কয়েক লক্ষ কোটি গল্প বলেছে পরস্পরকে। কিন্তু সব গল্প, বলা হয় নি, বা বলা যায় না, একইভাবে। পৃথিবীর সব থেকে পুরোনো 'লিখিত' গল্প যা এখনও পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেছে, তা হলো আজ থেকে প্রায় চার পাঁচ হাজার বছর আগে রচিত, গিলগ্রঅমেশের মহ-াপ্লাবনের উপাখ্যান। কিন্তু সে ছিল কাব্যগল্প অথবা ইতিহাস। গদ্যে লেখা সব থেকে পুরোনো কাল্পনিক রচনা সম্ভবত : আরব দেশের– আনুমানিক ১,০০০ সালে লেখা 'সহস্র রজনীর উপাখ্যান' অথবা ১৩০০ সাল নাগাদ ইংল্যান্ডে রচিত চসারের 'ক্যান্টরবেরী টেলস্' আর ইটালিতে লিখিত বোকাচও-র 'ডেকামেরন'-এর গল্পগুলো। তারপর থেকে অবশ্য এই বিগত হাজার বারো শ বছরে গল্প লেখার ধারার আমূল পরিবর্তন হয়েছে সারা পৃথিবীতে। উপন্যাস ও বড়োগল্প থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছোটোগল্প আজ নিজস্ব ভঙ্গি ও ধারাতে সমৃদ্ধ।

এডগার অ্যালান পো-র বর্ণনা অনুযায়ী, ছোটোগল্প তাকেই বলে, যা আধ ঘণ্টা থেকে দু ঘণ্টার মধ্যে, একবারে বসে পড়ে ফেলা যায়; যা সাধারণত পাঁচহাজার শব্দের মধ্যে সীমিত থাকে, যার মধ্যে মূল চরিত্রের সংখ্যা দুই তিন জনের বেশি নয়, আর যার মধ্যে পরিপ্রেক্ষিত, সংঘর্ষ ও নাটকীয়তার প্রভাব আছে। ছোটোগল্পের এই বর্ণনাটা যদি ঠিক বলে স্বীকার করে নেওয়া হয় তবে জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের 'কালকূট' গল্পটি নিঃসন্দেহে একটি অন্যতম ছোটোগল্প হিসেবেই বিবেচিত হতে পারে।

এরপরে, হয়ত জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের মতন প্রতিষ্ঠিত লেখকের রচনা বলেই এই প্রশ্ন উঠতে পারে, অন্যথায় উঠত না, যে 'কালকূট' গল্পের প্রকৃত সাহিত্যিক মূল্য কি? মূল্যায়ন জিনিসটা অবশ্য এতই ব্যক্তিগত যে যদি কোনো সর্বসম্মত মাপকাঠি থাকতও, তাহলেও প্রতি পাঠকের কাছে, প্রতিটি ছোটোগল্পই, বিভিন্ন ভাবে গৃহীত হতো। তাই সেই পরিপ্রেক্ষিত থেকে নির্ভয়ে বলা যেতে পারে, যে 'কালকূট' নিঃসন্দেহে কালজয়ী হয়ে থাকবে বহুদিন।

কালকূটের বৈশিষ্ট্য একাধিক। প্রথমত ভাষার মার্জনা। শব্দ দিয়ে যাঁরা ছবি আঁকেন তাদের অনেকেরই প্রবণতা থাকে শব্দতুলি দিয়ে ক্যানভাসের ওপরের রঙ-টাকে একটু বেশি গাঢ় ফেলবার। জ্যোতিপ্রকাশ দত্তর সংযম বোধ এক্ষেত্রে

প্রশংসনীয়। আমেরিকান লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে-র সঙ্গে হয়ত বা এই ব্যাপারে তাঁর যথাযথ তুলনা করা যেতে পারে; হেমিংওয়ে যেমন গদ্যের মধ্যেই পদ্য লিখতেন-আলংকারিক ভাষা ব্যবহার না করেও, জ্যোতিপ্রকাশ-ও তেমনি, সাধারণ শব্দ ব্যবহার করেই অসাধারণ গদ্য রচনা করেছেন এই গল্পটিতে। তাঁর বিখ্যাত 'দা ফ্লাই' গল্পে ক্যাথারিন ম্যানস্‌ফিল্ড মৃত্যুকে দেখেছেন জীবনের অবধারিত পরিণতি হিসেবেই; তবু সমাজের শক্তিশালী গোষ্ঠির অনাবশ্যক ক্রুরতাকেও তিনি কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি সেখানে।

কোনো কোনো সময়ে, গল্পের মৃত্যু বহুলভাবে প্রতীকিই হয় শুধু। যেমন ডি এইচ লরেন্স-এর বিখ্যাত 'দি রকিং হর্স উইনার'। এই গল্পে নীতি, নাটকীয়তা ও কল্পনার সমন্বয়ে মৃত্যু গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার অন্য দিকে, ভল্লাদিমির নবোকভের 'সিম্বলস্ এ- সাইনস্' গল্পে মৃত্যু আদতে ঘটেছে কি-না সেটাই পাঠকের চিন্তার ওপরে রেখে দেওয়া হয়েছে।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের 'কালকূট' গল্পের মৃত্যু- তো অবশ্যই প্রতীকি, কিন্তু প্রতীক আছে একাধিক। সেগুলো বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ভাবে বিস্তারিত। প্রথম স্তরে মৃত্যুকে পরাজিত নৈরাশ্যের ফল হিসেবে দেখা যেতে পারে। সেখানে নৈরাশ্যের আসল কারণ শুধু দারিদ্র প্রণোদিত নয়-প্রবঞ্চনাও আছে।
জ্যোতিপ্রকাশের চিত্রিত সমাজে নৈরাশ্যের প্রতিষেধক আছে। মৃত্যু এখানে অবধারিত ছিল না। কিশোরীটির রক্তক্ষরণের সহজ চিকিৎসা আছে। অন্তরায় শুধু চিকিৎসকের কাছে সময়মতো পৌঁছানোর-অর্থাৎ সহজে জীবনধারণের সামগ্রী আহরণ করবার। সামগ্রীও আছে, তবে হাতের নাগালের ঠিক বাইরে- পাশের শহরে। দেখা যায় যে গ্রামের একমাত্র 'চলে কি চলে না' মোটর গাড়িটি শুধু স্থানীয় রাজনৈতিক নেতার বাড়িতে আটকে পড়ে আছে- নেতাশ্রেণির সমাজের যথাযথ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে দেবার ব্যর্থতার প্রতীক হিসেবে। যদি মোটরগাড়িটা চলত অথবা চালাবার অনুমতি পাওয়া যেত, তাহলে কিশোরীর- বা তারই মতোন সমাজের আরও বহু লোকের মৃত্যু আটকানো হয়ত বা সম্ভব হতো।

তবে এই সমাজের রাজনৈতিক নেতারা শুধু যে সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থাই করে দিতে পারেন নি তা নয়, তাঁরা

“ জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের 'কালকূট' গল্পের মৃত্যু- তো অবশ্যই প্রতীকি, কিন্তু প্রতীক আছে একাধিক। সেগুলো বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ভাবে বিস্তারিত। প্রথম স্তরে মৃত্যুকে পরাজিত নৈরাশ্যের ফল হিসেবে দেখা যেতে পারে। সেখানে নৈরাশ্যের আসল কারণ শুধু দারিদ্র প্রণোদিত নয়- প্রবঞ্চনাও আছে ”

কিশোরীটির মতোন অসহায় লোকের দুর্বলতা ও দারিদ্র্যের সুবিধা নিয়ে, তাদের প্রবঞ্চনাও করে চলেছেন সমানে। তাই গল্পের অন্য আরও এক স্তরে দেখি সমাজের রক্তক্ষরণ ও মৃত্যু।

প্রতীক হিসেবে তাই 'চলে কি চলে না' মোটর গা-ড়িটি নেকোলাই পৃথিবী বিখ্যাত 'দি ওভারকোট' গল্পের ওভারকোটের সমপর্যায়ে-ই পড়ে। জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের গল্পের নাম তাই স্বচ্ছন্দেই 'মোটরগাড়ি' হতে পারত। তবে না হবার কারণ অবশ্য অন্য। জ্যোতিপ্রকাশ তাঁর গল্পে আরও বিভিন্ন স্তরে প্রতীক ব্যবহার করেছেন। যেমন ধরা যাক, সরীসৃপ-কালকূট! গ্রামের স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা যে শুধু যে সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতেই ব্যর্থ বা কিশোরীটির মতোন অসহায় লোকের দুর্বলতা ও দারিদ্র্যের সুবিধা নিয়ে প্রবঞ্চনা করতে ব্যস্ত তা নয়। তারা প্রবঞ্চনাটাও করে চলেছে সাপের মতোন ঘৃণ্যভাবে।

> জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের 'কালকূট' গল্পের মৃত্যু- তো অবশ্যই প্রতীকি, কিন্তু প্রতীক আছে একাধিক। সেগুলো বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ভাবে বিস্তারিত। প্রথম স্তরে মৃত্যুকে পরাজিত নৈরাশ্যের ফল হিসেবে দেখা যেতে পারে। সেখানে নৈরাশ্যের আসল কারণ শুধু দারিদ্র প্রণোদিত নয়- প্রবঞ্চনাও আছে

কিন্তু শুধুই কি তাই ? মরণোন্মুখ বাদামওয়ালা বিজয়ীর মুখে যখন আমরা শুনি '(মানা) কিয়া তো। ম্যায় নে বোলা হে সাপ বাবা, মুঝকো ছোড় দে' সেটা কি বড়ো ওঝা যে প্রশ্ন বিজয়ী- কে করতে পেরেছিল সাপের কামড় সম্পর্কে, শুধু তারই উত্তর, নাকি কিশোরীকে যে প্রশ্ন করা হয়ে ওঠে নি এবং যথাযথ প্রশ্নের অভাবে কিশোরীর যে উত্তর দেওয়ার সুযোগ হয় নি, সে উত্তরও! সর্পিল রাজনেতাকে কি সে একবারের জন্যেও বলে নি, 'ছাড়ো, ছাড়ো আমাকে? বাঁশের কঞ্চির আড়ালে লুকিয়ে থাকা সাপটি যেমন বিষ ঢেলে অকালেই বিজয়ীর জীবন হরণ করে নিল, তেমনই কি নেতৃত্বের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সর্পটিও বিষ ঢেলে অকালে একাধিক জীবন ও স্বপ্ন হরণ করে নিল না? অতত্রব 'কালকূট', অর্থাৎ আভিধানিক অর্থে যে 'কাল' অথবা সময় হরণ করে, প্রকারান্তরে যা হল 'বিষ'
তা-ই নিঃসন্দেহে এই গল্পের যথাযথ প্রতীকি নাম।

অবশ্য পৃথিবীর প্রথম সারির সব গল্পেই যে প্রতীক থাকে তা নয়। ও হেনরীর 'গিফট অফ্ দা ম্যাজাই'-তে তো সকলে বাইবেলের প্রতীক দেখেন না। এটা নিছক সামাজিক কাহিনি বলেই বেশি লোকের মনে হয়। তবু প্রতীকের ব্যবহার বা অবস্থানই এই স্তরের

গল্পের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। সেই সূত্রে, অবশেষে ফ্রানজ্ কাফ্‌কার 'দি হাংগার আর্টিস্ট', যা পল সার্‌তারের 'দা ওয়াল', কিম্বা আলবার্ট কামু-র 'দা গেস্ট' গল্পের সঙ্গে তুলনা না করলে জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত বা বাংলা সাহিত্যের প্রতি সুবিচার করা হবে না।

কাফকা, সারতার ও কামু, তিনজনেই আধুনিক সমাজের যন্ত্রায়ণ কারণত বিচ্ছিন্নতা বোধের প্রবর্তক। উপর্যুক্ত তিনটি গল্পই সেই ভাবধারা প্রকাশ করেছে সম্পূর্ণভাবে। জ্যোতিপ্রকাশ কিন্তু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নন। এই গল্পে সমাজের বঞ্চিত মানুষেরা তাঁর কাছেই সবসময় সাহায্য প্রার্থনা করে এসেছে। তিনি সর্বপ্রকারে তাদের সাহায্যও করে এসেছেন। কিন্তু তাতে যখন ফল হয় নি, তখনই তিনি নিস্পৃহ হয়ে গিয়েছেন। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়েও তাই, তিনি নিস্পৃহ ভাবে অদৃষ্টবাদী হয়েছেন।

হয়ত বা এটাই জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত-র লেখনীর বৈশিষ্ট্য। অবিচ্ছিন্নতা নয়– সমাজে যুক্ত থেকেও নিস্পৃহতা ও অদৃষ্টবাদিতা।

৭৪২০ ই কুইনসি এভিনিউ
ডেনভার, সিও ৮০২৩৭